ধান উৎপাদন

ডঃ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
ডঃ সুনির্মল মাইতি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

ধান উৎপাদন

ধান উৎপাদন

ডঃ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রফেসর, শস্য বিজ্ঞান বিভাগ ও ডীন স্নাতকোত্তর পাঠক্রম
বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ও

ডঃ সুনির্মল মাইতি
লেকচারার, শস্য বিজ্ঞান বিভাগ
বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী ঃ নদীয়া

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

DHANA UTPADAN
(RICE PRODUCTION)

BISWANATH CHATTOPADHYAYA
SUNIRMAL MAITI

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ১৯৮৪

প্রকাশক ঃ
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ;
[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা]
৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,
কলিকাতা-৭০০ ০১৩ ।

মুদ্রক ঃ
সুরেশ দত্ত ।
মডার্ন প্রিন্টার্স ;
১২ উল্টাডাঙ্গা মেন রোড ;
কলিকাতা-৭০০ ০৬৭ ।

মূল্য ঃ বাইশ টাকা

চিত্রাংকন ঃ শ্রীনির্মল কর্মকার

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীদুর্গা রায়

Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in Regional language at the University level, in the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

ভূমিকা

জাতীয় কৃষি কমিশনের মতে ভারতে ১৯৮০-৮১ সালে চালের হেক্টার প্রতি গড় উৎপাদন ১.৩৩ মেট্রিক টন থেকে ১৯৮৫ সালে ১.৬ মেট্রিক টনে ও চলতি শতাব্দীর শেষ নাগাদ ২.৫ মেট্রিক টনে আনতে পারলে এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে চালের মোট উৎপাদন ১৯৮৫ সাল নাগাদ ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন ও ২০০০ সাল নাগাদ ১২০ লক্ষ মেট্রিক টন হলে তবেই আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগানো সম্ভব হবে। গমের উৎপাদন যতই বাড়ুক না কেন সমানুপাতিক হারে ধানের উৎপাদন না বাড়াতে পারলে খাদ্য শস্যের ঘাটতি মেটানো সম্ভব হয়ে উঠবে না। তাই আজ ভারতে সেই সংগে অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। বেশী সার গ্রহণে সক্ষম নতুন জাতের অধিক ফলনশীল ধানের নিয়ত উদ্ভাবন কৃষককে বিপুল উৎসাহ যোগাচ্ছে। এই সব নতুন জাত অধিক ফলনের শক্তি রাখে ঠিকই যদি তাকে ঠিকমত পরিচর্যা এবং রোগ, পোকামাকড় থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। এই বিষয়ে বিগত দুই দশকের আগে থেকে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সরকারী গবেষণা কেন্দ্র প্রভৃতিতে হয়েছে। এই সব তথ্য সংগ্রহ করে এই সংকলনটি লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। যাঁরা কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে জড়িত রয়েছেন অথবা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আছেন তাঁদের যাতে কাজে লাগে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী লেখার সময় পোষণ করা হয়েছে। লেখার সময় যেসব জায়গা থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে তার যথাযথ উল্লেখ রয়েছে। সংকলনটি মাতৃভাষায় লেখার সময় সহজ ও চলতি ভাষায় ইংরেজী শব্দের অনুবাদ কোন কোন ক্ষেত্রে করা হয়েছে এবং সেই সংগে ইংরেজি প্রতিশব্দগুলিও পাশাপাশি রাখা আছে। সংকলনের উৎকর্ষ সাধনে যে কোন মতামত সাগ্রহে গৃহীত হবে। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রোগতত্ত্ব বিভাগের রীডার ডঃ নিলাংশু মুখার্জী 'রোগ ও তার প্রতিকার' অধ্যায়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছেন। লেখকেরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। শ্রীবিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, পুস্তকটির পাণ্ডুলিপি খুব যত্নসহকারে নিরীক্ষা করেছেন। লেখকেরা শ্রীবনবিহারী চক্রবর্তী জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক (সদর) ও শ্রীঅমরনাথ রায়, এগ্রোনোমিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ, মহাশয়গণের সহিত দীর্ঘ সময় ধরে পুস্তকটির বিভিন্ন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা

করেছেন। তাঁদের মিলিত পরামর্শ অনুযায়ী কোন কোন বিষয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। লেখকেরা সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

রাজ্য পুস্তক পর্ষদ বইটি লেখার জন্য উৎসাহিত করায় তাঁরা ধন্যবাদার্হ।

বইটি ধান উৎপাদনে জড়িত এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠকের কিছুমাত্র কাজে লাগলে এঁদের শ্রম সার্থক হবে।

১লা আষাঢ়, ১৩৮৮ লেখকেরা

সূচীপত্র

অধ্যায় এক

ধান উৎপাদনের মূল পরিসংখ্যান
(Basic Statistics on Rice Production)

অধ্যায় এক

ধান উৎপাদনের মূল পরিসংখ্যান

বিভিন্ন ধান উৎপাদনকারী দেশের পরিসংখ্যান

বিশ্বে ধানের চাষ সুপ্রাচীন কাল ধরে হয়ে আসছে। আজ প্রায় শতকরা ৪০ ভাগের মত জনসংখ্যা ভাত থেকে প্রধান ক্যালোরি পেয়ে থাকে। কিছু কিছু দেশ আছে যেমন চীন, জাপান, বাংলাদেশ, বারমা, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন বা কামপুচিয়ার প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ জনসংখ্যার প্রধান খাদ্য হল ভাত। এশিয়ার গ্রামীন জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ প্রায় সারা বছর চাষের কাজে লেগে থাকে।

সারা বিশ্বে আজ প্রায় ১১১টির মত দেশে ধানের চাষ হয়। এরমধ্যে এশিয়া ভূখণ্ডের প্রায় সব দেশ, পশ্চিম ও উত্তর আফ্রিকার অনেক দেশ, মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকার কিছু কিছু দেশ, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশ, অষ্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্ততপক্ষে ৪ থেকে ৫টি দেশ রয়েছে। এই ধান উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে বেশীর ভাগই উষ্ণমণ্ডলীয় আবহাওয়ায় অবস্থিত এবং এদের তুলনামূলক গড় উৎপাদন কম। যেসব দেশ আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ বা শীত প্রধান অঞ্চলে অবস্থিত যেমন কোরিয়া, চীন, স্পেন, পর্তুগাল, ইতালী, ফ্রান্স, রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি, তাদের গড় ফলন কিছুটা বেশী।

জাপান, স্পেন, কোরিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় ধানের হেক্টার প্রতি গড় ফলন সব থেকে বেশী (প্রায় ৬ টন)।

১১১টি ধান উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে প্রায় ৩ থেকে ৪টি দেশের গড় ফলন হেক্টার প্রতি ৬ টন, ১৭টি দেশে ৪টন বা কিছু বেশী, ২১টি দেশে ৩ টন বা তারও কিছু কম, ৫৭টি দেশে ২ টনের কম এবং ১৩টি দেশের গড় উৎপাদন ১ টনের কম হয়।

১৯৭৯ সালের হিসাবে পৃথিবীতে প্রায় ১৪৫৩ লক্ষ হেক্টারে ধানের চাষ হয়ে থাকে (সারনি ১)। এই মোট ধানের জমির মধ্যে শুধু এশিয়াতে প্রায় শতকরা ৯০ ভাগের মত জমি অবস্থিত (দক্ষিণ এশিয়ায় ৩৭.২ শতাংশ, পূর্ব এশিয়া ২৮.৮ শতাংশ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে ২৩.৫ শতাংশ)। আবার এশিয়ার মধ্যে ভারত ও চীন উভয় দেশ মিলিয়ে ৭৭১ লক্ষ হেক্টার জমিতে ধানের চাষ হয়। সারা বিশ্বের হিসাবে মোট চাষযোগ্য জমির প্রায় অর্ধেক।

সারনি ১ ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধানের জন্য নিয়োজিত জমি, ধানের উৎপাদন ও গড় ফলন (১৯৭৯)

বিভিন্ন দেশ	ধানের জন্য নিয়োজিত জমি ১০০০ হেক্টার	ধানের উৎপাদন ১০০০ টন	গড় ফলন হেক্টার প্রতি কেজি
এশিয়া	১৩০৫৬৮	৩৪৫৪৯১	২৬৪৬
চীন	৩৮৫৭৫	১৪৩৪০০	৩৭১৭
ভারত	৩৮৫০০	৬৯০০০	১৭৯২
বাংলাদেশ	১০০০০	১৯৩৫৫	১৯৩৬
ইন্দোনেশিয়া	৮৮৫০	২৬৩৫০	২৯৭৭
থাইল্যাণ্ড	৮৩০০	১৫৬৪০	১৮৮৪
ভিয়েতনাম রিপাবলিক	৫৬১৮	১০৫০০	১৮৬৯
বারমা	৫০১৩	১০০০০	১৯৯৫
ফিলিপাইন	৩৫০০	৭০০০	২০০০
জাপান	২৫০০	১৫৬০০	৬২৫০
পাকিস্তান	১৯৭৫	৪৯৫৩	২৫০৮
নেপাল	১২৬৫	২৫০০	১৯৭৬
কোরিয়া রিপাবলিক	১২২৮	৮০৮১	৬৫৫৬
শ্রীলংকা	৮৯৯	১৮০৬	২০০৯
কোরিয়া গণতন্ত্র	৭৮০	৪৮০০	৬১৫৪
লাওস	৬৪০	৯০০	১৪০৬
ইরান	৩০০	১২১২	৪০৪০
আফগানিস্তান	২১০	৪৫০	২১৪৩
ভূটান	১৯৫	২৯৫	১৫১৩

বিভিন্ন দেশ	ধানের জন্য নিয়োজিত জমি ১০০০ হেক্টার	ধানের উৎপাদন ১০০০ টন	গড় ফলন হেক্টার প্রতি কেজি
দক্ষিণ আমেরিকা	৬৭৮৮	১২৪০১	১৮২৭
ব্রাজিল	৫৪৩৯	৭৫৮৯	১৩৯৫
কম্বোডিয়া	৪৪২	১৯৩২	৪৩৭১
পেরু	১২২	৫৪৫	৪৪৬৬
আফ্রিকা	৪৭৭৯	৮৭৩২	১৮২৭
মাদাগাসকার	১২১৬	২৩২৭	১৯১৪
মিশর	৪৩৬	২৫০৭	৫৭৫৫
সিরিয়া লেবালন	৪০০	৪৮০	১২০০
জ্বারী	২৮০	২৩০	৮২১
তানজানিয়া	১৬৭	২০০	১১৯৮
উত্তর ও মধ্য আমেরিকা	২০০৭	৮১২১	৪০৪৬
যুক্তরাষ্ট্র	১২০৬	৬১৯৯	৫১৪২
কিউবা	২২০	৫০০	২২৭৬
মেক্সিকো	১৫১	৪৮৯	৩২৩৮
রাশিয়া	৬১০	২৪০০	৩৯৩৪
ইউরোপ	৩৮৯	১৯৩৩	৪৯৬৭
ইতালী	১৮১	১০১৪	৫৬০৭
স্পেন	৬৯	৪২৭	৬১৮৮
পর্তুগাল	৩৫	১৩৫	৩৮৮৩
ফ্রান্স	১৩	৪৫	৩৫৭৯
ওসেনিয়া	১৩০	৭৩৫	৫৬৩৭
অস্ট্রেলিয়া	১০৯	৬৯২	৬৩৪৯
ফুজি	১৮	১৮৯৫	৩৩
পৃথিবী	১৪৫,২৬৮	৩৭৯৮১৪	২৬১৫

উৎস : ফার্টিলাইজার স্ট্যাটিস্টিক্স্ ১৯৭৯-৮০, পৃঃ ১১১-৬০

১৯৭৯ সালের হিসাবে মোট চালের উৎপাদন পাওয়া গেছে ৩৮০০ লক্ষ টন (সারনি ১)। এর মধ্যে ৩৪৫০ লক্ষ টন আসে শুধু এশিয়া মহাদেশ

থেকে অর্থাৎ মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৯১ ভাগ (দক্ষিণ এশিয়ায় ২৭.৭ শতাংশ, পূর্ব এশিয়ায় ৪৩.৭ শতাংশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ১৯.৫ শতাংশ)। ভারত ও চীন থেকে পাওয়া যায় ২১২০ লক্ষ টনের মত তার মানে বিশ্বের প্রায় অর্ধেকেরও বেশী উৎপাদন। বিশ্বে যে দুটি দেশে এত পরিমাণ হয় তাদের কিন্তু গড় ফলন যথেষ্ট কম। তাই প্রশ্ন জাগে উৎপাদনের হার এত কম বেশী হওয়ার কারণ কি ?

সাধারণভাবে বলা যায় শীতপ্রধান দেশে গাছে সালোক সংশ্লেষের ফলে যে খাদ্য তৈরী হয় তার বেশীর ভাগই জমা থাকে। তার কারণ শ্বাসকার্য্য ও বাষ্পীমোচনের জন্য শক্তি খরচ কম হয়। জমা খাদ্য পরে উৎপাদনে সাহায্য করে। কিন্তু প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন ছাড়াও যেসব কারণে শীতপ্রধান অঞ্চলে ধানের ফলন ভাল হয় তাহলো আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ যেমন—

- ঠিক ঠিক ভাবে জমি তৈরী
- আগাছা ও রোগ পোকা দমন
- উত্তমরূপে শস্য পরিচর্যা
- জলের সুবন্দোবস্ত
- সুষমহারে গাছের সঠিক খাদ্যোৎপাদন প্রয়োগ

অপরদিকে উষ্ণমণ্ডলীয় দেশগুলিতে ফলন কম হওয়ার কারণ—

- দিন ও রাত্রির তাপমাত্রার আধিক্য
- বেশী বৃষ্টিপাত ও জলনিকাশীর অভাব
- বর্ষাকালে উজ্জ্বল সূর্যালোকের অভাব
- কৃষি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় জিনিষের অপ্রতুলতা যেমন সার, সেচব্যবস্থা, রোগ পোকা নাশক ঔষধ পত্রাদি, কৃষি ঋণ, উপযুক্ত অধিক ফলনশীল জাত ইত্যাদি
- উৎপাদকের মধ্যে আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব।

ধান উৎপাদনে ভারতের সামগ্রিক পরিস্থিতি

ভারতে ধান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। দেশের প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ জনসংখ্যার ভাতই প্রধান খাদ্য এবং এ ফসল সব থেকে বেশী এলাকায় চাষাবাদ হয়। উত্তরে ৮° থেকে ৩৪° অক্ষরেখার মধ্যে মোট প্রায় ৪০০ লক্ষ হেক্টার জমিতে ধানের চাষ হয়। পৃথিবীর হিসাবে মোট চাষযোগ্য ধান জমির শতকরা ২৬.৫ ভাগ। ১৯৮০-৮১ সালের হিসাবে দেখা যায় পৃথিবীর মোট

ধান উৎপাদনের ১৮.৭ শতাংশ ভারতের মাটিতে হয়েছে অর্থাৎ ৫৩২ লক্ষ টন। যদিও বা সব থেকে বেশী এলাকায় এর চাষ হয় বা মোট উৎপাদনের অনেকটাই ভারতের মাটিতে হয়ে থাকে তথাপি গড় উৎপাদনের দিকে তাকালে অনেকটা নিরাশ হতে হয়। পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় বেশ নীচে।

সারণি ২(ক)ঃ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ধানের জন্য নিয়োজিত জমি ('০০০ হেক্টার) ১৯৮০-৮১

রাজ্য	শরৎকালীন ধান	শীতকালীন ধান	গ্রীষ্মকালীন ধান	মোট জমি
বিহার	৫৯৮.৭	৪৮৩৯.৮	৫২.০	৫৪৯০.৫
উত্তর প্রদেশ	৩১৯১.১	১৯৮৬.৫	৩.০	৫১৮০.৬
পশ্চিমবঙ্গ	৬১৫.২	৪২১৪.০	৩৪৬.৫	৫১৭৫.৭
মধ্যপ্রদেশ	৪৭৯৭.৫	—	—	৪৭৯৭.৫
উড়িষ্যা	৪৬৫.০	৩১৫৪.০	১৮০.০	৪১৯৯.০
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩.৯	২৪০৫.৫	৭৯৭.৯	৩৬০৭.৩
আসাম	৬০৬.২	১৬৩৪.৫	৩৪.৩	২২৭৫.০
তামিলনাড়ু	১৫৭৭.০	৫২২.০	১৩.০	২১১২.০
মহারাষ্ট্র	১৪৭০.৬	—	৩৩.২	১৫০৩.৮
পাঞ্জাব	১১৭৮.০	—	—	১১৭৮.০
কর্ণাটক	৯২৫.০	৪৮.১	১১১.৬	১০৮৪.৭
কেরালা	৩৪৬.৮	৩৩৫.০	১০৩.২	৭৮৫.০
গুজরাট	৪৭৭.৫	—	—	৪৭৭.৫
হরিয়ানা	৪৭২.০	—	—	৪৭২.০
ত্রিপুরা	১১৫.৭	১৩৭.১	৩৪.৮	২৮৭.৬
জম্মু ও কাশ্মীর	—	২৬৪.৬	—	২৬৪.৬
মনিপুর	৫৭.১	১৩১.৫	—	১৮৮.৬
রাজস্থান	১৭০.১	—	—	১৭০.১
হিমাচল প্রদেশ	১০৯.৪	—	—	১০৯.৪
নাগাল্যাণ্ড	৪৩.১	৫৮.৫	—	১০১.৬
মেঘালয়	৩০.৮	৬৭.০	১.২	৯৯.০
অরুণাচল প্রদেশ	৭৫.১	—	—	৭৫.১

রাজ্য	শরৎকালীন ধান	শীতকালীন ধান	গ্রীষ্মকালীন ধান	মোট জমি
গোয়া, দমন, দিউ	৪৩.৫	৯.২	—	৫২.৮
পণ্ডিচেরী	৭.৫	১৯.৬	৪.১	৩১.২
মিজোরাম	৯.০	২০.০	—	২৯.০
আন্দামান, নিকোবর	১১.৯	—	—	১১.৯
দাদরা, নগর হাভেলী	—	১০.৫	—	১০.৫
দিল্লী	৩.৪	—	—	৩.৪
সারা ভারত	১৭৮০১.১	২০২৫৭.৪	১৭১৪.৮	৩৯৭৭৩.৩

উৎস : রিপোর্ট, কৃষিমন্ত্রক, ভারত সরকার

সারণি ২(খ) : ভারতে রাজ্যভিত্তিক চালের উৎপাদন ('০০০ টনে) (১৯৮০-৮১)

বিভিন্ন রাজ্য	শরৎকালীন ধান	শীতকালীন ধান	গ্রীষ্মকালীন ধান	মোট চালের উৎপাদন
পশ্চিমবঙ্গ	৫৭৬.৪	৬০২৪.০	৮৬৫.২	৭৪৬৫.৬
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৩.৪	৪২০৮.৭	২০৮৪.৮	৭১৩৪.২
বিহার	৩৩৬.৬	৩২০৭.২	৫১.১	৫৪৭৬.০
উত্তর প্রদেশ	৩১৪৬.৫	২২৯০.৫	৩.০	৫৪৪০.০
উড়িষ্যা	২৭২.০	২৪৬২.০	১৮৩.৭	৪৩৩১.০
মধ্যপ্রদেশ	৪০০১.৯	—	—	৪০০১.৯
তামিলনাড়ু	২৮৮৫.০	১০৬৭.০	২৩.০	৩৯৭৫.০
পাঞ্জাব	৩২২৩.০	—	—	৩২২৩.০
আসাম	৫০১.৭	১৯৭৭.৬	৪৩.৫	২৫২২.৮
মহারাষ্ট্র	২৩০৫.৬	—	৫৫.০	২৩৬০.৬
কর্ণাটক	১৮৩৩.১	৯৩.২	২৮৩.৭	২১১১০.০
কেরালা	৫৬৮.৩	৫২৭.১	১৯৬.৪	১২৯১.৮
হরিয়ানা	১২২৪.০	—	—	১২২৮.০
গুজরাট	৫৫৬.৬	—	—	৫৫৬.৬

বিভিন্ন রাজ্য	শরৎকালীন ধান	শীতকালীন ধান	গ্রীষ্মকালীন ধান	মোট চালের উৎপাদন
জম্মু ও কাশ্মীর	—	৫৪৬.৪	—	৫৪৬.৪
ত্রিপুরা	১৩০.০	২০১.০	৫৯.০	৩৯০.০
মনিপুর	৮২.৬	১৯০.৪	—	২৭৩.০
রাজস্থান	১৪৯.৮	—	—	১৪৯.৮
মেঘালয়	৩২.০	৯৮.৩	২.৩	১৩২.৬
গোয়া, দমন, দিউ	৯৪.৯	২২.০	—	১১৬.৯
হিমাচল প্রদেশ	৯৬.৯	—	—	৯৬.৯
নাগাল্যাণ্ড	৩৪.৯	৫৬.৯	—	৯১.৪
অরুণাচল প্রদেশ	৭৫.১	—	—	৮৮.৮
পণ্ডিচেরী	১৯.৫	৩২.৪	৮.৫	৬০.৫
মিজোরাম	৯.০	১৯.৫	—	২৮.৩
আন্দামান, নিকোবর	১৮.৫	—	—	১৮.৫
দাদরা, নগর হাভেলী	১৩.৬	—	—	১৩.৬
দিল্লী	৭.৮	—	—	৭.৮
সারা ভারত	২২৫৯৪.৮	২৬৯৪৩.৭	৩৬৯২.৫	৫৩২৩১.০

উৎস: রিপোর্ট, কৃষিমন্ত্রক, ভারত সরকার

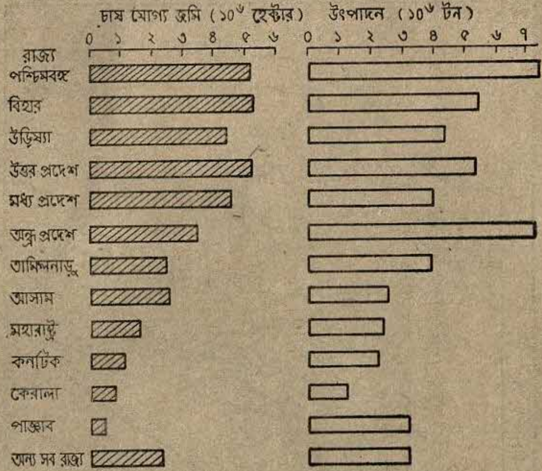
সারণি ২(গ): ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ধানের গড় ফলন (হেক্টার প্রতি কেজি) ১৯৮০-৮১ সালে

রাজ্য	শরৎকালীন ধান	শীতকালীন ধান	গ্রীষ্মকালীন ধান	গড় ফলন
পাঞ্জাব	২৭৩৫	—	—	২৭৩৫
হারিয়ানা	২৬০১	—	—	২৬০১
পণ্ডিচেরী	২৬০০	১৬৫৩	২০৯৭	২৩৮১
দিল্লী	২২৯৪	—	—	২২৯৪
গোয়া, দমন, দিউ	১৬৮২	২৩৯১	—	২২১৮
জম্মু ও কাশ্মীর	—	২০৬৫	—	২০৬৫

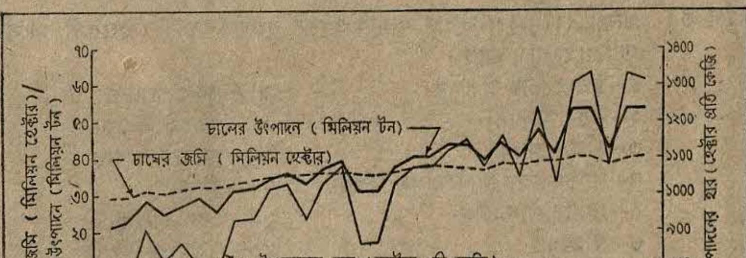
রাজ্য	শরৎকালীন ধান	শীতকালীন ধান	গ্রীষ্মকালীন ধান	গড় ফলন ধান
কর্ণাটক	১৯৮১	১৯৩৭	২৫৪২	২০৩৭
অন্ধ্রপ্রদেশ	২০০০	১৯১৩	২২০৩	১৯৭৭
তামিলনাড়ু	১৮২৯	২০৪৪	১৭৬৯	১৮৮২
কেরালা	১৬৩৮	১৫৭৩	১৯০৩	১৬৪৫
মহারাষ্ট্র	১৫৬৭	—	১৬৫৬	১৫৬৯
অরুণাচল প্রদেশ	১৫৬৫	—	—	১৫৬৫
আন্দামান ও নিকোবর	১৫৫৪	—	—	১৫৫৪
মনিপুর	১৪৪৬	১৪৪৭	—	১৪৪৭
পশ্চিমবঙ্গ	৯২২	১৪২৯	২৪৯৬	১৪৪২
ত্রিপুরা	১১২৩	১৪৬৬	১৬৯৫	১৩৫৬
মেঘালয়	১০৩৮	১৪৬৭	১৯১৬	১৩৩৭
দাদরা, নগর হাভেলী	—	১২৯৫	—	১২৯৫
গুজরাট	১১৬৫	—	—	১১৬৫
আসাম	৪২৭	১২০৯	১২৬৮	১১০৮
উত্তর প্রদেশ	৯৮৬	১১৫৩	১০০০	১০৫০
উড়িষ্যা	৬০০	১১১৩	১৬৬৬	১০৩১
বিহার	৭৯৭	১০১৩	১৮২৬	৯৯৭
মিজোরাম	১০০০	৯৬৫	—	৯৭৬
নাগাল্যাণ্ড	৮০০	৯৭২	—	৮৯৯
হিমাচল প্রদেশ	৮৮৫	—	—	৮৮৫
রাজস্থান	৮৮০	—	—	৮৮০
মধ্যপ্রদেশ	৪৩৪	—	—	৮৩৪
সারাভারত	১২৬৯	১৩৩৮	২১৫৩	১৩৩৮

উৎস : রিপোর্ট, কৃষিমন্ত্রক, ভারতসরকার

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ধানের চাষযোগ্য জমি, মোট চালের উৎপাদন ও হেক্টার প্রতি গড় ফলন ২ (ক, খ, গ) সারনি ও চিত্র ১, ২ ও ৫ এর মাধ্যমে দেখানো হল। এগুলি থেকে পরিষ্কার হবে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য কতখানি। এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যের মধ্যে নিয়োজিত

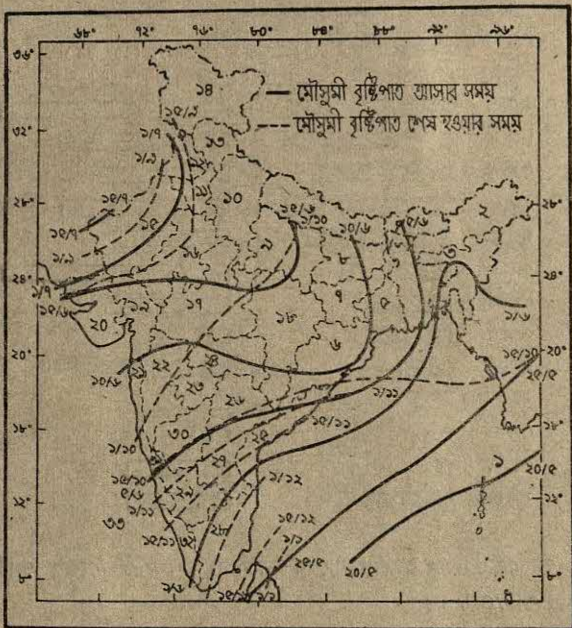


চিত্র ১ : ভারতে বিভিন্ন রাজ্যের ধানের চাষযোগ্য জমি ও চালের মোট উৎপাদন (১৯৮০-৮১)।



চিত্র ২ : ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৮১-৮২ সালের মধ্যে ভারতে চালের মোট উৎপাদন ও গড় ফলন।

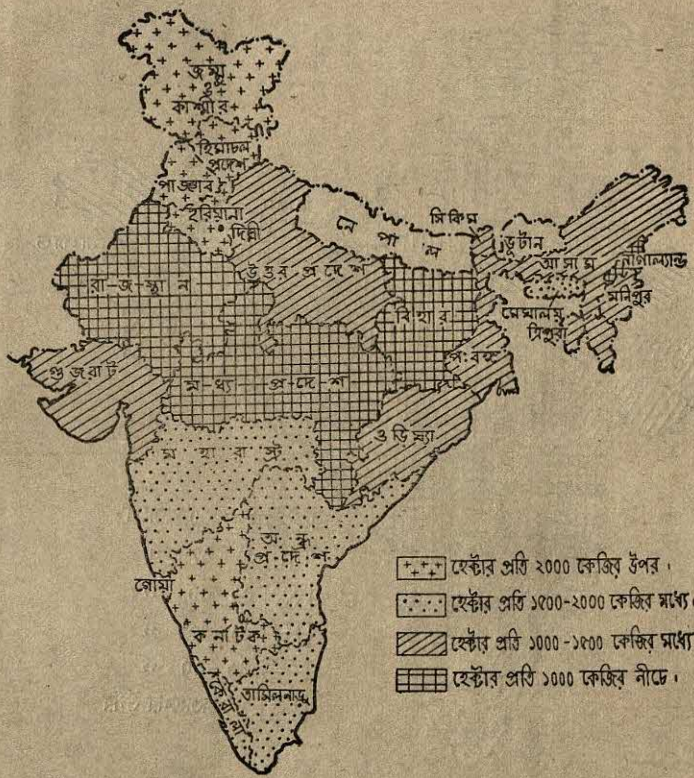
জায়গা, উৎপাদন ও গড় উৎপাদনের হারের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান দেখা যাবে। বিভিন্ন বিষয়ে এই যে ব্যবধান সাধারণতঃ মৌসুমী বায়ুর দ্বারা বৃষ্টিপাতের সময় (৩নং চিত্রে দেখানো হয়েছে), পরিমাণ ও বিস্তার (৪নং চিত্রে রয়েছে) ও সেচের সুবন্দোবস্তের উপর অনেকটা নির্ভর করে। একটি উদাহরণ থেকে



চিত্র ৩ঃ ভারতে মৌসুমী বৃষ্টিপাত আসার ও শেষ হওয়ার সময় (ইংরেজী মাসের তারিখ দেওয়া আছে)

১—উপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ
২—উত্তর আসাম
৩—দক্ষিণ আসাম
৪—পশ্চিমবঙ্গের উপহিমালয় অঞ্চল
৫—গাঙ্গীয় পশ্চিমবঙ্গ
৬—উড়িষ্যা
৭—বিহার উপত্যকা
৮—বিহার সমভূমি
৯—পূর্ব উত্তর প্রদেশ
১০—পশ্চিম উত্তর প্রদেশ
১১—হরিয়ানা
১২—পাঞ্জাব
১৩—হিমাচল প্রদেশ
১৪—জম্মু ও কাশ্মীর
১৫—পশ্চিম রাজস্থান
১৬—পূর্ব রাজস্থান
১৭—পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ
১৮—পূর্ব মধ্যপ্রদেশ
১৯—গুজরাট এলাকা
২০—সৌরাষ্ট ও কচ্ছ
২১—কন্‌কন
২২—মধ্য মহারাষ্ট্র
২৩—মারাথাওড়ারা
২৪—বিদর্ভ
২৫—উপকূলবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশ
২৬—তেলেঙ্গানা
২৭—রায়ালাসীমা
২৮—তামিলনাড়ু
২৯—দক্ষিণ কর্ণাটক
৩০—উত্তর কর্ণাটক
৩১—উপকূলবর্তী কর্ণাটক
৩২—কেরালা
৩৩—আরব সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ

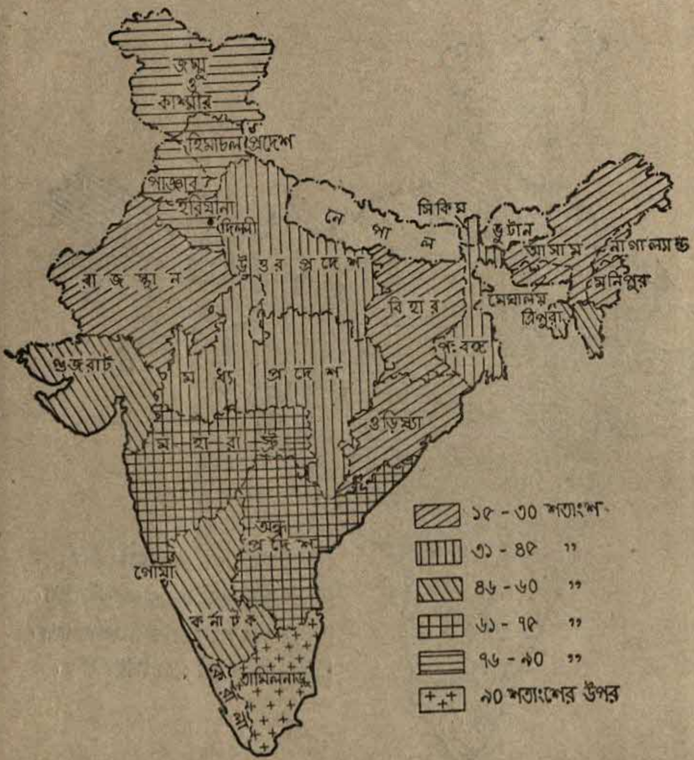
উৎস ঃ শ্রীনিভাসন, (১৯৮০)



চিত্র ৫ঃ ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে ধানের গড় ফলন (হেক্টার প্রতি কেজি) ১৯৮০-৮১।

কথাটি পরিস্কার হবে। দেশের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ আসাম, বিহার, মনিপুর, উত্তর পূর্বে পাহাড়ী অঞ্চল, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি জায়গায় শতকরা ৭৫ ভাগ জমির চাষ বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল। সর্বভারতীয় অনুপাতে এই এলাকা প্রায় ৪৫ শতাংশের মত হবে এবং উৎপাদনের দিক থেকে দেখলে তা দাঁড়াবে প্রায় ৪৩ শতাংশ।

ভারতে ধানের গড় ফলন এখন (১৯৮০-৮১ সালে) দাঁড়িয়েছে হেক্টার প্রতি ১.৩৩ টন। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের গড় ফলন সবার থেকে কম। হেক্টার প্রতি ০.৮৩ টন মাত্র। কারণ এখানে সেচের সুবিধা রয়েছে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ জমিতে। ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা যায় পাঞ্জাব ও তামিলনাড়ুতে। এসব জায়গায় সেচের সুবিধা রয়েছে প্রায় ৯০ শতাংশের



চিত্র ৬ : ভারতে অধিক ফলনশীল ধান চাষের নিয়োজিত এলাকা (শতকরা হিসাবে)।

মত এলাকায়। সেই সংগে অধিক ফলনশীল জাতের চাষও বেশী হয় (চিত্র ৬)। এসবের ফলে গড় ফলন (চিত্র ৫) দেখা যায় হেক্টার প্রতি ২ টনেরও বেশী।

তবুও আশার কথা এই যে ১৯৫১-৫২ সালে দেশে চালের উৎপাদন মাত্র ২১০ লক্ষ টন ছিল আর আজ (১৯৮০-৮১) তা ৫৩২ লক্ষ টনে (চিত্র ২) এসেছে। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল তথাপি বলা যায় উৎপাদন ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে।

ধান উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে ধানের চাষযোগ্য জমি, মোট চালের উৎপাদন ও হেক্টার প্রতি চালের গড় ফলন ৫ নম্বর সারণিতে দেখানো হল। এই তালিকাতে

সারণি ৩ : পশ্চিমবঙ্গে জেলাভিত্তিক ধানের নিয়োজিত জমি, মোট চালের উৎপাদন ও গড় ফলন (১৯৮০-৮১)

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা	শরৎকালীন ধান আউস			শীতকালীন ধান আমন			গ্রীষ্মকালীন ধান বোরো		
	নিয়োজিত জমি ('... হেক্টার)	চালের উৎপাদন ('... টন)	গড় ফলন (হেক্টার প্রতি কেজি)	নিয়োজিত জমি ('... হেক্টার)	চালের উৎপাদন ('... টন)	গড় ফলন (হেক্টার প্রতি কেজি)	নিয়োজিত জমি ('... হেক্টার)	চালের উৎপাদন ('... টন)	গড় ফলন (হেক্টার প্রতি কেজি)
২৪ পরগনা (উঃ)	১৬.৪	২২.৯	১৯৯৫	২২০.৫	৩৩৬.৫	১৫২৬	২৮.৬	৪৫.০	২৯৬৯
২৪ পরগনা (দঃ)	১.৮	২.৭	১৪৮৫	৩৬৬.৮	৪৫৯.৩	১২৫২	৫.৭	১৭.২	৩০২০
নদিয়া	৭৯.১	৭৮.৫	৯৯২	১০২.৪	২২৯.১	১২৬১	২৬.৯	৭৩.১	২৭২১
মুর্শিদাবাদ	৮১.৩	৭৫.৮	৯৩৩	১৯৮.৭	২৯০.২	১৪৬১	২২.৬	৫৫.৮	২৪৭৩
বর্ধমান	২৭.৪	৪৮.৬	১৭৭৪	৪২৮.১	৭৩৭.৭	১৭২৩	৯৩ ৯	২১৬.৪	২৩০৫
বীরভূম	৭.৯	১২.০	১৫২০	৩২৫.০	৫১৮.১	১৫৯৪	২৩.৭	৫৫.৭	২৩৪৯
বাঁকুড়া	৩০.০	৩২.৫	১০৮২	৩৪৫.৩	৫৫১.৫	১৫৯৭	৫.৬	৮.১	১৫২৩
মেদিনীপুর (পূঃ)	৫.৫	৭.৪	১৩৫২	৩৮৪.৪	৪৭৩.৫	১৩৫৭	৩৫.৬	১০৮.৮	৩০৫৭
মেদিনীপুর (পঃ)	৮৬.২	৪৮.১	৯৭৯	৪৫২ ৪	৩৯০.২	১৩০৫	১২.২	২৭.৫	২২৪৬
হুগলী	১১.৯	২০.০	১৬৭৬	১৮৪.৪	৩৫৫.৩	১৯২৭	৫৬.৯	১৩৩.৯	২৩৫৩
হাওড়া	১.৫	১.৯	১২৭৩	৮২.৪	১৩৪.৫	১৬৩৩	৬.৩	১৪.৯	২৩৫৪
জলপাইগুড়ি	৬৪.৭	৫২.৬	৮১২	১৯৯.৯	২৪১.৮	১২১০	০.১	০.৩	২৩৯৬
দার্জিলিং	৬.৯	৫.১	৭৪৭	৩৬.২	৪৭.৭	১৩১৮	—	—	—
মালদহ	৪২.৯	২৫.৩	৫৯০	১৩৭.৯	২০৪.০	১৪৮০	২২.১	৫৮.১	২৬২৫
পঃ দিনাজপুর	৯৯.৬	৭২.৪	৭২৭	৩৫১.৮	৪০৪.৮	১১৫০	৫.৯	৯.২	১৫৬৭
কোচবিহার	৮৬.৯	৬৯.২	৭৯৬	১৪৫.৭	২০৮.২	১১২১	০.১	০.৩	২৩৯৬
পুরুলিয়া	২.১	১.৪	৬৬৮	২৪৮.৭	৩৪১.৬	১৩৭৩	০.২	০.৩	১৫২২
পশ্চিমবঙ্গ	৬১৫.১	৫৭৬.৪	৯৩৭	৪২১৪.৬	৬০২৪০	১৪২৯	৩৪৬.৫	৮৬৫.২	২৪৯৭

উৎস : কৃষি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ

বিশেষ করে প্রত্যেক জেলায় আউস, আমন ও বোরো ধানের চাষ কতখানি হয় তা বলা হয়েছে। মোট ৫১.৮ লক্ষ হেক্টারে ধানের চাষ হয় এবং এই এলাকা থেকে মোট চালের উৎপাদন পাওয়া যায় ৭৪.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আউস হিসাবে ৩.১৫ লক্ষ, আমন হিসাবে ৪২ লক্ষ ও বোরো হিসাবে ৩.৫ লক্ষ হেক্টারে ধানের চাষ হয়। হিসাবে দেখা যায় (মণ্ডল, ১৯৭৭-৭৮) পশ্চিমবঙ্গে আউস ধান চাষের এলাকায় ৩৫ শতাংশে অধিক ফলনশীল ধান ও ৬৫ শতাংশে দেশী ধানের চাষ হয়। একইভাবে আমন মরসুমে ২০ শতাংশ এলাকায় অধিক ফলনশীল ও ৮০ শতাংশে দেশী ধানের চাষ থাকে। অনুরূপভাবে বোরো খন্দে ৯৫ শতাংশে অধিক ফলনশীল ও ৫ শতাংশে মাত্র দেশী ধানের চাষ হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে যেসব অধিক ফলনশীল ধানের জাত রয়েছে তা দিয়ে কম পক্ষে ৫০ শতাংশ আউস, ৩৫ শতাংশ আমন ও ১০০ শতাংশ এলাকায় বোরো ধানের চাষাবাদ সম্ভব।

গড় ফলনের দিক থেকে দেখলে দেখা যায় আউস খন্দে অধিক ফলনশীল জাতে হেক্টার প্রতি ১.৪ টন এবং দেশী ধানে ০.৭ টন ফলন পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে আমন মরসুমে যথাক্রমে ২.০ টন ও ১.২ টন এবং বোরোতে ২.৭ টন ও ১.৭ টন হিসাবে পাওয়া সম্ভব। সব সময় বোরো খন্দের গড় ফলন অন্য দুই মরসুমের থেকে বেশী হয়।

পশ্চিমবঙ্গে ধানচাষে কি কি সুবিধা বা অসুবিধা রয়েছে তা শেষ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হল।

পশ্চিমবঙ্গে তিনটি মরসুমে ধানের চাষ হয়। যেমন—

আউস ধান (শরৎকালীন ধান) এর জীবনকাল উত্তরবঙ্গে মার্চ থেকে জুলাই কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে মে থেকে অক্টোবর।

আমনধান (শীতকালীন ধান) সাধারণতঃ জীবনকাল জুন/জুলাই থেকে ডিসেম্বর।

বোরোধান (গ্রীষ্মকালীন ধান) এর জীবনকাল ডিসেম্বর থেকে মে

পশ্চিমবঙ্গের মত ভারতের অন্যান্য অনেক জায়গাতে এইভাবে বিভিন্ন সময়ে ধানের চাষ হয়। আঞ্চলিক ভাষায় এদের নাম অবশ্য ভিন্ন। ৪ নম্বর সারণিতে এবিষয়ে বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন ঋতুতে হয় বলে এদের নামকরণ সেইভাবে হয়ে থাকে। এই তিনটি ঋতুতে ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে কত পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ হয়, কত উৎপাদন হয় ও তাদের গড় ফলন কতখানি তা ২নং ও ৩নং সারণিতে দেখানো হয়েছে।

1 পদ্ধতি

ফসল কাটার সময়	পরিচর্যা পদ্ধতি
(৭)	(৮)
াগাষ্ট / সেপ্টেম্বর ভেম্বর / ডিসেম্বর প্রিল	বেশীর ভাগ বৃষ্টির উপর নির্ভর করে ছিটিয়ে বোনা হয়। রোয়া ধান খুব কম জায়গায় হয়। যেসব জায়গায় বন্যা বেশী হয় সেখানে ভাসমান ধান চাষ হয়।
াগাষ্ট / সেপ্টেম্বর ভেম্বর / ডিসেম্বর ার্চ / এপ্রিল	বেশীর ভাগ বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। তৃতীয় শস্য সেচ সেবিত। বোনা এবং রোয়া উভয় প্রকারে হয়।
াগাষ্ট / সেপ্টেম্বর ডসেম্বর/জানুয়ারী ার্চ / এপ্রিল	বেশীর ভাগ এলাকায় ছিটিয়ে বোনা, গ্রীষ্মকালীন ফসল সেচ পায়, রোয়াও আছে।
ক্টোবর / নভেম্বর এপ্রিল / মে	বেশীর ভাগ রোয়া, ৯০ শতাংশের মত জায়গায় সেচের সুবিধা রয়েছে। তেলেঙ্গনায় ছিটিয়ে বোনা হয়।
সপ্টেম্বর জানুয়ারী/ফেব্রুয়ারী ার্চ / এপ্রিল	বেশীর ভাগ জায়গায় ছিটিয়ে বোনা হয়, দ্বিতীয় শস্য রোয়া হয়, ২০ শতাংশ জায়গায় সেচের ব্যবস্থা রয়েছে।
সপ্টেম্বর / অক্টোবর ডসেম্বর/জানুয়ারী এপ্রিল	বেশীর ভাগ রোয়া, ৮৫ শতাংশ জায়গায় সেচের সুবিধা রয়েছে।
ক্টোবর/নভেম্বর ার্চ	রোয়া অথবা পু'তে দেওয়া, সেচ অথবা বৃষ্টি সেবিত।
ডসেম্বর ম	রোয়া অথবা বোনা, সেচের সুবিধা রয়েছে।
অক্টোবর/নভেম্বর	বেশীর ভাগ বোনা ও বৃষ্টি সেবিত। ১০-১৫ শতাংশ এলাকায় সেচের সুবিধা রয়েছে। ঐসব এলাকায় রোয়া হয়।
সেপ্টেম্বর / অক্টোবর নভেম্বর / ডিসেম্বর মার্চ / এপ্রিল	বোনা ও রোয়া উভয় প্রকার হয়, বেশীর ভাগ বৃষ্টি সেবিত, সেচের সুবিধা খুব কম।
নভেম্বর / ডিসেম্বর	ধান পূর্বাঞ্চলে বেশী হয়। বর্ষা সেবিত এলাকায় বোনা এবং সেচ সেবিত এলাকায় রোয়া হয়।
নভেম্বর	পাহাড়ী এলাকায় বর্ষা সেবিত ও সমতলে সেচ সেবিত ও রোয়া হয়।
সেপ্টেম্বর	টেরাস জমিতে বোনা হয়।

অধ্যায় দুই

ধানগাছের আকৃতি

(Morphology of Rice Plant)

অধ্যায় দুই

ধানগাছের আকৃতি

ধান একবর্ষজীবি ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে পড়ে। এর কাণ্ড অনেকটা গোল, ফাঁপা এবং পর্ব থাকে। পাতা পাতলা, সরু ও লম্বাটে। শীষ সবার উপরে থাকে। জল জমা নীচু জায়গা ও উঁচু উভয়প্রকার জমিতে জন্মাতে পারে। ধান গাছের বিভিন্ন অংশের আকৃতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

মুল বা শিকড় (Root)

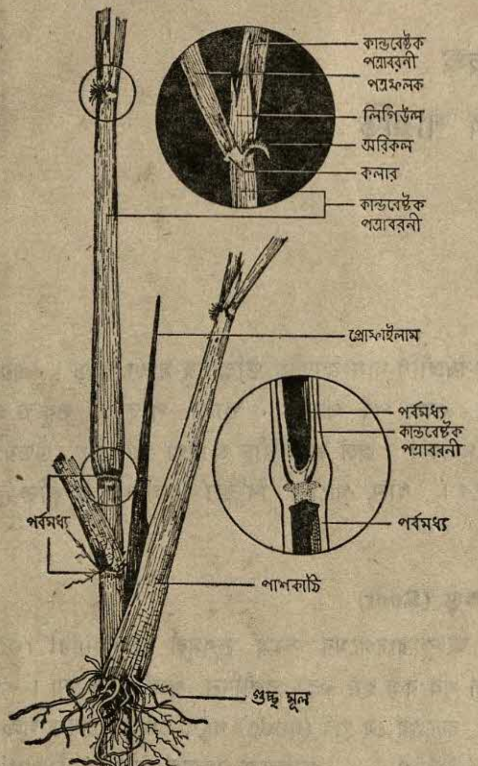
বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় ভ্রূণমূল (Seminal root) বের হয়, তার শাখামূল খুব কম হয় এবং বেশীদিন স্থায়ী হয় না। তার পরিবর্তে মাটির নীচে কাণ্ডের যে পর্ব (node) থাকে সেখান থেকে গুচ্ছ আকারে নতুন মূল বের হয় (চিত্র ৭)। এগুলিকে গুচ্ছমূল বলে (adventitious root) এবং শেষ অবধি থেকে গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

কাণ্ড (Culm or Stem)

কয়েকটি পর্ব ও পর্বমধ্য মিলিয়ে কাণ্ড (চিত্র ৭)। পাতা পর্ব থেকে বের হয়। কোন কোন পর্বে পাশকাঠি বেরুবার কুঁড়ি বা কাক্ষিকমুকুল থাকে। বয়স বেশী হলে পর্বমধ্যর কাণ্ড কিছুটা ফাঁপা হয়। কাণ্ডে কোন রোঁয়া থাকে না। বয়স বাড়ার সংগে সংগে পর্বমধ্যের দৈর্ঘ্য ও পরিধি উভয়ই বাড়তে থাকে। তবে সাধারণতঃ নীচের অংশে পর্বমধ্য ছোট ও মোটা হয় এবং পর্বগুলি অনেকটা গায়ে গায়ে লেগে থাকে।

পাতা (Leaf)

কাণ্ডের সংগে পাতার গোড়া যেখানে মেশে সেখানটা জ্যামিতির কোনের মত দেখতে লাগে। প্রত্যেকটি পাতার নীচের অংশ কাণ্ডকে জড়িয়ে থাকে।

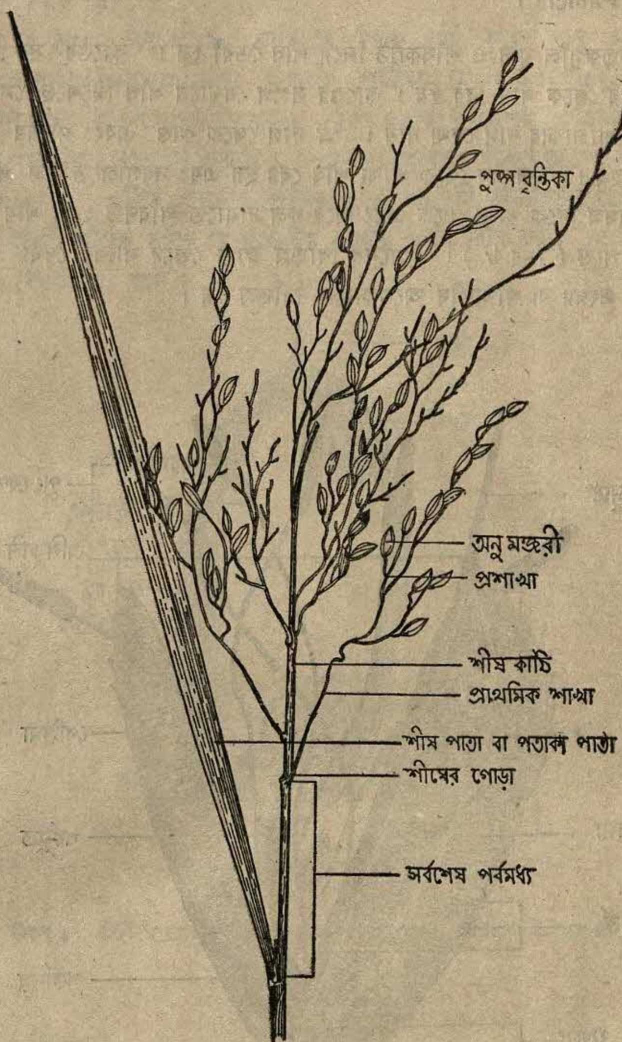


চিত্র ৭ঃ প্রধান কাণ্ড ও পাশ কাঠির বিভিন্ন অংশ।
[উৎস ঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই. ১৯৭০]

তাকে কাণ্ডবেষ্টক পত্রাবরণী (Leaf sheath) বলা হয়। শীষের ঠিক নীচে গাছের সব থেকে উপরে পাতাটি থাকে। ঐ পাতাটি হল শীষ পাতা (Flag leaf) (চিত্র ৭)।

পাতার শিরাবিন্যাস সমান্তরাল। পাতার পিছনের দিকে মাঝে যে শিরাটি থাকে তার নাম মধ্যশিরা (Mid rib)। মূল কাণ্ড থেকে বেশীর ভাগ পাতা বের হয়। দেরীতে পাশকাঠি বের হলে পাতার সংখ্যা কম হয়। পাশকাঠির একেবারে গোড়ায় যে পাতাটি বের হয় তার কোন ফলক থাকে না, দুটি নৌকোর মত মঞ্জরীপত্র থাকে। তাকে প্রোফাইলাম বলে।

অন্যদিকে পাতার গোড়ার দিকে দুটি করে সূতোর মত অংশ দেখা যায়। তাদের আরিকল (Auricle) বলে। এই আরিকলের ঠিক উপরে ত্রিভুজ

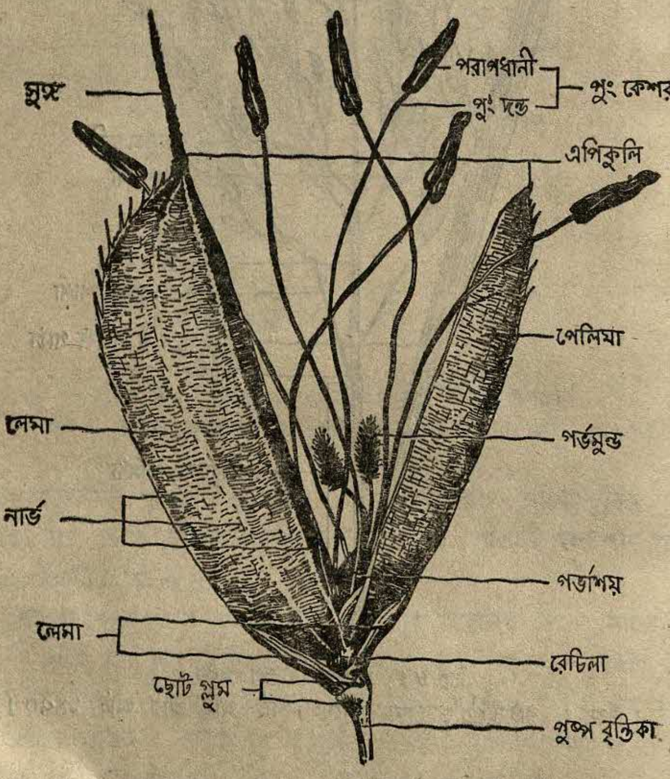


চিত্র ৮ঃ শীষের বিভিন্ন অংশ।
[উৎস ঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই. ১৯৭০]

আকৃতির পাতলা কাগজের মত একটা অংশ দেখা যায় তাকে লিগিউল (Legule) বলে।

শীষ (Panicle)

কতকগুলি ফুল ও শীষকাঠি নিয়ে শীষ তৈরী হয়। কাণ্ডের সব থেকে শেষ পর্ব থেকে শীষ বের হয়। কাণ্ডের সংগে যেখানে শীষ মিশেছে সেখানে একটি গোলাকার দাগ দেখা যায়। ঐ দাগ থেকে কাণ্ড এবং শীষের দৈর্ঘ্য মাপা হয়। মূলশীষ থেকে শাখা শীষ বের হয় এবং সবগুলিতে ফুল থাকে। শীষ প্রথম দিকে খাড়া থাকে এবং পরে ফুল দানাতে পরিণত হলে শীষ ভারে নুইয়ে পড়ে (চিত্র ৮)। ধানের বিভিন্ন জাত ভেদে শীষের দৈর্ঘ্য, ওজন, ফুলের সংখ্যা বা শাখাশীষ অনেকাংশে বিভিন্ন হয়।

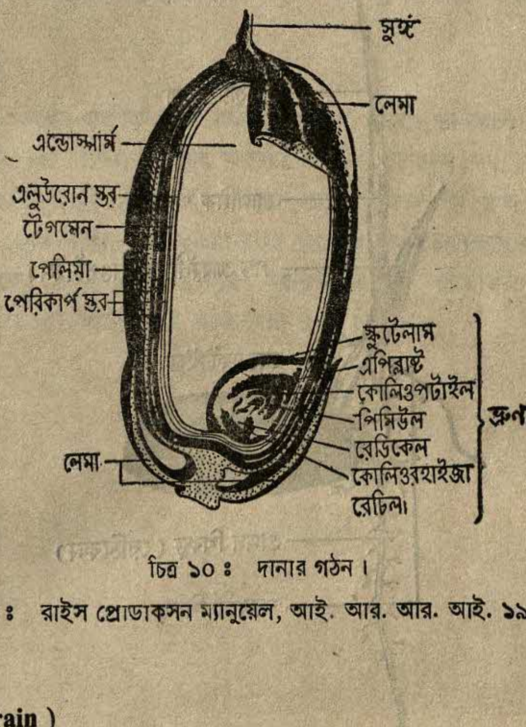


চিত্র ৯ ঃ ফুলের বিভিন্ন অংশ।

[উৎস ঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই. ১৯৭০]

অনুমঞ্জরী (Spikelet)

প্রতি ফুলে (চিত্র ৮, ৯) বাহিরের দিকে দুটি করে 'গ্লুম' থাকে। একটিকে বলে (Lemma) এবং অপরটি প্যালিয়া (Palea)। এই দুটির মধ্যে ফুলের বাকি অংশ ঢাকা থাকে। ফুলে ছয়টি পুংকেশর (Stamen) ও একটি গর্ভস্তবক (Pistil) রয়েছে। পুংকেশর পুংদণ্ড ও দুকোষযুক্ত পরাগধানী (Anther) দ্বারা গঠিত। ফুলের গোড়ার দিকে স্বচ্ছ দুটি লডিকিউল রয়েছে। সম্পূর্ণ ফুলটি শীষের সংগে যে দণ্ডে যুক্ত রয়েছে তাকে শীষ কাঠি বা পুষ্প-বৃন্তিকা (Pedicel) বলে।



চিত্র ১০ : দানার গঠন।

[উৎস : রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই. ১৯৭০]

দানা (Grain)

ধানের দানায় (চিত্র ১০) পাকা ডিম্বক, লেমা, প্যালিয়া ও র‍্যাচিলা থাকে। কোন কোন জাতের ক্ষেত্রে সূঁচের মত সুঙ্গ (Awn) দানার উপরের দিকে থাকে। ভ্রূণটি শাঁসের মধ্যে মিশে থাকে। লেমা ও প্যালিয়া ও তাদের অন্যান্য অংশ মিলিয়ে খোসা তৈরী হয় (Hull or husk)। ধানকে একটু চাপ দিয়ে ঘসা দিলে খোসাটা ছেড়ে যায়। খোসা ছাড়ানো ধানকে বলে

বাদামী চাল (Brown rice) ! যন্ত্র দ্বারা পালিশ করা হলে বাদামী খোসাটা উঠে যায় (Pericarp) এবং চালের রঙ সাদা হয় বা স্বচ্ছতা বাড়ে। ভ্রূণটি দানার পেটের দিকে ঠিক লেমার উপর থাকে। বাকি অংশ শর্করা জাতীয় শাঁসে (endosperm) পরিণত হয়। ভ্রূণের ঠিক কাছে একটা দাগ থাকে সেটির নাম হাইলাম। ঐ জায়গাটিতে প্যালিয়ার সংগে শাঁস মিলে থাকে।



চিত্র ১১ঃ চারার বিভিন্ন অংশ।

[উৎস ঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই. ১৯৭০]

চারার আকৃতি

পুরোপুরি পাকা ধানের দানাকে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার মধ্যে রাখলে ভ্রূণ (চিত্র ১১) থেকে মূল শিকড় একটি আবরণ (কলিওরহাইজা) নিয়ে কাণ্ডের আগে বেরিয়ে আসে যদি বীজটিকে জলে অঙ্কুরোদগমের জন্য রাখা যায় তাহলে শিকড়ের আগে কাণ্ডটি একটি আবরণ (কলিওপটাইল) নিয়ে বেরিয়ে আসে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে মূল শিকড় ঐ আবরণ থেকে বেরিয়ে আসে এবং মাটিতে ঢুকে যায়। এই শিকড় বেশীদিন থাকে না তার বদলে আস্থানিক গুচ্ছমূল বের হয়। এই গুলিই শেষপর্য্যন্ত থাকে।

সারাংশ

ধান গাছের মত অন্যান্য সেযব গাছপালা রয়েছে তা থেকে একে আলাদা করার জন্য এর বিভিন্ন অংশের আকৃতি জানার প্রয়োজন দেখা দেয়। এছাড়া অনেক সময় উদ্ভিদ প্রজননবিদ, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ববিদ বা শস্য উৎপাদনবিদ বা অন্য কোন শাখার বিশেষজ্ঞরা একই অংশের নাম ভিন্নভাবে বলে থাকেন। তাই সকলের একই শব্দ ব্যবহার করার ও জানার প্রয়োজন হয়। এই অধ্যায়ে চিত্রের সাহায্যে তাই জানানোর চেষ্টা হয়েছে।

অধ্যায় তিন

ধান গাছের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ

(Plant Growth and Development of Rice)

অধ্যায় তিন

ধান গাছের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ

ধানের পরাগ সংযোগ ও নিষিক্তিকরণ

ধান গাছের ফুল ফোটার সময় হলে লডিকিউল স্ফীত হয় এবং লেমা ও প্যালিয়া খুলে যায়। পরাগদণ্ড লম্বা হতে থাকে, দিনের বেলায় ৯-০০টা থেকে ১৫-০০টার মধ্যে ফুলের পাঁপড়ি সামান্য খুলে যায়। কোন ধরণের ধানের জাত লাগানো হয়েছে এবং আবহাওয়া কেমন হবে তার উপর পাঁপড়ি খোলার সময় ঠিক হয়। যেমন উজ্জ্বল দিবালোকে কিছুটা আগে এবং আর্দ্র বা মেঘলা দিনে দেরীতে খোলে। এবার পরাগধানী থেকে পরাগরেণু ছড়িয়ে পড়ার পরেই লেমা ও প্যালিয়া গুটিয়ে আসে ও উভয়ে আগের মত জুড়ে যায়। এই ঘটনার ফলে পরাগরেণু গর্ভদণ্ডে পড়ে ও পরাগ সংযোগের কাজ শেষ হয়।

একটি পরাগরেণুর সংগে একটি ডিম্বকের মিলনে একটি ভ্রূণের উৎপত্তি হয়। এর ফলে নিষিক্তিকরণের কাজও শেষ হয়। এই দুটি কাজ শেষ হওয়ার পর ধানের দানা বাড়তে আরম্ভ করে।

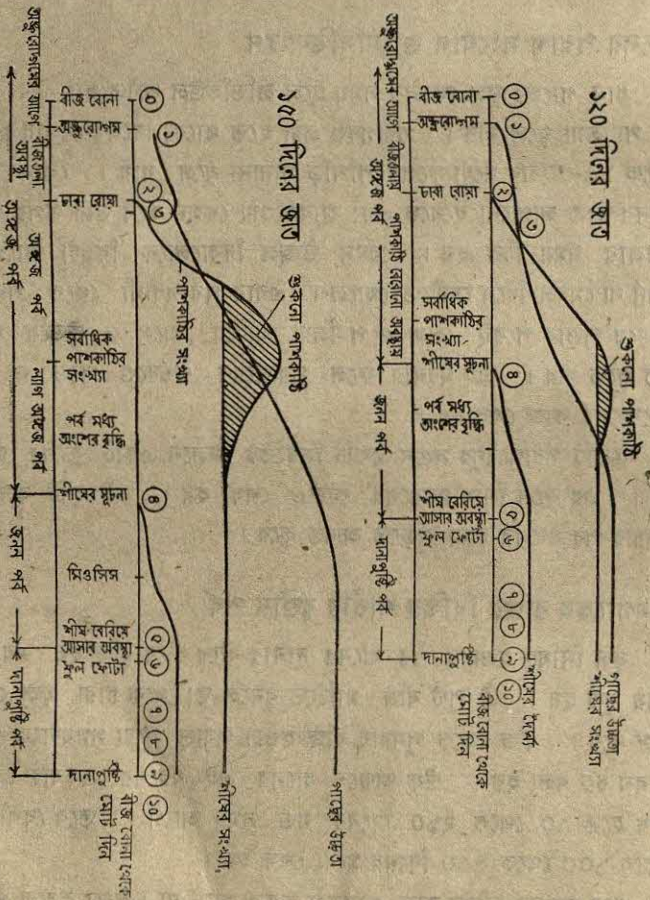
ধানগাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন শারীর বৃত্তীয় পর্ব

ফুল নিষিক্ত হওয়ার পর ধানের দানার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয় এবং এক সময় পুষ্ট হয়। ঐ পুষ্ট বীজ মাটিতে বুনলে তা থেকে চারা, ফুল ও শেষে বীজ ধরে। বীজ থেকে পুনরায় বীজ হওয়া পর্য্যন্ত পুরো সময়টাকে ধানের জীবন চক্র বলা হয়। উষ্ণ অঞ্চলে ধানের এই ধরণের একবার জীবনচক্র শেষ হতে ৯০ থেকে ২১০ দিনের মত সময় লাগে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ১০০ থেকে ১৫০ দিনের মধ্যে শেষ হয়।

ধান গাছের জীবন কাল একরকম ভাবে কাটে না। লক্ষ্য করলে প্রধানতঃ তিনটি পর্ব বিশেষভাবে দেখা যাবে। শরীরের বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ্য করে

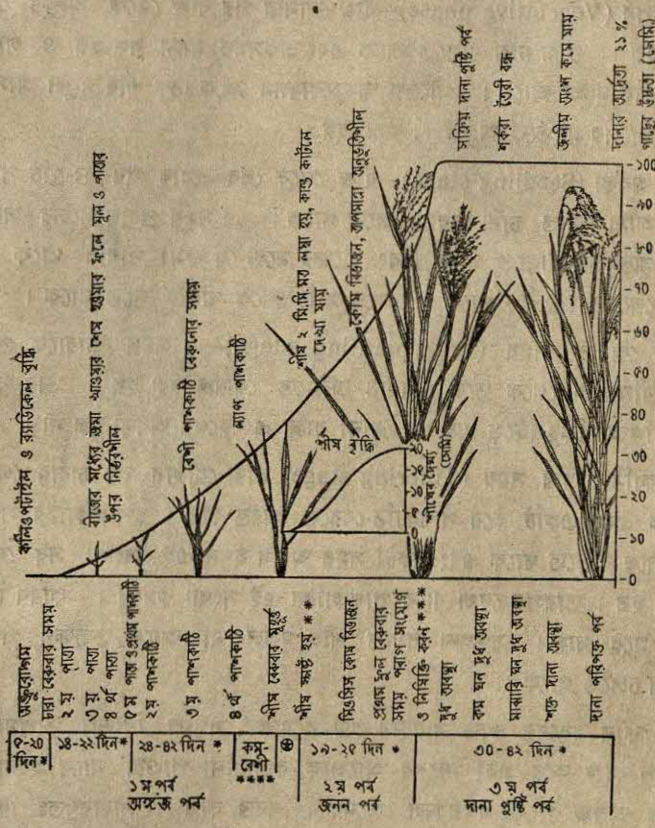
প্রধান পর্বগুলিকে পুনরায় কতকগুলি ভাগে ভাগ করা যায়। নীচে সেগুলি দেখানো হল।

- **অঙ্গজ পর্ব**
  - চারা অবস্থা
  - রোয়ার সময়
  - পাশকাঠি হওয়ার সময়
- **জনন পর্ব**
  - শীষ মুকুল আরম্ভের সময়
  - থোড় অবস্থা
  - পত্রাবরণী থেকে শীষ বেরুবার সময়
  - ফুল ফোটার সময়
- **দানা পুষ্টি পর্ব**
  - দানার দুধ অবস্থা
  - দানার ঘন দুধ অবস্থা
  - পরিপক্ক পুষ্ট দানা অবস্থা



চিত্র ১২ (ক) বিভিন্ন জাতের ধানের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণের বিভিন্ন পর্ব

[উৎস : রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই, আর, আর, আই, ১৯৭০]



চিত্র ১২ (খ) ধানের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণের বিভিন্ন পর্ব

* ৩-৫ দিনের পার্থক্য থাকে। ●উষ্ণ অবস্থায় নীচের দিনের সংখ্যা ও ঠাণ্ডা অবস্থায় বড় দিনের সংখ্যা হিসাব করতে হবে।

** শীষ স্পষ্ট হওয়ার অবস্থা থেকে জনন পর্ব আরম্ভ ধরতে হবে। এ অবস্থা একমাত্র কাণ্ডকে লম্বালম্বি কাটলে বোঝা যায়। এ অবস্থায় শতকরা ৩০ ভাগের মত প্রধান কাণ্ডে ২ মিমি বা তার থেকেও বড় ধরণের লম্বা শীষ দেখা যায়।

*** যখন ৫০ শতাংশের মত ফুলে পরাগ সংযোগ হয় তখন তৃতীয় পর্ব আরম্ভ হয়।

**** বিভিন্ন জাতের উপর নির্ভর করে এই সময় ০ থেকে ২৫ দিনের মত কমে বা বা বাড়ে।

[উৎস ঃ প্রিন্সিপল ও প্রাকটিক্স—রাইস প্রোডাকসন, ১৯৮২]

অঙ্গজপর্ব (Vegetative phase)—বীজ বোনার পর বীজ থেকে অঙ্কুর বের হয়। ক্রমে চারা বাড়তে থাকে এবং একসময় বাড়া বন্ধ হয় ও গাছে শীষ মুকুল আসে। বীজের অঙ্কুরোদগম থেকে ঠিক শীষ মুকুল আসার আগের মুহূর্তকে অঙ্গজপর্ব বলা হয়।

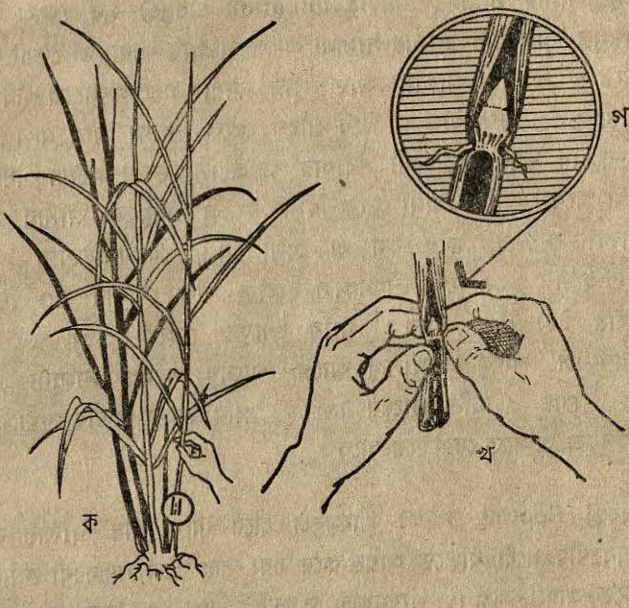
চারা অবস্থা (Seedling stage)—বীজ থেকে বের হবার পর ৪-৫টি পাতা আসা পর্য্যন্ত চারা অবস্থা চলতে থাকে। এ সময় প্রধান মূলের সংগে গুচ্ছমূলও বাড়তে থাকে এবং বীজের মধ্যে যে জমা খাবার থাকে তা খেয়ে চারা বেঁচে থাকে। পরে মাটি থেকে খাবার নিতে থাকে।

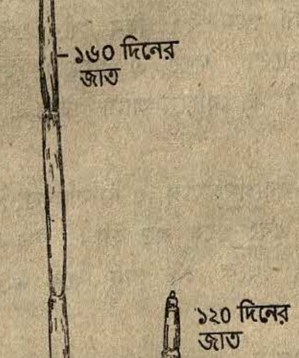
চারা রোয়ার সময় (Transplanting stage)—এ সময় চারাকে প্রথম বীজতলা থেকে তুলে পুনরায় জমিতে রোয়া করা হয়। তার ফলে শিকড় কিছু ছিঁড়ে যায়। বোনা ধানে এ ধরণের অবস্থা হয় না।

পাশকাঠি ছাড়ার সময় (Tillering stage) চারা রোয়ার পর চারার গোড়া থেকে এক একটি করে পাশকাঠি বেরুতে আরম্ভ করে। পাশকাঠির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এবং একটা সময় আসে যখন এই সংখ্যা সব থেকে বেশী হয়। তারপর দেখা যাবে পাশকাঠির এই সংখ্যা কমছে। কারণ কিছু কিছু মরে যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শীষ মুকুল না আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এরূপ চলতে থাকে।

কোন ধরণের জাত ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি বিভিন্ন তাপমাত্রায় কিরূপ কাজ করে এবং দিনের আলোক কতখানি পাওয়া যাবে ইত্যাদির উপর অঙ্গজ পর্বের সময়কাল অনেকটা নির্ভর করে। সাধারণতঃ দিনের আলো ও তাপমাত্রার হ্রাস বৃদ্ধির উপর অঙ্গজপর্ব বড় বা ছোট হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় গাছের পাশকাঠির সংখ্যা কমে আসার পরই শীষ মুকুল এসে যায়। কিন্তু আবার কোন জাতের ক্ষেত্রে দেখা যায় পাশকাঠির সংখ্যা কমে যাওয়ার পর শীষ মুকুল আসতে একটু সময় নেয়। এইভাবে শীষ মুকুল আসার জন্যে কিছুদিনের অপেক্ষা করার অন্তরকে অপেক্ষামাণ অঙ্গজপর্ব বলে (lag vegetative phase)।

জননপর্ব (Reproductive stage)—বিভিন্ন ধানের জাত ও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে সব থেকে বেশী সংখ্যক পাশকাঠি হওয়ার ঠিক আগে অথবা পর থেকেই এই পর্বের সূচনা হয়। অতি সূক্ষ্ম আকারে শীর্ষ মুকুল হওয়ার মুহূর্তটি এই পর্ব চিহ্নিত করে এবং ফুল ফোটা পর্য্যন্ত চলতে থাকে। এই সময়কাল মোটামুটিভাবে ২৫-৩০ দিনের মত।





চিত্র ১৩ঃ শীষ মুকুল আসার সময় কাণ্ডকে লম্বালম্বিভাবে কাটলে এ ধরণের শীষ মুকুল দেখা যায়।

[উৎস ঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আন্তর্জার্তিক ধান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৭০]

শীষমুকুল আসার সময় (Panicle initiation stage)—সব থেকে বেশী সংখ্যায় পাশকাঠি আসার সামান্য আগে বা পরে শীষমুকুল তৈরী হতে পারে। শাখার আগায় অতি সূক্ষ্ম রোঁয়ার মত আকারের শীষমুকুল (চিত্র ১৩) দেখা যায়। তবে বাহির থেকে বোঝা যায় না। খুব সতর্কতার সংগে পত্রাবরণী সরাবার পর লম্বালম্বিভাবে কাটলে শীষমুকুল দেখা যাবে। বীজ বোনা থেকে হিসাব করলে শীষমুকুল আসার সময় বিভিন্ন জাতেব ক্ষেত্রে কম বা বেশী হয়। মোটামুটিভাবে জলদি জাত হলে (১০৫ দিন জীবনকাল হলে) বীজ বোনার ৪০ দিনের মাথায় ইহা দেখা যাবে! নাবি জাতের ক্ষেত্রে (১৩৫-১৬০ দিন জীবনকাল) শীষমুকুল আসার আগে গোড়ার পর্বমধ্য সামান্য বেড়ে যায় (প্রায় ১ মিলিমিটারের মত)। আর জলের অভাব দেখা দিলে শীষমুকুল আসতে দেরী হয়ে যাবে।

থোড় অবস্থা (Booting stage)—শীষমুকুল ধীরে ধীরে শীষ পাতার নীচে পত্রাবরণীর মধ্যে বাড়তে আরম্ভ করে এবং তার ফলে পত্রাবরণী ক্রমান্বয়ে ফুলতে আরম্ভ করে। শীষমুকুল আসার প্রায় ১৬ দিন পরে এই ফোলাটা সাধারণতঃ চোখে পড়ে।

শীষ ফুটে বেরিয়ে আসা (Heading)—থোড় অবস্থার শেষের দিকে শীষ পত্রাবরণী থেকে বেরিয়ে আসে।

ফুল ফোটা (Flowering)—এ সময় পরাগসংযোগ ও নিষিক্তিকরণের জন্য ফুলটি ফোটে। শীষমুকুল আসার প্রায় ২৫ দিন পরে এই ফুল ফুটতে দেখা যায়। যেকোন জাতের ক্ষেত্রে এ সময়টা মোটামুটি একই থাকে। থোড় থেকে সবকটি ফুল বেরিয়ে আসা পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে।

দানাপুষ্টি পর্ব (Maturation stage)—পরাগসংযোগ ও নিষিক্তিকরণের পর দানা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং ক্রমে শক্ত হয়। উষ্ণ অঞ্চলে সাধারণতঃ নিষিক্তিকরণের পর ২৫ থেকে ৩৫ দিন ধরে এই পর্ব চলতে থাকে।

দানার দুধ অবস্থা (Milk stage)—প্রথমে দানার খোসার মধ্যে দুধের মত তরল পদার্থ দেখা যায়। দানা চাপ দিলে সাদা তরল পদার্থ বেরিয়ে আসে।

দানার ঘন দুধ অবস্থা (Dough stage)–দানার মধ্যে দুধের মত পদার্থ ধীরে ধীরে ঘন হতে থাকে। পুরোমাত্রায় শক্ত না হয়ে কিছুটা নরম থাকে।

পরিপক্ক বা পুষ্ট দানা (Maturation stage)—এই অবস্থায় শীষের দানার রঙ সবুজ থেকে হলদেটে হতে আরম্ভ করে এবং সেই সংগে শক্ত, পরিপক্ক ও পুষ্ট হয়। এই অবস্থা শেষ হয় যখন শীষের ৯০-১০০ শতাংশ দানার রঙ হলদেটে হয়। দানা পাকতে আরম্ভ করলে পাতা ঢলে পড়ে, গাছের গোড়ার দিকের রঙ হলদেটে হয়। এই রঙের পাতা বা কাণ্ডের সালোক সংশ্লেষের ক্ষমতা একপ্রকার থাকেই না বলা যেতে পারে। এগুলিকে খড় হিসাবে গণ্য করা হয়। অনেক অধিক ফলনশীল ধান রয়েছে যেগুলি পাকার সময়ও পাতার রঙ কিছুটা সবুজ থাকে। তাই পাতার রঙকে ফসল পাকার লক্ষণ হিসাবে ধরাটা ঠিক হবে না।

মুড়ী ধান (Ratoon Rice)—অনেক সময় জমিতে যদি জল থাকে এবং উর্বরতার মান যথেষ্ট পরিমাণে থাকে তাহলে ধান কেটে নেওয়ার পরও গাছের গোড়া থেকে নতুন পাশকাঠি বের হতে দেখা যায়! তবে পাশকাঠির সংখ্যা বেশ কম হয় এবং ফলনও নামমাত্র পাওয়া যায়।

বিভিন্ন পর্ব কত সময় ধরে থাকবে

বিভিন্ন পর্ব	বোনা থেকে কত সময় লাগবে	দানা পাকার কত আগে ঘটবে
শীষমুকুল আসার সময়	মোটামুটি ১৩০ দিনের বা যেকোন ঋতুতে হয় এরূপ জাতের ক্ষেত্রে ৭০ দিন সময় লাগে	যেকোন জাতের ক্ষেত্রে প্রায় ৭০ দিন লাগে
থোড় আসার সময়	ঐরূপ জাতে ৭৫ দিনের মত লাগে	৫৫ দিন লাগবে
ফুল ফোটা	ঐরূপ জাতে ১০০ দিনের মত লাগে	২৫ থেকে ৩০ দিন

বিভিন্ন পর্ব	কত সময়ের জন্য
অঙ্গজপর্ব—	বেশীর ভাগ জাতে ২৫ থেকে ৬৫ দিন থাকে
ল্যাগ অঙ্গজপর্ব—	আলোক সংবেদনশীল জাতের ক্ষেত্রে বেশী সময় ধরে দেখা যায় কিন্তু যে সব জাত আলোক সংবেদনশীল নয় তাদের এ পর্ব খুব কম সময়ের জন্য দেখা যেতে পারে।
জনন পর্ব—	যেকোন জাতের জন্য প্রায় ৩৫ দিনের মত।
পাকার সময়—	যেকোন জাতে প্রায় ২৫ থেকে ৩৫ দিনের মত সময় নেয়। পাকার সময় তাপমাত্রা বেশী থাকলে পাকতে কম সময় লাগে।

গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্বের সংগে ফলনের সম্পর্ক (চিত্র ১৪)

ধানের ফলন বিশেষ করে তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন—

- গাছে কত কার্যকরী শীষ রয়েছে অথবা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় কতটা কার্যকরী শীষ রয়েছে।
- প্রতিটি শীষে কতগুলি পুষ্ট দানা রয়েছে
- প্রতিটি দানার গড় ওজন

অঙ্গজপর্বে গাছের বৃদ্ধি কিরূপ হয় তার উপর প্রতিটি গাছে কতটা শীষ থাকবে তা অনেকটা নির্ভর করবে। একইভাবে শীষে দানার সংখ্যা নির্ভর করে জননপর্বের উপর, বিশেষ করে শীষমুকুল আসার সময় নির্ধারিত হয়। আর দানার ওজন অনেক সময় ঠিক হয় পাকার সময়ে আবহাওয়ার উপর।

গাছের অঙ্গজপর্বে অর্থাৎ শৈশবকালে গাছ যদি প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা জল, বাতাস ও পর্যাপ্ত খাবার পায় তাহলে পাশকাঠির সংখ্যা বা শীষের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

জননপর্বে অর্থাৎ গাছে শীষমুকুল দেখা দেওয়ার পর বা সেই সময় পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া (জল, তাপ বা কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ইত্যাদি) যদি ভাল হয় ও গাছের খাবার গ্রহণ করার ক্ষমতা বেশী থাকলে শীষে দানার সংখ্যা বাড়ে। মাটির উর্বরতা শক্তির সংগে শীষে দানার সংখ্যা বেশী হওয়া সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। এছাড়া জননপর্বে গাছে সালোকসংশ্লেষ ভালভাবে

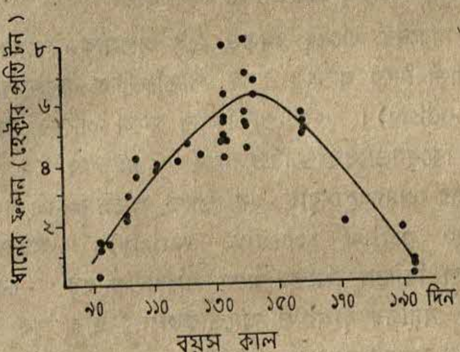
হলে শীষে দানার সংখ্যাও বাড়ে। ফুল আসার পর প্রয়োজনীয় আবহাওয়া সহায়ক হলে দানা পুষ্ট হতে ও পাকতে সাহায্য করে।

গাছের বিভিন্ন বৃদ্ধি পর্বে নাইট্রোজেন পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছ নিতে পারলে পাতার আয়তন বাড়ে ও পাতায় বেশী মাত্রায় শ্বেতসার তৈরী হয়। পরে ঐ শ্বেতসার শীষে পুষ্ট দানা গঠনে সহায়তা করে ও ফলন বাড়াতে সাহায্য করে।

শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য ধানের দানায় জমা হয় দুটি উপায়ে।

- যেসব শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য ফুল ধরার আগে পাতায় বা কাণ্ডে থাকে সেগুলি পরে দানায় গিয়ে জমা হয়। এগুলিকে বলা হয় মজুত খাদ্য (Accumulated)। জলদি জাতের থেকে নাবি জাতের ধানে এই ধরনের মজুত খাদ্য বেশী থাকে।
- দ্বিতীয় প্রকার শ্বেতসার খাদ্য, পাকার সময় দানায় সরাসরি জমা হয়।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে কোন জাতের ধান যদি বেশীদিন ধরে বাড়তে থাকে তাহলে তার ওজনও বাড়তে থাকে। একথা যেমন সত্যি তেমনি প্রত্যেক গাছের একটি নির্দ্দিষ্ট বৃদ্ধির সময় রয়েছে (উদাহরণস্বরূপ প্রায় ১৩০ দিন বা তারও কিছু বেশী)। এর পর দিনের সময়কাল বাড়লেও গাছের ওজন আর তেমন বাড়ে না বরং একরকমভাবে থাকে। এই ধরনের সম্পর্ক দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—



চিত্র ১৪ ধান গাছের বয়স কালের সংগে ধানের ফলনের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ছিল ৩০ সেন্টিমিটার। হেক্টার প্রতি ৪০ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা হয়েছিল।

[উৎস : রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৭০]

● গাছ বেশীদিন ধরে বাড়তে থাকলে পাতার সংখ্যা বাড়ে ও মোট আয়তনও তেমনি বাড়তে থাকে। কিন্তু গাছের পাতা ভেদ করে যে পরিমাণ আলো যেতে পারতো তার হার কমে যাবে (Light transmission rate)। কারণ উপরের দিকে যে পাতা থাকে তার ছায়া নীচের পাতার উপর পড়ে। ফলে নীচের পাতার সালোক সংশ্লেষের হারও কমে যাবে। সেই সংগে খাবার তৈরির পরিমাণও কমবে। ফলে ওজনও আর বেশী বাড়বে না।

● অন্য কারণটি হল গাছের যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যের যোগান না থাকে। গাছ বেশীদিন ধরে বাড়তে থাকলে শেষের দিকে বিশেষ করে নাইট্রোজেন জাতীয় খাদ্যের অভাব দেখা যায় ফলে শর্করাজাতীয় খাদ্য জমতে পারে না। তাই গাছের ওজনও আশানুরূপ হয় না।

ধান গাছের বৃদ্ধির উপর আলোক কালের প্রভাব

আলোককাল (বা দিনের হ্রাসবৃদ্ধি) গাছের বৃদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করে। দিনের মধ্যে কতটুকু সময় আলোক থাকে তাকেই সাধারণভাবে আলোক কাল বা দিনের দৈর্ঘ্য বলা হয়। এর মধ্যে সূর্য্য ডোবার পর ও ওঠার আগে যে আলোকটুকু দেখা যায় তাও ধরা হয়। দিনের আলোর পরিমাণ বছরে বিভিন্ন সময়ে কম বা বেশী হয়।

বিভিন্ন ধরনের ধানের জাতও এই আলোক কালের হ্রাসবৃদ্ধির জন্য নানাভাবে সাড়া দিয়ে থাকে। এই প্রতিক্রিয়াকে ফটোপিরিওডিজম বলে (Photoperiodism)। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে গাছের অঙ্গজপর্ব ও মুকুল আসার সময় বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এইভাবে যে জাতে বৃদ্ধিকাল আলোককালের জন্য হ্রাসবৃদ্ধি হয়, তাকে আলোককাল সংবেদনশীল জাত বলে (Photo period sensitive variety)। আলোককালের জন্য সংবেদনশীলতা বিভিন্ন জাতের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। যেমন কিছু কিছু জাত রয়েছে যেগুলির বৃদ্ধিকাল আলোককালের দ্বারা খুব কম পরিবর্তিত হয় তাকে দুর্বল আলোককাল সংবেদনশীল জাত বলে বলা যেতে পারে। আই-আর-৫ এই ধরনের একটি জাত। অনুরূপভাবে খুব বেশী আলোককাল সংবেদনশীল জাতও রয়েছে যেগুলিকে যেকোন মাসে বা মরসুমে বোনা বা লাগানো হোক না কেন তাদের বৃদ্ধিকাল আলোককালের দ্বারা খুব বেশীভাবে প্রভাবিত হয়। এই ধরনের জাতের জন্য উদাহরণস্বরূপ বলা যায়

পাটনাই-২৩ বা দেশী জাতের ধান। কৃষক সাধারণতঃ এই ধরনের জাতগুলিকে একটি নির্দ্দিষ্ট মরসুমে লাগায় বিশেষ করে দিনের দৈর্ঘ্য যখন বেশী থাকে। এগুলি মরসুমী ধানের জাতও বলা যেতে পারে।

অপরদিকে আরো কিছু জাত রয়েছে যেগুলিকে যেকোন মরসুমে লাগানো হোক না কেন বৃদ্ধিকাল মোটামুটিভাবে কম বেশী হয় না একইরকম থাকে। এগুলিকে আলোককাল সংবেদনশীল জাত নয় বলে পরিচিত করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জয়া, আর-আর-৮ প্রভৃতি জাত এ ধরনের। যদিও বা আলোককালের দ্বারা প্রভাবিত হয় না তবে এসব জাত বোরো হিসাবে লাগালে শীত থাকার (তাপমাত্রা কমের জন্য) জন্য মোট বয়সকাল বেশী লাগে।

অধ্যায় চার

ধানের উন্নত জাত

(Improved Variety of Rice)

অধ্যায় চার

ধানের উন্নত জাত

ধানের শ্রেণী বিভাগ

ধান ঘাস পরিবার (Family ; *Graminaceae*) ভুক্ত এবং তার গণ (*Genus*) হল ওরাইজা (oryza)। ২০ টিরও বেশী বৈধ প্রজাতি (*Species*) ছড়িয়ে রয়েছে সারা এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা মহাদেশে। এতগুলি প্রজাতির মধ্যে মাত্র ২টি প্রজাতি—ওরাইজা স্যাটাইভা (*oryza sativa*) এবং ওরাইজা গ্ল্যাবেরিমা (*Oryza glaberrima*)—চাষযোগ্য। এর মধ্যে আবার ওরাইজা গ্ল্যাবেরিমা বিশেষ করে আফ্রিকাতে সীমাবদ্ধ। ওরাইজা স্যাটাইভা ভারত সহ বিভিন্ন দেশে চাষাবাদ হয়ে থাকে। ধানে হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজমের সংখ্যা ১২টি। ২০টি প্রজাতির মধ্যে মাত্র ৮টি টেট্রাপ্লয়েড (৪n=৪৮) ও বাকি ডিপ্লয়েড (২n=২৪)।

চাষযোগ্য ওরাইজা স্যাটাইভা তিনটি উপপ্রজাতিতে ভাগ করা যায়।

- জাভানিকা বা বুলু (*javanica* or *bulu*) বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়াতে এর চাষ বেশী হয়।
- জাপোনিকা (*japonica*) বিশেষ করে জাপানে এর চাষ বেশী হয়। এ ছাড়া নাতিশীতোষ্ণ বা উষ্ণ শীত প্রধান অঞ্চলে কিছুটা হয়ে থাকে।
- ইণ্ডিকা (*indica*) বিশেষ করে এশিয়ার উষ্ণ মণ্ডলে এবং ভারতে এর চাষ ব্যাপক হারে হয়।

এই তিনটি উপপ্রজাতির মধ্যে যে আকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ—

বৈশিষ্ট্য	ইণ্ডিকা	জাপোনিকা	জাভানিকা
পাতা	চওড়া, হালকা সবুজ রঙের	সরু, গাঢ় সবুজ রঙের	চওড়া শক্ত, হালকা সবুজ রঙের
পাশকাঠির সংখ্যা	পর্যাপ্ত	মাঝারি	কম
গাছের উচ্চতা	লম্বা	বেঁটে	লম্বা
লেমা ও পেলিয়ার উপর লোম	লেমার উপর সরু ও ছোট লোম	লেমা ও পেলিয়ার উপর ঘন ও লম্বা লোম	লেমা ও পেলিয়ার উপর লম্বা লোম
সুঙ্গ (Awn)	বেশীর ভাগ সুঙ্গ বিহীন	কিছু কিছু সুঙ্গ বিহীন ও কিছু কিছু লম্বা সুঙ্গ যুক্ত	সুঙ্গ বিহীন থেকে লম্বা সুঙ্গ যুক্ত
দানা	লম্বাটে কিছুটা চওড়া	খাটো ও গোলাকার	চওড়া ও পুরু
দানার প্রকৃতি	তাড়াতাড়ি গাছ থেকে ঝরে যায়	কম পরিমাণে ঝরে	কম পরিমাণে ঝরে
তন্তু	নরম	শক্ত	শক্ত
আলোকাল সংবেদনশীলতা	স্বল্প বা অধিক	স্বল্প বা অধিক	স্বল্প

দেশে ধানের বিভিন্নজাত উদ্ভাবনের ইতিহাস

কৃষিতে রয়েল কমিশন ১৯০৫ সালে স্থাপিত হওয়ার পর মাদ্রাজের (বর্তমান তামিল নাড়ু) কোয়েমবাটোরে ১৯১০ সাল নাগাদ ধানের গবেষণা আরম্ভ হয়। সেই সংগে পশ্চিমবঙ্গে চুঁচুড়াতে ও বাঁকুড়াতে ১লা জুন ১৯৩২ সালে ধান্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। তখন ঐ দুই কেন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ দুটি—(১) রপ্তানি করার জন্য পাটনাই জাতের ধানের উন্নতি সাধন করা, (২) দেশী ধানের জাত সংগ্রহ ও তার ফলন বাড়াবার জন্য গবেষণা করা। ১৯৩১-৩২ তে ইমপেরিয়াল কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অর্থানুকূল্যে স্থাপিত হয় ধান্য গবেষণা কেন্দ্র। তখনকার কাজকর্মের মধ্যে বিশেষ করে ছিল দেশী ধান যেগুলি দেশে চাষ হতো সেগুলি থেকে ভাল জাত নির্বাচন

করা। এইভাবে ৪০ বছর ধরে বিভিন্ন অঞ্চলের উপযোগী প্রায় ৫০০ অপেক্ষাকৃত ভাল জাত নির্বাচন করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রহ্মদেশ থেকে ভারতে চাল আমদানি বন্ধ হয় ও ১৯৪৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ, শরনার্থীর আগমন ইত্যাদির ফলে দেশে খাদ্য যোগানের ব্যাপারে সঙ্কটপূর্ণ সময় চলতে থাকে। তখন ভারতে কৃষি উৎপাদন ও স্থিত (Static) অবস্থার মধ্যে চলছে।

১৯৪৬ সালে কটকে ভারতীয় ধান্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার পর আমাদের 'দেশী ধানের' উন্নতির প্রকল্প নতুন করে নেওয়া হয়। 'জ্যাপোনিকা' জাতের (জাপান বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ধান) ধানের অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন সার গ্রহণ ও তা ব্যবহারের ক্ষমতা এবং আমাদের 'দেশী' (ইণ্ডিকা) ধানের থেকে ফলন দেবার ক্ষমতা অনেক বেশী। আমাদের দেশী ধানে বেশী পরিমাণে নাইট্রোজেন দিলে ধান শুয়ে পড়ে, পাতা বড় হয়, খড় বেশী হয়, চিটের পরিমাণ বেশী হয়।

১৯৫০-৫১ সালে ভারত যখন 'অধিক ফসল ফলাও অভিযান' আরম্ভ করে তখন কিন্তু এর প্রসার খুব বেশী হয়ে উঠেনি কারণ তখন আমাদের হাতে সার প্রয়োগে সাড়া দেয় এমন কোন ভাল জাত ছিল না। সেজন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয় জ্যাপোনিকা ও ইণ্ডিকা জাতের মিশ্রণে 'সংকর জাতীয় ধান' উদ্ভাবন বা সৃষ্টি করা যা আমাদের দেশের প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন সার গ্রহণ ও ব্যবহার করতে পারবে এবং ফলন অনেক বেশী দিতে সমর্থ হবে।

এই প্রচেষ্টার মূল কেন্দ্র কটকে ছিল এবং বিশ্বখাদ্য ও কৃষি সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকুল্য লাভ করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই উদ্যম বস্তুত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তামিলনাড়ুতে একমাত্র 'এ ডি টি-২৭' জ্যাপোনিকা-ইণ্ডিকা সংকর হিসাবে সার্থকতা লাভ করে। মালয়েশিয়ায় হয় 'মাসুরী' যা আমাদের দেশের কৃষকরা খুবই সম্প্রীতি সাদরে গ্রহণ করেছেন।

অধিক ফলন দেবার ক্ষমতা আছে এমন জাতের উদ্ভাবন না হওয়ার ফলে পরিচর্যার উপর বেশী জোর দেওয়া হয় এবং 'জাপানী প্রথায় ধান চাষ' নামে পদ্ধতির প্রচলন করা হয়। পরিচর্যার মূল লক্ষ্য ছিল নীরোগ সবল চারা তৈরী করা, সারিতে লাগান, ঠিকমত সার প্রয়োগ, আগাছা দমন ও পরিচর্যা ইত্যাদি। সার প্রয়োগের বিষয়ে দেখা গেল যে বেশী মাত্রায় সার প্রয়োগ করলে ধান গাছ শুধু যে শুয়ে পড়ে তা নয় সহজে রোগ ও পোকার দ্বারা

আক্রান্ত হতে পারে। 'জাপানী প্রথায় ধান চাষ' কিছুটা সাড়া জাগালেও ফলন বাড়ানোর ব্যাপারে বিশেষ কার্যকরী হয়েছে বলে মনে হয় না। কেন না নতুন কোন জাত ব্যবহার হয় নি এবং প্রযুক্তি বিদ্যার থেকে সম্পূর্ণ নতুন কোন তথ্য বা দৃষ্টিভঙ্গী পরিবেশন করা হয় নি। 'দেশী' ধানের সীমিত ফলন দেওয়া ছাড়া, আরও একটি বিশেষ অসুবিধা দেখা যায় তাহলো 'দোফসলী' বিশেষ করে রবি মরসুমে চাষের পক্ষে অন্তরায়। 'দেশী' আমন ধানের ফুল আসে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে। ধান পাকা ও জমি থেকে কেটে নেবার পর রবি চাষ করার সময় খুব বেশী থাকে না।

১৯৫৮ সালে দুই জন বিশ্ববিখ্যাত ধান্য প্রজনন বিশেষজ্ঞ ডঃ জোডোন (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লুইসিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) ও মিঃ বিচেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেকসাস রাজ্যের বোসোণ্ট ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানী) প্রসঙ্গত মন্তব্য করেন যে 'দেশী' লম্বা ইণ্ডিকা জাতের উন্নতি করা ও ফলন বাড়ানোর জন্য প্রজননে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আসা দরকার। অধিক ফলনের জন্য প্রয়োজন এমন ধানগাছের যার পাতা অনেক দিন এমন কি দানা পুষ্ট হবার ও পাকার সময় পর্য্যন্ত সবুজ থাকবে—পাতা খাড়া হয়ে থাকবে—যাতে সব পাতাই সূর্যালোক পায় এবং সালোক সংশ্লেষ খুবই ভালভাবে করতে পারে। একই সংগে বিয়ান বা পাশকাঠি ছাড়বে এবং বেঁটে জাতের হবে যাতে বেশী সার দিলে শুয়ে না পড়ে। সর্বোপরি অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন সার গ্রহণ করতে পারবে এবং এই সব গুণ থাকার দরুণ অধিক ফলন দেবার সামর্থ্য থাকবে। অধিক ফলনের জন্য বিশেষ ধরনের উন্নত গাছের (Improved plant type) প্রয়োজন। জ্যাপোনিকার সংগে সংকর সৃষ্টির প্রচেষ্টাতে এই ধরনের জাত পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। গ্রীষ্ম বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই এই ধরণের গাছের সন্ধান করতে হবে। জোডান ও বিচেলের এই বিশ্লেষণ পূর্ণ তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ প্রকাশের পর এই রকম ধরনের ধান তাইচুং নেটিভ-১ (যা তাইওয়ানে উদ্ভুত হয়েছিল বেঁটে জাতের ডি-জি-উজেন ও লম্বা জাতের পেটার সংমিশ্রণে) এর উপর দৃষ্টি পড়ে।

১৯৬২ সালে ফিলিপাইন আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার পর ১৯৬৬ সালে আই আর-৮ ও অন্য আই আর জাতের বেঁটে ও অধিক ফলনশীল ধানের সৃষ্টি হয় এবং ধান উৎপাদনে 'বিপ্লব' আনতে সক্ষম হয়। এই সময় আর একটি তথ্য আবিষ্কার হয় 'দেশী' ধানের ক্ষেত্রে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক ডঃ সৌরীন্দ্রমোহন সরকার

ও ডঃ শ্যামাপদ সেন ফলন ও ফলন সংশ্লিষ্ট গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্যের বিষয় বিশ্লেষণ করেন। বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে দেখান যে 'দেশী' আমন ধান মার্চ মাসে ফুল দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং রূপশাল ধানে তাঁরা তা প্রমাণ করে দেখান। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে চুঁচুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের গবেষক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ আরও গবেষণা করে লাঠিশাল, কলমা-২২২ প্রভৃতি ধানকে বোরো হিসাবে ব্যবহারের কথা বলেন। ফলে বোরোতে লাঠিশালের ব্যবহার বেড়ে চলে। ইতিমধ্যে প্রথমে তাই চুং নেটিভ-১, পরে আই আর-৮ ও অন্য আই আর ধান আসে এবং অধিক ফলন পাওয়া যায় বলে লাঠিশাল প্রভৃতি দেশী ধানের বদলে আই আর ধানের প্রচলন হয়েছে। কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তার সহকর্মীরা আই আর-৮ ও জয়া ধানকে সারা বছরের মধ্যে প্রত্যেক মাসে লাগিয়ে ফলন ও ফলনের সংশ্লিষ্ট গুণাবলী বিশ্লেষণ করে দেখেন এবং সেখানে দেখা যায় যে সত্যিকারে দেশী জাতের থেকে প্রায় সব সময়েই ভাল ফলন দেয় বিশেষ করে যখন বোরো হিসাবে লাগানো হয়।

একই ধারণা নিয়ে পরবর্তীকালে ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞানীগণ এক দশকের মধ্যে প্রায় ৯০টির মত এই ধরণের জাত উদ্ভাবন করেন দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে। কেন্দ্রীয় জাত স্বীকৃতিসংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত অধিক ফলনশীল জাতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হল (৫ নম্বর সারণী)।

কিন্তু গত ১০ বছরের অভিজ্ঞতায় বলা যায় আজ অবধি যে সব জাতের উদ্ভব হয়েছে তারা কেউ সব রকম গুণাবলীর অধিকারি হয়নি। সুতরাং উদ্ভিদ প্রজনন বিজ্ঞানীদের কাজের বিরাম নেই। এছাড়া কেউ জানে না কখন কোন জাত কোন ধরণের রোগ পোকার দ্বারা আক্রান্ত হবে। এখনো আমাদের দেশে গভীর জলের, নোনা এলাকার বা কম তাপমাত্রা থাকলে তার উপযোগী কোন ভাল জাত আবিষ্কৃত হয় নি। এসব ক্ষেত্রে কৃষককে পুরানো জাতের উপর নির্ভর করতে হয়।

বেঁটে প্রকৃতির অধিক ফলনশীল জাতের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে যেগুলি দিয়ে 'দেশী' ধান আলাদা করা যায়।

- গড়ন বেঁটে, খড় শক্ত হয়, যার ফলে সহজে শুয়ে পড়ে না।
- কিছু অল্পদিন স্থায়ী জলদি জাতের ধানও রয়েছে যা প্রয়োজনবোধে শস্য পর্য্যায়ের সংগে ব্যবহার করা যেতে পারে।

- তুলনামূলক ভাবে বেশী সংখ্যক পাশকাঠি গঠনের শক্তি রাখে।
- বেশী পরিমাণে সার বিশেষ করে নাইট্রোজেন ঘটিত সার ব্যবহারে ফল ভাল পাওয়া যায়।
- পাতা শক্ত এবং খাড়া থাকে। এর জন্য সৌরশক্তি বেশী গ্রহণ করতে পারে।
- বেশীর ভাগ জাত আলোক কালের দ্বারা খুব কম প্রভাবিত হয় তাই প্রায় যে কোন ঋতুতে চাষ করা যায়।
- ধান কাটার পর বীজের মধ্যে ভ্রুণ প্রায়ই সুপ্ত থাকে না যার জন্য ফসল কাটার পর সংগে সংগে আবার বীজ হিসাবে বোনা চলতে পারে।
- এছাড়া ঠাণ্ডা আবহাওয়া কিছুটা সহ্য করতে পারে, ঝড় ইত্যাদিতে সহজে পাতা পচে না, ধীরে ধীরে পাতা শুকনো হয়, মাঝারি ধরণের গভীর জলেও চাষ করা সম্ভব হয়।

ভারতে ধান প্রজননের উদ্দেশ্য

ধানের এক জাত থেকে অপর জাতের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। ভারত চাষযোগ্য ধানের প্রধান জন্মভূমির মধ্যে অন্যতম। কটকে কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, হায়দ্রাবাদে সর্বভারতীয় ধান্য উন্নয়ন প্রকল্প, ধান্য গবেষণা কেন্দ্র—কোয়েমবাটোর, রাইপুর, কারজাট, চুঁচুড়া প্রভৃতি জায়গায় প্রচুর সংখ্যক দেশী ও বিদেশী জাত সংগৃহীত আছে। যে সব পুরানো জাত আছে তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ 'রাইস মনোগ্রাফ (Rice Monograph, ICAR কর্তৃক প্রকাশিত) এ রয়েছে। বর্তমানে যে সব উদ্দেশ্য নিয়ে প্রজননের কাজ উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ্‌রা হাতে নিয়েছে তা নিম্নরূপ।

- উঁচু জমির উপযোগী জাত
- শীতসহনশীল জাত
- সমস্যাযুক্ত মাটি বা যেখানে জলের সুবন্দোবস্ত নেই সেখানের জন্য
- রোগ ও পোকা প্রতিরোধক্ষম জাত
- বেশী প্রোটিন ও ভাল খাদ্যোৎপাদন বিশিষ্ট জাত
- অঞ্চল ভিত্তিক প্রয়োজন দেখে জাত উদ্ভাবন

জা... শতকরা হিসাব	রোগ/পোকা মজরা পোকা	গল মিলজ (মাছি)	পাতা ছিদ্রকারী পোকা	প্রতিরোধক ক্ষমতা ঝলসা	ধসারোগ	হেলমিনথোস পোরিয়াম	টুংরো ভাইরাস
(১) জন							
কাবে.২	এস	এস	এস	এস	এস	এম.আর	এস
কান্.৭	এস	এস	এস	এস	এইচ.এস	আর	এস
রত্না.৪	এম.আর	এস	এম.এস	এম.আর	এস	এস	এস
কৃষ্ণা.৫	এস	এস	এস	এম.আর	এস	এম.আর	এস
সবর.২	এস	এস	এস	এম.আর	এস	এস	এস
যমুন.৪	এস	এস	এস	এম.আর	এস	এস	এস
(২) মা							
জয়া.৩	এস	এস	এস	এম.আর	এস	এস	এম.এস
আই.৪	এম.এস	এস	এস	এম.আর	এম.এস	এস	এম.এস
আই.০	এম.আর	এস	এম.আর	এম.আর	এম.আর	এস	এম.আর
বিজ.০	এস	এস	আর	আর	এম.আর	এস	এম.আর
আই০	এম.আর	এস	এস	এস	এস	এস	এস
সো..৯	এম.আর	এস	আর	এম.এস	এম.এস	—	—
জয়.৪	এম.আর	এস	এস	আর	এস	এস	আর
(৩) না							
পঙ্ক.০	এম.এস	এস	এস	এস	এস	এস	এস
জগন্ন.৬	এম.এস	এম.এস	এম.এস	এইচ.এস	এস	এস	এস

এইচ. এস—হাইলি সাসেপটিবিল (প্রবণতা খুব বেশী)
এম. এস—মডারেটলি সাসেপটিবিল (প্রবণতা মাঝারি)
আর—রেজিস্ট্যান্ট (প্রতিরোধক্ষম)

বিভিন্ন রাজ্যের দ্বারা স্বীকৃত গুরুত্বপূর্ণ জাতগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য*

হংসা—এইচ. আর ১২×টি. এন. ১ এর মিশ্রণে হয়েছে, জলদি ছোট খাটো মাপের, দানা লম্বা ও সরু, রঙ সোনালী বাদামী, চালের রঙ সাদা, রান্নার পক্ষে ভাল, পাশকাঠি বেরোবার সময় শীত সহ্য করতে পারে।

টেলাহংসা—এইচ. আর. ১২×টি. এন. ১ এর মিশ্রণে হয়েছে, ১০০ থেকে ১১০ দিনে পাকে, লম্বা, সরু দানা, রান্নার পক্ষে খুবই ভাল, ডিসেম্বর বা জানুয়ারীতে যে ঠাণ্ডা থাকে সহ্য করতে পারে।

মাসুরী—মালয়েশিয়াতে তাইচুং ৬৫ সংগে মায়েং-এ-বস ৮০/২ প্রজননের ফলে হয়েছে। ১৪৫ দিনে পাকে, নাইট্রোজেন সার দিলে ভাল ফল পাওয়া যায় তবে বেশী সার প্রয়োগে গাছ শুয়ে পড়তে পারে। জমিতে জল থাকলে খরিফ মরসুমে বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়াতে ভাল ফলন দেয়। রান্নার পক্ষে ভাল, তবে ঝলসা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কাকাটিয়া—আই. আর-৮×ডব্লু ১২৬৩ এর মিশ্রণে হয়। ১২০ দিনে পাকে, দানা ছোট তবে গোলগাল। ভেঁপু পোকা, ঝলসানো ও বাদামী রোগ কিছুটা প্রতিরোধ করতে পারে।

এম. টি. ইউ. ৮০০২—আই. আর. ৮ এবং এস. এল. ও-১৩ এর সংকর, আলোককাল সংবেদনশীল, বেঁটে, শুয়ে পড়ে না, ঘন পাশকাঠি হয়। ১৬৫ থেকে ১৮০ দিনে পাকে, দানা লম্বা ও পুষ্ট, পেটের দিকে সাদা দাগ নাই, মাজরা পোকা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু ভেঁপু পোকা বেশী হয়, গোদাবরী ও কৃষ্ণা এলাকায় খরিফ মরসুমের পক্ষে ভাল।

অর্চনা—আই. আর. ৮ ও টাডুকান এর সংকর, ১২৫-১৩০ দিনে পাকে, দানা লম্বা ও সরু প্রকৃতির, মাজরা পোকা, বাদামী শোষক পোকা, বাদামী দাগ রোগ, ঝলসানো রোগ প্রতিরোধক, খরিফ ঋতুতে উঁচু জায়গার জন্য ভাল।

---

* ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার প্রকাশনা 'রাইস' বই থেকে অনুবাদ।

দীপা—আই. আর. ৮ ও টাডুকান এর সংকর থেকে নির্বাচন করা হয়েছে, ১৩০ থেকে ১৩৫ দিন সময় লাগে, লম্বা সরু দানা, বিভিন্ন ধরনের রোগ ও পোকা প্রতিরোধক্ষম, খরিফ মরসুমে উঁচু জায়গার জন্য উপযুক্ত।

সীতা—আই. আর. ৮ ও আই. আর. ১২-১৭৮ এর সংকর। ১৩০-১৩৫ দিনে পাকে, দানা লম্বা সরু, বিভিন্ন ধরনের রোগ পোকা প্রতিরোধক্ষম, খরিফ মরসুমে মাঝারি জমির জন্য উপযোগী।

আই. আর. ৪৪২/৩ (পানিধান ১)—পেটা ও টি. এন-১ এর সংকরের সংগে লেব মেনাং এর প্রজননের ফলে উদ্ভূত, ১৪০-১৪৫ দিনে পাকে, মাঝারি ধরনের দানা, খরিফ ঋতুতে মাঝারি প্রকৃতির জমির পক্ষে উপযোগী।

আই. আর. ৪৪২/৫ (পানিধান ২)—পানিধান ১ যেভাবে পাওয়া গেছে ঐ ধরনের সংকর থেকে নির্বাচন করা হয়েছে, ১৪০-১৪৫ দিনে পাকে, মাঝারি সরু প্রকৃতির দানা, জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা জল সহ্য করতে পারে, খরিফ মরসুমে ছোটনাগপুর অঞ্চলের নীচু জায়গার জন্য উপযোগী।

সি. আর. ৪৪-৩৫—টি. কে. এম ৬ এবং আই. আর. ৮ এর সংকর থেকে নির্বাচন করা হয়েছে, ১১৫-১২০ দিনে পাকে, লম্বা সরু প্রকৃতির দানা, মাজরা পোকা আক্রমণ প্রতিরোধক্ষম, খরিফ ঋতুতে উঁচু জমির পক্ষে উপযোগী।

জি. ইউ. এ. আর. ১—জেড-৩১ এবং আই. আর. ৯-৬০ এর সংকর, ১১০ দিনে পাকে, ছোটোখাটো কিন্তু দানা পুষ্ট, পোড়া দাগ রোগ, ভূষারোগ ও ঝলসানো রোগে আক্রান্ত হতে পারে। খরিফ মরসুমে দক্ষিণ ও মধ্য গুজরাটের নীচু জমির জন্য উপযোগী।

জি. ইউ. এ. আর. ১০—জেড ৩১ এবং আই. আর. ৯-৬০ এর সংকর, ১২০ দিনে পাকে, মাঝারি সরু দানা, বাকী জি.ইউ. এ.আর. ১ এর মত।

জি. ইউ. এ. আর. ১০০—জেড ৩১ এবং আই. আর. ৮-২৪৬, ১৩০ দিনে পাকে, মাঝারি সরু প্রকৃতির দানা, অন্যান্য গুণাবলী জি. ইউ. এ. আর. ১ এর মত।

সুমা—টিন ১ এবং টি. কে. এম ৬ এর সংকর, জলদি পাকে, লম্বা, সরু দানা।

কুসুমা—বাসমতী ও টি. এন-১ এর সংকর, জলদি পাকে, লম্বা সরু দানা।

সাধু—টি. এন. ১ এবং টি. কে. এম ৬ এর সংকর থেকে নির্বাচন করা হয়েছে, ১২০ দিনে পাকে, মাঝারি সরু দানা, সার প্রয়োগে ভাল ফলন দেয়, মাজরা পোকা, পোড়া দাগ পড়া ও ঝলসানো রোগ প্রতিরোধক্ষম, সারা কর্ণাটক রাজ্যে আগষ্ট মাসে রোয়া করা যায়।

এম. আর. ১১৮—টি. এন ১ এবং কো-২৯ এর সংকর, ১১৫ থেকে ১২০ দিনে পাকে, বেঁটে জাতের এবং সার প্রয়োগে ভাল ফল দেয়, মাঝারি পুষ্ট দানা, ভাল ফলন দেয়, কর্ণাটকের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে উঁচু জায়গায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শস্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

বিক্রম—জয়া থেকে এক সপ্তাহ বেশী লাগে, জয়ার মত দানার গুণাবলী, বেঁটে প্রকৃতির, ভেঁপো পোকা প্রতিরোধক্ষম, কর্ণাটকের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে মাঝারি প্রকৃতির জমির জন্য উপযুক্ত।

অন্নপূর্ণা—পি.টি.বি. ১০ এবং টি. এন-১ এর সংকর, ৯৫ দিনের ফসল, মাঝারি সংখ্যক পাশকাঠি হয়, খরা সহনশীল, সহজে শুয়ে পড়ে না।

ত্রিবেণী—অন্নপূর্ণা এবং পি.টি.বি. ১৫ মিশ্রণে হয়েছে, ছোটখাটো ধরনের, ১০০ দিনে পাকে, ছোট সাদা রংয়ের বীজ, পেটের দিকে সাদা দাগ থাকে, ঝলসা বা পোড়া দাগ রোগ হয় না। মাজরা পোকার আক্রমণও কম হয়।

রোহিনী—পি.টি.বি. ১০ ও আই. আর ৮ এর সংকর। ১০০ দিনে পাকে (সরাসরি বীজ বপন করলে ৭৬ থেকে ৮০ দিন লাগে)। মাঝারি সংখ্যক পাশকাঠি হয়, গাছ লম্বায় ৭৫-৯৫ সেন্টিমিটার। ধীরে ধীরে গাছের পাতা ঝরে, সাদা রংয়ের বীজ, তাপমাত্রা বা আলোক কালের দ্বারা কম প্রভাবিত হয়। প্রোটিন শতকরা ১২ ভাগ থাকে।

আস্বাতী—পি.টি.বি. ১০ এবং ডি. জি. উ. জেন এর মধ্যে প্রজননের ফলে পাওয়া, ১২৫ দিনে পাকে, যথেষ্ট সংখ্যক পাশকাঠি হয়। ধীরে ধীরে গাছের পাতা ঝরে, গাছ লম্বায় ৮০ থেকে ১০০ সেন্টিমিটারের মত হয়। দানা মাঝারি ধরনের পুষ্ট, রঙ সাদা।

জ্যোতি—পি.টি.বি. ১০ এবং আই. আর ৮ এর সংকর, ১১৫ দিনে পাকে, ভাল পাশকাঠি হয়, ৭৫-৮৫ সেন্টিমিটারের মত গাছ লম্বায় বাড়ে, লাল শোষক পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। ধান থেকে ৭০ শতাংশের মত চাল পাওয়া যায়।

ভারতী—পি.টি.বি. ১০ এবং আই. আর ৮ এর সংমিশ্রণে হয়েছে, ১২৫ দিনের মত সময় লাগে, ভাল পাশকাঠি হয়, গাছ লম্বায় ৮০ থেকে ৯৫ সেণ্টিমিটারের মত হয়। বীজের রং লাল, অন্যান্য গুণাবলী জ্যোথির মত।

শবরী—আই. আর ৮/২ এবং অন্নপূর্ণা ২৮ এর সংকর। ১৩০ দিনে পাকে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য জ্যোথির মত।

অন্নপূর্ণা—মধ্যপ্রদেশের একটি ভাল জাত। (আই. আর ৮-২৬-২৩) আই. আর ৮ এবং এম. এল ১৬ এর সংকর। ১০৫ থেকে ১১০ দিনে পাকে, লম্বা সরু দানা, ঝলসানো রোগ প্রতিরোধক্ষম কিন্তু বেশীর ভাগ পোকা মাকড়ের দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

কারজাত-১৮৪—টি. এন. ১ ও কলোম্বা ৫৪০ এর যে সংকর হয় তা নির্বাচন করা হয়েছে। ১০০ দিনে পাকে, লম্বা সরু দানা, উঁচু জায়গা বা পাহাড়ী এলাকার পক্ষে উপযোগী।

রত্নগিরি ২৪—জিনিয়া ৬৩ এবং টি. এন ১ এর মধ্যে যে সংকর পাওয়া যায় তা থেকে নির্বাচন করা, জীবনকাল ১১০ দিন, লম্বা, দানা সরু, রত্নগিরি, কোলাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে উঁচু জায়গায় ভাল হয়।

কুমার—টি-৯০ এবং আই. আর-৮ মধ্যে মিশ্রণে হয়। খরিফে ১২০ দিনে এবং রবিতে ১২৫ দিনে পাকে। ভাল প্রকৃতির গাছ, মাঝারি ধরনের পাশকাঠি হয়, দানা স্বচ্ছ, ছোট ও সুন্দর। খেতে সুস্বাদু। ঝলসানো রোগ মাঝারি ধরনের সহ্য করতে পারে, খরিফ বা রবি উভয় ঋতুতে চাষের উপযোগী।

রাজেশ্বরী—টি-৯০ এবং আই. আর ৮ এর সংকর থেকে নির্বাচন করা হয়েছে, ১৩০ দিনে খরিফে এবং ১৪০ দিনে রবিতে তৈরী হয়, অন্যান্য বৈশিষ্ট্য কুমারের মত।

হেমা—টি-১৪১ এবং আই. আর ৮-২৪৬ এর সংকর। খরিফে ১৩০ দিনে এবং রবিতে ১৩৫ দিনে তৈরী হয়, মাঝারি ধরনের পাশকাঠি হয়, পাতা ছোট, চওড়া, হালকা সবুজ রংয়ের, দানা সাদা, লম্বা ও পুষ্ট, খেতে ভাল, মাজরা পোকা ছাড়া অন্যান্য ধরনের রোগ পোকা প্রতিরোধ করতে পারে, খরিফে সারা উড়িষ্যাতে এবং রবিতে মাজরা পোকা যেখানে হয় না এমন এলাকাতে বোনা হয়।

শক্তি—(পি.টি.বি. ২১×পি টি.বি. ১৪) এর সংগে আই. আর ৮ এর সংকর। গাছ ও দানা আই. আর ৮ এর মত। ১৩৫ দিনে পাকে, ভেঁপু পোকা, সবুজ ও বাদামী শোষক পোকা, টুংরো ভাইরাস রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে, যেসব এলাকায় ভেঁপু পোকার আক্রমণ বেশী দেখা যায় সেখানে এ জাতের চাষে সুফল পাওয়া যায়।

কলিংগ ১ এবং ২—ডুঙ্গানশালী ও আই. আর ৮ এর সংকর। খরিফে ৯০-১১০ দিন এবং রবিতে ১১৫ থেকে ১২৫ দিন দরকার হয়। এগুলির প্রজনন হয়েছিল বিশেষ করে কম তাপমাত্রায় চাষের উপযোগী করে। ছোট এবং শক্ত ধরনের খড় হয়, একটু জলদি প্রকৃতির বলে রবি মরসুমে চাষের জন্য ভাল। নভেম্বর, ডিসেম্বর বা জানুয়ারীতেও বোনা যায়, পাট ও ধান শস্য পর্যায়ে চাষ করতে হলে এই জাতটি ভাল হবে। উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশে বিভিন্ন সময়ে বোনার জন্য ভাল।

পলমন ৫৭৯—আই. আর. ৮ এবং ঠাডুকন এর সংকর। এটি আলোক সংবেদনশীলজাত নয়। ১২০ দিনে পাকে, চাল লম্বা, সরু, দেরীতে রোয়ার উপযোগী।

সংকর মিউট্যানট-৯৫—৯৫ দিনে পাকে। বেঁটে গড়ন, আলোক সংবেদনক্ষম জাত নয়, দেরীতে বোনার উপযোগী।

করুনা—আই. আর. ৮ ও এ.ডি.টি.-২৭ এর সংকর। জলদি ও ভাল জাতের, পাতা উপরের দিকে খাড়া থাকে, নাইট্রোজেন সার প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায় তবে বেশী হলে গাছ শুয়ে পড়ে, দানা বেঁটে, পুষ্ট, রঙ সাদা, ভাত খেতে ভাল।

পোণী—মাসুরীর মত বৈশিষ্ট্য।

কানাগী—পুসা—২-২১ এর মত। আই. আর. ৮ এবং টি. কে. এম. ৬ এর সংকর, ১১২ দিনে পাকে, পাশকাঠির সংখ্যা ভাল হয়, একই সংগে প্রায় সব পাশকাঠিতে ফুল আসে, মাজরা পোকা আক্রমণ প্রতিরোধক্ষম, সাদা চাল, ভাত খেতে ভাল, চালে প্রোটিন প্রায় ৮.৯ শতাংশ রয়েছে।

ভবানী—পেটা ক্স ও বি. পি. এল ৭৬ এর সংকর, ১২৫ থেকে ১৩৫ দিনে পাকে, আলোক সংবেদনশীলতা কম যার ফলে সেচের সুবিধা থাকলে সারা বছর চাষ করা যায়। ঠাণ্ডা আবহাওয়া, নোনা মাটি এবং ঝলসা রোগ সহ্য করতে পারে, চাল সরু ও লম্বা প্রকৃতির, খরিফ মরসুমে দেরীতে চাষ করা যায়।

সি. এন. এম-২৫—জাতটি আই. আর ৮ থেকে মিউটেসন করে পাওয়া, খড় শক্ত, গাছ মাঝারি বেঁটে, চাল লম্বা ও মোটা, বেশি পাশকাঠি ছাড়ে, মোটামুটিভাবে প্রধান প্রধান রোগ ও পোকা প্রতিরোধ করতে পারে। খরিফে ১০৩-১০৮ দিনে এবং রবিতে ১৪৬-১৪৮ দিনে পাকে।

সি-আর-১২৬-৪২-১—জাতটি দু'ঘনশালী ও আই-আর-৮ এর সংকর থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। বৃদ্ধির প্রথম অবস্থায় ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে। গাছ বেঁটে, খড় শক্ত। নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে রোয়ার জন্য জয়া বা আই-আর-৮ এর থেকে বেশী উপযোগী। খরিফ মরসুমে দেরীতে রোয়া করা যায়। জাতটি বোরো মরসুমে চাষের জন্য বেশী উপযোগী। কারণ জলদি পাকে, ফলন বেশি ও ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে। বোরো মরসুমে পাকতে সময় নেয় ১১৫-১২৫ দিন এবং খরিফে ৯০-১০০ দিন।

পুসা ৩৩-৩০—জাতটি সবরমতী টাটনার সংকর। চাল লম্বা ও মাঝারি মোটা, সুগন্ধি, পাকতে সময় নেয় ১১০ দিন।

আই-ই-টি-২৬ ও ৮৪ (পারিজাত)—টি-কে-এম ৬ এবং টি-এন-১ এর সংকরজাত, দানা লম্বা সরু, ১০০ দিনে পাকে। খরিফে ভাল হয়।

আই-আর-২৮-২৯—জলদি জাতের, অনেকগুলি জাতের প্রজননের ফলে পাওয়া গেছে। জাতগুলি যেমন পেটা-৩ / টি-এন-১ / জি পাই-১৫ / ৪ / টি-কে-এম ৬^{২} / টি-এন-১ / ঠাডুকান / আই-আর ২৪^{২} / ০^{৩} নিভেরা। প্রধান প্রধান রোগ পোকার আক্রমণ সহনশীল, ১১৫-১২০ দিনে পাকে।

আই-আর-৩০—এটিও অনেকগুলি জাতের মধ্যে সংকর প্রজননের ফলে পাওয়া। যেমন আই-আর ২৪ / টি-কে-এম ৬ / আই-আর ২৪-৪ / ও নিভেরা। টুংরো ভাইরাস, মাজরা পোকা, ক্ষার বা নোনার জন্য ক্ষতি বা ফসফেট ও দস্তার অভাবজনিত ক্ষতি মাঝারিভাবে সহ্য করতে পারে। ১১৫ থেকে ১২০ দিনে পাকে।

বাণী—জাতটি আই-আর ৮ ও সি. আর. ১০১৪ এর সংকর। চাল লম্বা সরু, ভাল ফলন দেয়, ঝলসা রোগ প্রতিরোধ করতে পারে, পাকতে সময় নেয় ১২৫ দিন।

আই-ই-টি ২৮১৫ (শস্যশ্রী)—টি-কে-এম ৬×আই-আর-৮ এর সংকর। ১২৩ দিনে পাকে।

আই-ই-টি ৬১৪৩ (বিপ্লব)—আই-আর-৮×বি ৫৮৯ এ ৪)×(টি-এন-১× লাঠিশাল) এর সংকর। ১৩১ দিনে পাকে।

জলধি ১—জাতটি 'কলখের শাল' নামে দেশী একটি জাত থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। আলোক সংবেদনশীল, ২-৩ মিটার পর্য্যন্ত জলজমা জমিতে চাষের উপযোগী। চাল মোটা, কার্ত্তিকের প্রথম দিকে ফুল আসে।

জলধি-২—জাতটি 'বাজু' নামে একটি স্থানীয় জাত থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। আলোককাল সংবেদনশীল ২ থেকে ৩ মিটার পর্য্যন্ত জলজমা জমিতে চাষের উপযোগী। চাল মোটা হয়, কার্ত্তিকের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ ফুল আসে।

হ্যামিলটন—'নোনা বকরা' নামে দেশীজাত থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। নোনা জমিতে চাষের উপযোগী। চাল মোটা ও লাল হয়। কার্ত্তিকের প্রথম সপ্তাহে ফুল আসে।

ও-সি-১৩৯৩—চাল লম্বা, মাঝারি মোটা, কার্ত্তিকের প্রথম সপ্তাহে ফুল আসে।

এন-সি-১২৮১—চাল ছোট ও মোটা প্রকৃতির হয়, কার্ত্তিকের প্রথম সপ্তাহে ফুল আসে।

তুলার—জলদি জাতের, দুমাই ও লারকোচ এর মিলনে পাওয়া গেছে। ১২০ দিনে পাকে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৯৮২ সালে যেসব জাত ভাল বলে স্বীকৃতি পেয়েছে

ক্ষিতিশ (আই. ই. টি. ৪০৯৪)—বি. ইউ ১×সি. আর ১১৫ এর সংকর। খরিফ মরসুমে ৮৫-৯০ দিনে ৫০ শতাংশ ফুল আসে। ঝলসা ও ধসা রোগ মাঝারি ধরনের সহনশীল। উঁচু ও মাঝারি প্রকৃতির জমিতে ভাল হয়।

কুন্তী (আই. ই. টি. ৬১৪১)—আর. পি. ডব্লু ৬-১৩×সোনা জাতের সংকর। খরিফে ৫০ শতাংশ ফুল আসতে ৯৫ থেকে ১০০ দিন এবং বেরোতে ১৩০-১৩৫ দিন লাগে। দানা লম্বা ও সরু প্রকৃতির। ভেঁপু পোকার আক্রমণ প্রতিরোধক্ষম, মাজরা পোকা ও ধসা রোগ মাঝারিভাবে প্রতিরোধ করতে পারে। পলিমাটি, ল্যাটেরাইট ও উপকূলবর্তী অঞ্চলের মাঝারি প্রকৃতির জমির পক্ষে ভাল।

বিরাজ (সি.এন. এম-৫৩৯)—ও.সি. ১৩৯৩ এর মিউট্যাণ্ট, আলোককাল অনুভূতিশীল, ১৩০-১৪০ দিনে ৫০ শতাংশ ফুল আসে। দানা মাঝারি ধরনের সরু প্রকৃতির, বৃষ্টির উপর নিরর্ভশীল, নীচু জমি যেখানে বর্ষাকালে প্রায় ৫০ থেকে ৭০ সেণ্টিমিটার জল দাঁড়ায় এমন জায়গার পক্ষে ভাল।

সুরেশ (সি. এন. ৫৪০)—আই. আর. ২৬২ ও খাও নাঙ নিউ-২ (IR-262×Khao Nahng Nwey-II) এর সংকর। ৫০ শতাংশ ফুল আসতে ১২৫-১৩০ দিন লাগে। দানা লম্বা সরু প্রকৃতির। নীচু জায়গা যেখানে জলের গভীরতা জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় ৫০-৭০ সেণ্টিমিটার দাঁড়ায় সে সব জায়গা এ ধানের পক্ষে ভাল।

মুনাল (সি. আই. ৫৩১০)—যুক্তরাষ্ট্র থেকে আনানো। ৫০ শতাংশ ফুল আসে ১০০ থেকে ১১০ দিনে। দানা লম্বা সরু প্রকৃতির। দার্জ্জিলিং এর পার্বত্য এলাকা এবং উঁচু নীচু জমির পক্ষে ভাল। ঝলসা, ধসা, পামরী পোকা ও মাজরা পোকা মাঝারি ধরনের প্রতিরোধক্ষম।

লক্ষ্মী (সি. এন. এম-৬)—আই. আর ৮ এর মিউট্যাণ্ট। বীজ থেকে বীজের সময় খরিফে ১০৫ ও বোরোতে ১৪৬ দিন লাগে। ল্যাটেরাইটিক অঞ্চলও উঁচু জমির পক্ষে ভাল।

মোহন (সি. এম. আর-৪)—এটিও আর. আই. আর-৮ এর মিউট্যাণ্ট। ৬৫-৭০ দিনে ৫০ শতাংশের মত ফুল আসে। দানা বেঁটে খাটো গোলগাল প্রকৃতির। নোনা জমিও সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের পক্ষে ভাল।

কিষান (এস. জে. ২৪)—জয়া ও সোকার সংকর। খরিফে ৭৫-৮৫ দিন এবং বোরোতে ১২০-১৩০ দিনে ৫০ শতাংশ ফুল আসে। নাবি খরিফ ও জলদি বোরোর পক্ষে ভাল।

প্রাকৃতিক আবহাওয়া, জমির অবস্থান, সেচের সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী কোন মরসুমে পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কোন জাতের ধান চাষ করা যায় তা নিম্নে দেখানো হল। (কৃষি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশিত পুস্তিকা 'খরিফ ও বোরো মরসুমে ধান চাষ' হইতে গৃহীত হল, জুন, ১৯৮২)।

(ক) আউশ

এলাকা	উপযুক্ত জাত: অধিক ফলনশীল	উপযুক্ত জাত: স্থানীয়
১) খরা প্রবণ কাঁকুরে মাটি অঞ্চলঃ	বোনা ও রোয়ার উপযোগী ঃ	
সমগ্র পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলা এবং মেদিনীপুর, বর্ধমান ও বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চল।	আই-ই-টি৮২৬৩১৪৪৪(রসি), পলমন ৫৭৯ ও সি-আর ১২৬-৪২-১।	দুলার
	কেবল রোয়ার উপযোগী ঃ	
	রত্না, পুসা ৩৩-৩০, সি-এন-এম-৬ এবং ২৫, আই-ই-টি ২২৩৩ ও আই আর-৩৬, আই-ই-টি ৪০৯৬।	
২) পলিমাটি অঞ্চল ঃ	বোনা ও রোয়ার উপযোগী ঃ	
মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলী, পশ্চিম দিনাজপুর (ইসলামপুর মহকুমা বাদে) এবং বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার পূর্বাঞ্চল।	পলমন ৫৭৯, সি-এন-এম ২৫, সি-আর ১২৬-৪২-১, আই-ই-টি ২২৩৩ ও আই-আর ৩৬।	দুলার ও এন-সি ১৬২৬
	কেবল রোয়ার উপযোগী ঃ	
	রত্না, সি-এন-এম ৬ ও আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি) ও ৫০৯৪।	
৩) তরাই অঞ্চল ঃ	কেবল বোনার উপযোগী ঃ	
কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি ও পঃ দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমা।	আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি) ও ২২৩৩, পলমন ৫৭৯ এবং সি-আর ১২৬-৪২-১ (তবে এসব জাতগুলি তরাই অঞ্চলে পাকতে বেশী সময় নেয়। তাই এসব জাতের আউশ কেটে আমন ধান যথা সময়ে রোয়া যায় না)।	দুলার ও এন-সি ১৬২৬

পূর্ব পৃষ্ঠার উল্লেখিত সব এলাকাতেই দেশী জাতের সি-এইচ ৪৫ চাষ করা যাবে।

(খ) আমন

এলাকা ও জমির অবস্থান	উপযুক্ত জাত: অধিক ফলনশীল	উপযুক্ত জাত: স্থানীয়
১) পাহাড়ী অঞ্চল ঃ উঁচু (২" পর্যন্ত জল)	১৩০—১৪০ দিনে পাকে ঃ (২০০০ ফুটের নীচে) আই-আর ২০ ও ৩৬, পলমন ৫৭৯ এবং (২০০০—৪০০০ ফুটের মধ্যে) কালিম্পং-১ ও সি-আই ৫১৩০।	বাদকলমকাটি।
২) তারাই অঞ্চল ঃ উঁচু (৪" পর্যন্ত জল)	১০০—১২০ দিনে পাকে ঃ পলমন ৫৭৯, আই-ই-টি ২২৩৩ ও ২৮১৫ (শস্যশ্রী) ও ৪০৯৪ এবং আই-আর ৩৬।	বাদকলমকাটি। ও চূর্ণকাটি।
মাঝারি (৪"—৮" জল)	১২০—১৪০ দিনে পাকে ঃ আই-আর ২০ ও ২২, সি-এন-বি-পি-২১৭, আই-ই-টি ২২৫৪ (প্রকাশ)।	পাটনাই-২৩ ও নাগরা।
মাঝারি নীচু (৮"—১২" জল)	১৪০—১৫০ দিনে পাকে ঃ পঙ্কজ, সি-এন ৫৪০, মাসুরি ও আই-ই-টি ৩২৫৭ (অনামিকা) ও ৫৬৫৬ (স্বর্ণ)।	
৩) কাঁকুরে ও লালমাটি অঞ্চল ঃ উঁচু (২" পর্যন্ত জল)	১০০—১১০ দিনে পাকে ঃ আই-ই-টি ৮২৬ ও ১৪৪৪ (রসি) এবং সি-আর ১২৬-৪২-১।	বাদকলমকাটি ও চূর্ণকাটি।
মাঝারি (২"—৪" পর্যন্ত জল)	১১০—১২৫ দিনে পাকে ঃ রত্না, পলমন ৫৭৯, জয়া, আই-ই-টি-১৪৪৪ (রসি), ২২৩৩ ও ২৮১৫ (শস্যশ্রী) ও ৪০৯৪, সি-এন-এম ৬ ও ২৫ এবং আই-আর ৩৬।	ঝিঙাশাল, কলমা-২২২, ভাসামানিক, রূপশাল, পাটনাই-২৩ ও রঘুশাল।

এলাকা ও জমির অবস্থান	উপযুক্ত জাত অধিক ফলনশীল	স্থানীয়
	১২৫—১৪০ দিনে পাকে ঃ আই-আর ২০ এবং আই-ই-টি ২২৫৪ (প্রকাশ)।	
নীচু (৪"—৮" পর্যন্ত জল)	১৪০ দিনে পাকে ঃ পঙ্কজ, মাসুরি, আই-ই-টি ৩২৫৭ (অনামিকা) ও ৫৬৫৬ (স্বর্ণ) এবং জগন্নাথ।	তিলককাচারি রঘুশাল ও এন-সি ৬৭৮।
৪) পলিমাটি অঞ্চল ঃ উঁচু (২"—৪" পর্যন্ত জল)	১০০—১২০ দিনে পাকে ঃ পলমন ৫৭৯, রত্না, সি-আর-১২৬-৪২-১, আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি) ২২৩৩ ও ২৮১৫ (শস্যশ্রী) ও ৪০৯৪ এবং আই-আর ৩৬।	বাদকলমকাটি ও চূর্ণকাটি।
মাঝারি (৪'—৮' পর্যন্ত জল)	১২০—১৪০ দিনে পাকে ঃ জয়া, আই-আর ২০, সি-এন-এম ৩১, আই-ই-টি ১১৩৬, ২৮১৫ (শস্যশ্রী) ও ২২৫৪ (প্রকাশ) এবং সি-এন-বি-পি ২১৭।	নাগরা ভাসামানিক, রূপশাল, ঝিঙাশাল, কলমা-২২২ ও দুধসর।
মাঝারি নীচু (৮"—১২" পর্যন্ত জল)	১৪০—১৫০ দিনে পাকে ঃ পঙ্কজ, মাসুরি, আই-ই-টি ৩২৫৭ (অনামিকা) ও ৫৬৫৬ (স্বর্ণ), সি-আর ১০০৯ এবং সি-এন ৫৪০।	পাটনাই-২৩ রঘুলশাল ও এন-৬৭৮।
নীচু (৩' পর্যন্ত জল)	১৫০ দিনের পরে পাকে ঃ	এন-সি-১২৮১ ও-সি ১৩৯৩, তিলককাচারি, আছড়া ও কুমড়াগোড়।
বেশী নীচু (৩' উপরে জল জমে)	১৮০ দিনের পরে পাকে ঃ	জলধি-১ ও ২।

এলাকা ও জমির অবস্থান	উপযুক্ত জাত	
	অধিক ফলনশীল	স্থানীয়
৫) সমুদ্র উপকূল অঞ্চল : মাঝারি নীচু (৪″—১২″ জল জমে)	১৩০—১৫০ দিনে পাকে : আই-ই-টি ১১৩৬, ২২৫৪ (প্রকাশ) ও ১৮৮৫ (বিক্রম) ৬১৪২ এবং আই-আর ২০, মাসুরি এবং সি-এন ৫৪০।	পাটনাই-২৩, রূপশাল ও সীতাশাল।
নীচু (১′—৩′ জল জমে)	১৫০ দিনের পরে পাকে :	এন-সি ১২৮১, ও-সি ১৩৯৩, এন-সি ৬৭৮, তিলককাচারি ও কুমড়াগোড়।
৬) লবণাক্ত অঞ্চল :	—	পাটনাই-২৩ ও এস-আর ২৬ বি।
৭) বন্যাপ্রবণ অঞ্চল :	—	এফ-আর ১৩এ, ২৬বি, আছাড়া ও তিলককাচারি।

রোগ-পোকর আক্রমণ সহনশীল জাত

যেসব এলাকায় বিশেষ কোন রোগ বা পোকার উপদ্রব দেখা যায়, সেসব এলাকায় চাষের জন্য নীচের তালিকা অনুসারে রোগ-পোকার আক্রমণ সহনশীল জাত নির্বাচন করা ভাল।

রোগ / পোকার নাম	সহনশীল জাতের নাম
পামরি পোকা	আই-ই-টি ২৮১৫
ভেঁপু পোকা	আই-ই-টি ২৮৮৫ (বিক্রম), শক্তি ও মাসুরি।
মাজরা পোকা	আই-আর ৩৬, আই-ই-টি ২৮১৫, আই-আর ২০।
বাদামী শোষক পোকা	আই-আর ৩০ ও ৩৬, পলমন-৫৭৯ এবং আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি)।
ঝলসা রোগ (ব্লাস্ট)	আই-আর ২২ ও ৩৬, প্রকাশ, অনামিকা, রসি ও আই-ই-টি ৩২৫৭।
টুংরো রোগ	আই-আর ২০ ও ৩৬ এবং সি-এন ৫৪০ এবং আই-ই-টি ২৮১৫ ও ২৮৯৫।

বিভিন্ন রোগ ও পোকা সহনশীল জাত হিসাবে আই-আর ২০ ও ৩৬ এবং আই-ই-টি ২৮৫ (শস্যশ্রী) ও ১৪৪৪ (রসি) ব্যবহার করা যেতে পারে।

বোরো চাষে ধানের জাত

যদি সেচের জল পাওয়ার ব্যবস্থা থাকে ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত (চৈত্রের মাঝামাঝি)	সি-আর ১২৬-৪২-১, সি-এন-এম ২০, পুষা ৩৩-৩০, আই-ই-টি ১৪৪৪, আই-ই-টি ২২৩৩, আই-ই-টি ২৬৮৪, আই-ই-টি ৮২৬ ও জে-এস ৫২-১০২
১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত (চৈত্রের শেষ)	পলমন ৫৭৯; আই-আর ৩০, আই-আর ৩৬, আই-ই-টি ৪০৯৪, রত্না
৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত (বৈশাখের মাঝামাঝি)	সি-এন-এম ৩১, আই-ই-টি ২৮১৫, লাঠিশাল, কলমা ২২২, মাসুরি
৩০শে এপ্রিলের পর (বৈশাখের মাঝামাঝি)	আই-ই-টি ২২৫৪, সি-এন-বি-পি ২১৭ ও সি-এন-এম ২০

অধ্যায় পাঁচ

ধানের বীজ উৎপাদন ও তার ব্যবহার

(Rice Seed Production and Handling)

অধ্যায় পাঁচ

ধানের বীজ উৎপাদন ও তার ব্যবহার

অধিক গুণ সম্পন্ন বীজ বলতে সেগুলিকে বোঝাবে যেগুলির জাতগত চারিত্রিক বা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য খুবই সুস্পষ্ট হবে, বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম শক্তি অন্ততপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগের উপর এবং কোন রকম আগাছা জাতীয় বীজ বা অন্য কোন ধরনের বীজ বা অন্য কোন কিছু জিনিষ মেশানো থাকবে না। এই অধিক গুণ সম্পন্ন বীজ কয়েকটি ধারাবাহিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর (Seed Certification Programme) কৃষকের হাতে পৌঁছায়। চাষের কাজে যে বীজ লাগে তাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে যেমন ব্রীডার বীজ, ফাউনডেসন বীজ, রেজিষ্টার বীজ এবং সার্টিফাইড্ বীজ। এগুলি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় মানের উপর ভিত্তি করে হয়, বিশেষ করে গুণগত মান যেমন বীজের মধ্যে অন্য কোন জিনিষ মিশে আছে কিনা বা জাতগত বিশুদ্ধতা রয়েছে কিনা বা অঙ্কুরোদ্‌গম শক্তি কতখানি রয়েছে ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গে ৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষের জন্য প্রায় ২৫ লক্ষ টন বীজের প্রয়োজন। এ পরিমাণ বীজ সরকারের পক্ষে যোগান দেওয়া সম্ভব নয়। সরকারী খামারে ফাউণ্ডেশন বা রেজিস্‌টারস্ বীজ তৈরী করার পর ঐ বীজ রেজিষ্টারড্ কৃষকের মাধ্যমে পুনরায় বাড়িয়ে সার্টিফায়েড বীজ তৈরী করার পরিকল্পনা বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই ভাবে কৃষক এগিয়ে এলে ভাল বীজ পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

এখানে বিভিন্ন ধরনের বীজের সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল।

ব্রীডার বীজ (Breeder seed)

এই বীজ সব থেকে ভাল ও বিশুদ্ধ। সাধারণতঃ নির্বাচন বা সংকর প্রজননের মাধ্যমে পাওয়া যায়। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে যে ধানের জাত নির্বাচন করা হয় তা অন্যান্য প্রচলিত জাতের তুলনায় ভাল। অন্ততপক্ষে তিন বার পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে এই নতুন জাতের বীজ যে ব্যক্তি বা সংস্থা তৈরী করে তাদের আয়ত্তে থাকে। তারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষার জন্য সামান্য পরিমাণে বিভিন্ন সংস্থাতে পাঠাতেও পারে।

ফাউণ্ডেসন বীজ (Foundation Seed)

ব্রীডার বীজ বাড়িয়ে ফাউণ্ডেসন বীজ করা হয়। এই বীজ তৈরী করার সময় খেয়াল রাখা হয় যাতে বীজের বিশুদ্ধতা বজায় থাকে। এই বীজ থেকে সার্টিফায়েড বা রেজিষ্টারড্ বীজ তৈরি হয়। বীজ চিহ্নিত করার জন্য সাদা রঙের ট্যাগ ব্যবহার করা হয়।

রেজিষ্টারড্ বীজ (Registered seed)

ফাউণ্ডেসন বীজ বাড়িয়ে এই বীজ তৈরি হয়। এখানেও জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা বজায় রাখা হয়। এই ধরণের বীজকে চিহ্নিত করার জন্য বাদামী রঙের ট্যাগ ব্যবহার হয়।

সার্টিফায়েড বীজ (Certified seed)

এ বীজ ফাউণ্ডেসন, রেজিষ্টারড্ অথবা কোন কোন সময় সার্টিফায়েড বীজ থেকেও হতে পারে। এই বীজই কৃষকের ব্যবহারের জন্য পাঠানো হয়! বীজ যারা উৎপাদন করে তারা একটি নির্দ্দিষ্ট দামে বিক্রি করে। এই বীজ উৎপাদন করার সময় মনে রাখতে হবে ফাউণ্ডেসন বীজ পাওয়ার পর দুবারের বেশী যেন পরীক্ষা করা না হয় এবং বীজ সার্টিফিকেশন সংস্থার নির্দ্দেশ অনুযায়ী বীজের গুণগত মান বজায় থাকে। এ শ্রেণীর বীজে নীল-রঙের ট্যাগ ব্যবহার হয়।

সারণি ৬, ভারতীয় বীজ আইন (১৯৬৬) অনুসারে ধান বীজের গুণমত মান

বীজের মান	ব্রীডার বীজ	সার্টিফায়েড বীজ
● বিশুদ্ধ (Pure) বীজ	৯৮ শতাংশ	৯৮ শতাংশ
● বাজে জিনিষ (খুব বেশী হলে)	২.০ শতাংশ	২.০ শতাংশ
● অন্য শস্যের বীজ (বেশী হলে)	প্রতি কেজিতে ১০টি	০.১০ শতাংশ
● মোট আগাছার (বীজ বেশীর পক্ষে)	প্রতি কেজিতে ১০টি	০.১০ শতাংশ
● আপত্তিকরআগাছারবীজ(বেশীহলে)	প্রতি কেজিতে ২টি	প্রতি কেজিতে ৫টি
● অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা (বেশীতে)	৮০ শতাংশ	৮০ শতাংশ
● বীজের আর্দ্রতা (বেশী হলে)	১২ শতাংশ	১২ শতাংশ
● রাখা পাত্রের আর্দ্রতা (বেশী হলে)	৮ শতাংশ	৮ শতাংশ

বীজ আইন (১৯৬৬) কৃষি ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদনের জন্য অধিক ফলনশীল বীজ বা বীজের জাতের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হওয়ায় এবং বিভিন্ন ফসলের অসংখ্য অধিক ফলনশীল বীজের জাত উদ্ভব হওয়ার পরই এসব বীজের উৎপাদন ক্ষমতা বা গুণগত মান বজায় রাখার জন্য একটি সর্বার্থসাধক আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং সে উদ্দেশ্যেই 'ভারতীয় বীজ আইন ১৯৬৬' নামে একটি আইন করা হয়েছে। পয়লা অক্টোবর, ১৯৬৯ থেকে এ আইন সারা দেশে কার্যকরী হয়েছে। ভারতীয় বীজ আইনে উৎপাদন ও চাহিদা বিচার করে কিছু কিছু জাতের বীজকে সারা দেশের জন্য অথবা দেশে কোন কোন অঞ্চলের জন্য অনুমোদন করার ব্যবস্থা রয়েছে। ঘোষিত এইসব বীজের বা জাতের বিক্রয় নিয়ন্ত্রণই এই আইনের মূখ্য উদ্দেশ্য। অনুমোদিত বীজ যারা বিক্রি করবেন বা সরবরাহ করবেন তাঁরা তিন বছর ধরে পুরো বিবরণ রেখে যাবেন !

অধিক ফলনশীল বা উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে প্রত্যাশিত ফলন পাওয়ার অন্যতম উপায় হলো সেই জাতের সার্টিফায়েড বীজ ব্যবহার করা। সার্টিফায়েড বীজ, বীজ সার্টিফিকেশন সংস্থার দ্বারা অনুমোদিত উৎপাদকের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে। এই অনুমোদিত উৎপাদক বীজ বোনা থেকে ফসল কাটা পর্য্যন্ত প্রতিটি পর্যায় সরকার অনুমোদিত বীজ সার্টিফিকেশন সংস্থার সার্টিফায়েড বীজের প্রতিটি বস্তা সার্টিফিকেশন সংস্থার শংসাপত্র লাগানো থাকে যাতে বীজের চারিত্রিক বা বাহ্যিক বিশুদ্ধতার গ্যারাণ্টি দেওয়া থাকে।

সার্টিফায়েড বীজ তৈরীর পদ্ধতি ঃ

অনেক সময় কৃষক সার্টিফায়েড বীজ বা ভাল বীজ সংগ্রহ করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে যেভাবে সার্টিফায়েড বীজ তৈরী করা হয় সেভাবে কৃষক যদি নিজের বীজ তৈরী ও সংরক্ষণ করেন তাহলে অধিক ফলন তিনি আশা করতে পারেন। নিচে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেভাবে সার্টিফায়েড বীজ বা ভালবীজ তৈরী করা সম্ভব।

- জমিতে উপযুক্ত ধানের জাত বেছে চাষ করতে হবে।
- বীজ উৎপাদনের জন্য যে জায়গা ঠিক করা হবে সেখানে অন্য কিছু চাষ করা উচিত নয়।
- যে জাতের বীজ উৎপাদনে জন্য ঠিক করা হয়েছে সে জাত যেন তার আগের বছর ঐ জমিতে চাষ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রত্না ধানের পর রত্না ধান
- শস্যের ফলন বেশী হওয়ার জন্য সুপারিশ মত পরিচর্যার ব্যবস্থা নিতে হবে অর্থাৎ সময়েও পরিমাণমত জল, সার, ঔষধ ইত্যাদি প্রয়োগ করা।
- ফসলের দিকে নিয়মিত লক্ষ্য রাখতে হবে। যে জাতের বীজ চাষ করা হয়েছে তার থেকে অন্য কোন ধরণের ধান যদি ক্ষেতে দেখা যায় (বিশেষ করে গাছের উচ্চতা ও পাকার সময় ধরে চিনতে হবে) তাহলে তখনই জমি থেকে তা তুলে দিতে হবে। কমপক্ষে তিন তিনবার এভাবে বাছাই করতে হবে—পাশকাকাঠি ছাড়ার সময়, শীষ বেরোবার সময় ও ফসল পাকার মাঝামাঝি সময়। এছাড়া বীজতলা বা প্রধান জমিতে যদি অন্য কোন ধরণের আগাছা বা গাছ থাকে তাকেও তুলে ফেলে দিতে হবে। তা নাহলে নির্দিষ্ট ধানের বীজের সংগে মিশে যাবে।
- ধান কেটে রাখা এবং তাকে শুকনো করা আলাদা আলাদা জায়গায় করতে হবে। জমির চারধারে তিন মিটার করে জায়গা ছেড়ে রেখে বীজের জন্য ধান কাটতে হবে।
- থলিতে পরিষ্কার বীজ ভরার আগে থলি ভাল করে উল্টে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন আধারে রাখতে হলে সেখানে যদি আগে ধানও থাকে তাহলেও তা ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

- বীজের নমুনা বীজ সার্টিফিকেশন সংস্থার কাছে পাঠাতে হবে। ফসল মাঠে থাকাকালীন বীজ পরিদর্শক মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবেন। অনুমোদিত উৎপাদক ছাড়া অন্যান্যদের এ ধরণের পরিদর্শন বা নমুনা পাঠাবার প্রয়োজন নেই।
- বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। খুব কম হলে ঐ বীজ বুনবেন না বা বুনতে হলে সে অনুপাতে বেশী বীজ দিতে হবে।

অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য পেট্রিডিস বা অন্য যেকোন পাত্রে কোন পছন্দ না করে ১০০টির মত বীজ রেখে সামান্য মাটি ছিটিয়ে দিতে হবে। মাঝে মাঝে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে। বীজ বোনার এক সপ্তাহ পরে অঙ্কুরোদগমের সংখ্যা দেখে শতকরা হিসাব বার করতে হবে। এজন্য নিচের সূত্রটি ব্যবহার করা হয়।

$$\text{অঙ্কুরোদগম \%} = \frac{\text{অঙ্কুরিত বীজের সংখ্যা}}{\text{অঙ্কুরোদগমের জন্য যে বীজ ব্যবহার করা হয়েছে}} \times ১০০$$

অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বের করার পর অনেক সময় বোনার জন্য যে বীজের হার বলা হয় তা বদল করার দরকার হতে পারে। সেক্ষেত্রে পরের সূত্রটি ব্যবহার করা প্রয়োজন।

$$\text{পরিবর্তিত বীজের হার} = \frac{১০০}{\text{অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা (\%)}} \times \text{বীজের হার}$$

ধান বীজের সুপ্তকাল (Seed dormancy of rice)

পরিপক্ক বীজের অঙ্কুরোদগমের সব রকম পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও যখন অঙ্কুর বেরোতে পারে না তখন সেই বীজটির 'সুপ্তকাল বা বিশ্রাম কাল' চলছে বলা হয়। সব জাতের ধানের বীজের সুপ্তকাল থাকে না। তবে বিশেষ করে দেশী জাতের বীজে কম বেশী সুপ্তকাল থাকে।

বীজ কিছু সময় সুপ্ত অবস্থায় থাকলে অনেক সময় সুবিধা হয়। যেমন মাঠে ধান থাকাকালীন বৃষ্টি হলে ভিজে যায় কিন্তু শীষে বীজের অঙ্কুরোদগম হয় না। এছাড়া মাঠে যখন কিছু সময়ের জন্য ধান স্তুপ দিয়ে রাখা হয় তখনও অঙ্কুর বেরুবার ভয় থাকে না। আমাদের দেশের অবস্থাতে এর যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। কারণ বেশীর ভাগ ধান মৌসুমী আবহাওয়াতে চাষ হয়। যখন পাকে তখন অনেক সময় বৃষ্টি হয় এবং আবহাওয়া

অনেকটা আর্দ্র থাকার ফলে সহজেই বীজের অঙ্কুরোদগম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে সব জাতের বীজের সুপ্তকাল কম বা একেবারে থাকে না তাদের এ সমস্যা খুব বেশী ভাবে দেখা যায়!

বীজের এই সুপ্তাবস্থা বেশী সময় ধরে থাকলে অনেক সময় অসুবিধাও দেখা যায়। বিশেষ করে যাঁরা একই বীজ সারা বছর ধরে ব্যবহার করে থাকেন। তাঁরা আগের ফসলের বীজ পরে বোনার জন্য ব্যবহার করেন। সাধারণ নিয়মে সুপ্তাবস্থা শেষ হতে কোন কোন জাতের অনেক সময় ১২ সপ্তাহের মতো সময়ও লাগতে পারে।

বীজের সুপ্তকাল অনেক সময় উদ্ভিদ প্রজননবিদ্‌দের কাছেও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ অনেক সময় ধান কাটার পরই পুনরায় প্রজননের কাজে ঐ বীজ ব্যবহার করার দরকার হয়।

কোন বীজ পাকার পর থেকে পুনরায় প্রায় শতকরা ৮০ ভাগের মত অঙ্কুরোদগম হওয়া পর্য্যন্ত সময়কে সাধারণভাবে সেই বীজের সুপ্তকাল হিসাবে গণ্য করা হয়।

যাই হোক বিভিন্ন কারণে বীজের সুপ্তকালকে হ্রাস করার প্রয়োজন দেখা যায়। সেক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে ধানের সুপ্তাবস্থা নিম্নরূপে ভাঙ্গা সম্ভব হয়—

- ৫০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যদি মাঝারি বা কম সুপ্তকালের বীজ ৪-৫ দিন রাখা যায় বা বেশী সুপ্তকালের বীজ ৭-১০ দিনের মত রাখতে পারলে সুপ্তাবস্থা ভাঙ্গা সম্ভব হয়।
- রাসায়নিক পদ্ধতি হিসাবে ০.১ নরমাল (০.১ N) নাইট্রিক এ্যাসিডে বীজকে ৬ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখার পর পুনরায় পরিষ্কার জলে ধুয়ে ৫-৭ দিন ধরে শুকনো করতে হবে। এর পর অঙ্কুরোদগম শক্তি পরীক্ষা করলে মাঝারি বা কম সুপ্তকালের বীজে ৮০ শতাংশের মত অঙ্কুর বের হতে দেখা যায়।

অধ্যায় ছয়

ধানের পরিবেশ

(The Environment of Rice)

- মধ্যপ্রদেশের তেলেঙ্গানা এলাকা এবং কর্ণাটকের কিছু অংশ মিলিয়ে কেন্দ্রীয় বা মধ্য অঞ্চল। সাধারণতঃ বছরে একবার করে ধানের চাষ হয়ে থাকে।
- কেরালা, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা নিয়ে পশ্চিম-অঞ্চল। বেশী বৃষ্টিপাত অঞ্চলে বৃষ্টির উপর নির্ভর করে চাষাবাদ হয়। কেরালাতে বছরে দুই থেকে তিনবার পর্য্যন্ত ধানচাষ সম্ভব হয়।
- জম্মু, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হরিয়াণা, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ এবং উত্তর বিহার নিয়ে উত্তরাঞ্চল। শীতকালে তাপমাত্রা যথেষ্ট কম থাকে তাই মে থেকে অক্টোবরের মধ্যে ধানের চাষ হয়ে থাকে।

ধানের সারা জীবনকাল ধরে তাপমাত্রা মোটামুটি ভাবে ২০° থেকে ৩৭.৭° সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকলে ভাল। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে মোটামুটিভাবে সারা বছর ধান চাষের উপযোগী তাপমাত্রা থাকে। উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতে শীতকালীন তাপমাত্রা বেশ নীচে নেমে যায় তাই বছরে একবার ধান চাষ সম্ভব। গাছে ফুল আসা ও ফুলে পরাগসংযোগ ও নিষিক্তকরণ ইত্যাদির জন্য ১৬° থেকে ২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রয়োজন কিন্তু পাকার সময় ২৮° থেকে ৩২° সেলসিয়াস হলে ভাল। ৩৫° সেলসিয়াস এর বেশী হলে দানা ভাল পুষ্ট হয় না। গাছের পাশকাঠি বেরুবার সময় বেশী তাপমাত্রার প্রয়োজন। কিন্তু থোড় আসার সময় ২০° থেকে ২২° সেলসিয়াস হলে ভাল।

সাধারণভাবে বলা যায়, দেরীতে পাকে এমন জাতগুলি আলোক সংবেদনশীল, কিন্তু জলদি জাত যেকোন সময়ে চাষ করা যেতে পারে বিশেষ করে বোরো বা খরিফ হিসাবে।

তিনটি প্রধান ঋতুতে ধানের চাষ হয়ে থাকে এবং যে সময়ে কাটা হয় সেই সময় ধরে তার নামকরণ করা হয়। বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা এবং কত জায়গায় চাষ হয়, কত উৎপাদন হয় এবং উৎপাদিকা শক্তি কতখানি তা যথাক্রমে ২, ৩ নম্বর সারণিতে দেখানো হয়েছে।

মৃদুমন্দ বাতাস গাছের চারদিকে বইতে থাকলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ঘনঘন বদলাতে পারে। কিন্তু জোর বাতাস পরাগসংযোগ বা সালোক সংশ্লেষে বাধা দেয় এবং সে সঙ্গে ঝলসা রোগ বাড়াতে সাহায্য করে। জোর বাতাসে গাছ শুয়ে পড়ে বিশেষ করে ফুল ফোটার পর হলে ধানে চিটে হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

মাটি :

ধানের চাষ ভারতে যেসব মাটিতে হয়ে থাকে তাকে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যেতে পারে

- পলিমাটি [Alluvial–derived soil (Haplaquents, Ustifluvents, Udifluvents, Ustochrepts and Haplustalfs)
- সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের পলিমাটি–Coastal and deltaic alluvium (Tropaqualfs)
- চুনা পলিমাটি [Calcareous alluvial soil (Calciorthids)
- লাল মাটি–Red soils (Palestalfa, Rhodustalfs, Haplustalfs)
- লাল এবং হলদে মাটি–Red and yellow soil (Haplustults, Ochraquults, Rhodustults)
- ল্যাটেরাইট মাটি–Lateritic soils (Plinthaquults, Plinthustults, Plinthudūlts)
- কালো মাটি–Black soils (Ustochrepts, Ustropepts, Pellusterts, Chromustertes, Pelluderts)
- লাল ও কালো মাটির মিশ্রণ–Mixed red and black (association of Alfisols and Vertisols)
- ধূসর ও বদামী মাটি–Gray-brown soil (Calciorthids)
- পাহাড়ী বাদামী মাটি–Brown-hill soils (Palehumults)
- উপ পাহাড়ী মাটি–Submontane soils (Hapludalfs)
- তরাই মাটি Terai soils (Haplaquolls)
- মরুভূমি মাটি–Desert soil (Lithic Entisols Psamments, Calciorthids)
- নোনা ও ক্ষার মাটি–Saline and alkali soils (Salorthids and Natrargids)
- পিটি এবং নোনা পিটি–Peaty and saline peaty soil (Histosols)

মূর্তি (১৯৭৮) ভারতে ধান চাষের এলাকাকে আটটি মাটিও আবহাওয়া এলাকায় ভাগ করেছেন এবং ঐ সব এলাকায় বিভিন্ন মাটির অবস্থান নিম্নোক্ত সারণিতে দেখিয়েছেন।

জলবায়ু হিসাবে বিভিন্ন অঞ্চল	রাজ্য	মাটির প্রধান প্রধান শ্রেণী
• আর্দ্র পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল	জম্মু কাশ্মীর, হিমাচল-প্রদেশ, কুমায়ন গারওয়াল বিভাগ (উত্তর প্রদেশ)	উপ পাহাড়ীয়, পাহাড়ী ও তরাই মাটি
• বাংলা ও আসামের আর্দ্র অঞ্চল	পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম	নদীবিধৌত পলিমাটি, তরাই, ল্যাটেরাইট, লাল-হলুদ দোঁয়াশ, লালবেলে বা পাথুরে মাটি
• আর্দ্র পূর্ব হিমালয় অঞ্চল এবং উপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ	অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	লাল দোঁয়াশ, ল্যাটরাইট, লাল-হলদে ও পলিমাটি
• উষ্ণ আর্দ্র, শতদ্রু গঙ্গা বিধৌত সমতল পলিমাটি অঞ্চল	পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং দিল্লী	চুনা পলি, নদীবিধৌত পলি, লবণাক্ত ও ক্ষার মাটি, লাল-হলুদ দোয়াঁশ, লাল বেলে অথবা পাথুরে এবং লাল কালো মিশ্রিত মাটি
• উষ্ণ আর্দ্র থেকে আর্দ্র, পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বের উঁচু জমি	উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, এবং মধ্যপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল	ল্যাটেরাইট, লাল হলুদ দোয়াঁশ, লালবেলে অথবা পাথুরে, লাল এবং কালো মেশানো মাটি, সমুদ্র উপ-কূলবর্তী পলি, গাঢ় ও মাঝারি গাঢ় কালো মাটি, লাল দোয়াঁশ মাটি, ব-দ্বীপ পলি

জলবায়ু হিসাবে বিভিন্ন অঞ্চল	রাজ্য	মাটির প্রধান শ্রেণী
• পশ্চিমে উষর সমতলভূমি	হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট, দাদরা, নগর হাভেলি	পলিমাটি, লাল হলুদ মাটি, মাঝারি গাঢ় কালো মাটি
• অর্ধ উষর লাভা উপত্যকা এবং মধ্য উঁচু জমি	মহারাষ্ট্রের পশ্চিম ও মধ্যপ্রদেশ এবং কেন্দ্র শাসিত গোয়া, দমন ও দিউ।	নদীবিধৌত পলি, উপ-কূলবর্তী পলি, লালকালো মিশ্রিত মাটি, গাঢ় থেকে হালকা কালো মাটি, লাল বেলে অথবা পাথুরে মাটি।
• আর্দ্র থেকে অর্ধ উষর পশ্চিমঘাট এবং কর্ণাটক উপত্যকা	কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কেরালা, কেন্দ্র শাসিত পণ্ডিচেরী, লাক্ষাদ্বীপ	ল্যাটেরাইট, লাল বেলে, অথবা পাথুরে মাটি, ব-দ্বীপ পলি, উপকূলবর্তী পলি, লাল দোয়াঁশ মাটি

ধানের মাটির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ

গাছের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদন সরবরাহ করার শক্তিকে বলা হয় মাটির উর্বরতা। এই খাদ্যোপাদান সরবরাহ করার ক্ষমতা নির্ভর করবে বিশেষ করে—

- মাটিতে ও মাটির জলে গাছের যে খাদ্যোপাদান রয়েছে তার কতখানি গাছ নিতে পারবে এমন অবস্থায় রয়েছে,
- মাটির কতখানি ক্ষমতা রয়েছে যা দিয়ে ঐ খাদ্যকে গাছের শিকড়ের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে,
- কতখানি আয়নিক অবস্থায় খাদ্যোপাদান রয়েছে এবং
- যেসব রাসায়নিক পদার্থ গাছের খাদ্যোপাদনকে শিকড়ের কাছাকাছি নিয়ে যেতে বাধা দেবে তাদের পরিমাণের উপরে। এই সব কারণ মাটির ভৌত রাসায়নিক ধর্মকে খুবই প্রভাবিত করে।

উঁচু (আউস) ধানের জমি (upland rice)

উঁচু অবস্থানের জমি সমতল বা ঢালু উভয় প্রকার হতে পারে। বেশীর ভাগ জায়গায় শুকনো অবস্থায় জমি তৈরী করা হয়। বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখে

বীজ বোনা হয়ে থাকে। তবে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আল দিয়ে জল ধরে রেখে জমি কাদা করা হয় এবং চারা রোয়া হয়। মাটি বেলে থেকে এঁটেল প্রকৃতির হতে পারে, পি এইচ ৪ থেকে ৯ এর মধ্যে ; জৈব অংশের পরিমাণ ১ থেকে ৫০ শতাংশের মধ্যে, লবণের পরিমাণ প্রায় ০ থেকে ১ শতাংশের মধ্যে হতে পারে। খাদ্যোপাদান খুব সহজলভ্য হতে পারে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে অভাব দেখা যায়। এসব জমির ধান বিভিন্ন ধরণের আর্দ্রতার সম্মুখীন হয়।

মাটিতে কত পরিমাণ জল থাকবে তা মাটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে। এ ধরণের মাটিতে গাছ কত সময় বা কতদিন ধরে জলের অভাবে পড়বে তা নির্ভর করবে বৃষ্টিপাতের উপর বিশেষ করে এবং সেই সঙ্গে মাটির জলধারণ ক্ষমতা ও সেচের সুযোগ সুবিধার উপর।

গাছের বৃদ্ধিকালে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উঁচু ধানের জমিতে জল দাঁড়ায় না। ধান শারীর বৃত্তীয় ও আকৃতিগত দিক দিয়ে সব সময় তৈরী থাকে জল দাঁড়ানো অবস্থাতে বেঁচে থাকার জন্য। কিন্তু উঁচু জমির ধান শুকনো আবহাওয়াতে নিজেদের মানিয়ে নেয়। প্রকৃত পক্ষে উঁচু জমিতে ধান গাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় না। জমিতে খাদ্যোপাদানের অভাব বা আধিক্য থাকার জন্য অসুবিধা দেখা যায়। এই সবের জন্য ফলনও কম হয়। উঁচু জমিতে মাঝে মাঝে জল পাওয়ার জন্য বা অনিয়মিত ভাবে জল দাঁড়ানোর জন্য আয়রন ও সিলিকা খুব কম দ্রবণীয় হয়, নাইট্রোজেন নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়। এই অবস্থায় নাইট্রেট গাছ যেমন কিছুটা নিতে পারে তেমনি কিছুটা নষ্ট হয়। মাটি অম্ল বা ক্ষার হয়ে যাওয়ার সমস্যা দেখা যায়। পি এইচ বাড়লে অনেক সময় আয়রনের অভাব দেখা যায়। কম সময়ের জন্য যদি জল কোন প্রকারে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে আয়রণের অভাব জনিত লক্ষণ আর থাকে না।

যেখানে মাটি অম্ল প্রকৃতির সেখানে উঁচু ধানের জমিতে ফসফেটের অভাব দেখা দেবে। সিলিকার অভাবও এরূপ মাটিতে দেখা যায়। জিঙ্কের অভাব এই সব অবস্থায় কম দেখা যায়। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জায়গায় যেখানে ব্যাপকহারে এই সব উঁচু জমিতে আউস ধানের চাষ হয় সেখানে কোন কোন ক্ষেত্রে জিঙ্কের অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায়।

জৈব নাইট্রোজেন খুব তাড়াতাড়ি বায়বীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ ১ থেকে ২ শতাংশের মত না

হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত গ্যাসীয় অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পারে না। তাই বিজারিত অবস্থায় (Reduced) যতটা মোট নাইট্রোজেন রূপান্তরিত হয় জারণ অবস্থায় (Oxidised) ততটা ঠিক হয় না। নাইট্রোজেন বেশী নষ্ট হয় এবং গাছ কম নিতে পারে। জারণ অবস্থায় মাটি যদি শুকিয়ে যায় তাহলে পি এইচ এর সমতা থাকে না। সেই কারণে অম্ল মাটিতে ম্যাঙ্গানিজ এবং অ্যালুমিনিয়াম বিষক্রিয়া হয় এবং ক্ষার মাটিতে আয়রণের অভাব দেখা যায়।

জল জমা ধানের জমি (Submerged rice soil)

বেশীর ভাগ ধান নীচু জমিতে (Low land) জল জমা অবস্থাতে (Submerged or flooded condition) হয়ে থাকে। জল জমিনে যাতে জমে থাকে তার জন্য জমির চারদিকে বাঁধ দিয়ে দেওয়া হয় এবং পরে কাদা (Puddled) করা হয়। বৃষ্টি বা সেচ থেকে এই সব জমিতে জল পাওয়া যায়।

নীচু জলা জমির বৈশিষ্ট্য উঁচু জমির তুলনায় অনেকটা ভিন্ন। তাই এই ধরণের জমির সার প্রয়োগ বা পরিচর্যা পদ্ধতি উঁচু জমির তুলনায় ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। এই জমিতে যে ধরণের ভৌত, জৈবিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন হয়ে থাকে তা আলোচনা করা হল।

ভৌত পরিবর্তন

জমিতে জল ভরে গেলে মাটির দানার মধ্যে যে ফাঁক বা খালি জায়গা থাকে তাতেও জল ঢুকে চপচপে (সংপৃক্ত) হয়ে যায়। মাটি ফুলে উঠে, শক্ত ঢেলা নরম হয় এবং ছোট ছোট দানায় ভেঙ্গে যায়।

নীচু জমিতে ধান চাষ করতে গেলে জমি তৈরীর সময় জমি কাদা করার দরকার হয়। এর ফলে মাটির নীচে যে জল চলে যায় (Percolation loss) তা অনেকটা বাধা পায়, মাটির গঠন নষ্ট হয় এবং দানার মধ্যের খালি জায়গা (Pore space) পুরোপুরি ভাবে বন্ধ হয়। বাতাস চলাচল করতে পারে না।

জমিতে জল দাঁড়িয়ে থাকলে অথবা কাদানো জমিতে জল দাঁড়ালে দুটি বিশেষ স্তর (চিত্র ১৫) গড়ে উঠে। উপরের স্তর ১ থেকে ১০ মিলিমিটারের মত হতে পারে, জল থেকে অক্সিজেন নিতে পারে এবং ধীরে ধীরে বাদামী রঙে পরিবর্তিত হয়। এই স্তরকে অক্সিডাইজ (Oxidised zone) বা জারণ স্তর বলে। জল জমা নেই এমন উঁচু জমিতে নাইট্রোজেন সার দিলে যে

পরিণাম হয় এই স্তরেও নাইট্রোজেন দিলে একই অবস্থার সৃষ্টি হবে। নীচের স্তর—কাদানো মাটির নীচের বাকি অংশ গাঢ় বাদামী বা নীল বাদামী রঙে পরিবর্তিত হয়। মাটিতে রাসায়নিক ভাগ ও জৈব পদার্থের পরিমাণ কতখানি রয়েছে তার উপর রঙের গাঢ়ত্ব নির্ভর করে। জলজমা জমিতে যে আয়রন থাকে তাতে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিলে এই ধরণের রঙ দেখা যায়। এই স্তরকে রিডিয়ুসড (Reduced Zone) বা বিজারণ স্তর বলে। পি এইচ নীচের স্তরের থেকে উপরের স্তরে একটু কম হয়। জমিতে নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করতে গেলে এই দুটি স্তরের কথা বিবেচনা করতে হবে।

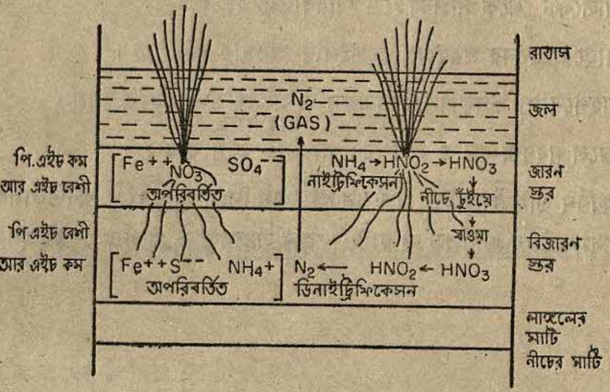
জৈবিক পরিবর্তন

অসংখ্য জীবাণু জৈব পদার্থের উপর কাজ করে। এই জীবাণুর সংখ্যা কতখানি হবে এবং কিভাবে কাজ করবে তা নির্ভর করবে জমি কিভাবে কাদানো হয়েছে, জমিতে কতখানি জল রয়েছে এবং অক্সিজেনের অভাব কতটা দেখা দিচ্ছে তার উপর। এ সবের জন্য জৈব পদার্থ উঁচু জমি বা যেখানে বাতাস চলাচল ভালভাবে হয় তার তুলনায় কাদানো জমিতে দেরীতে পচে। তাই নীচু জলা জমিতে সবুজ সার বা জৈবসার প্রয়োগ করলে ২ থেকে ৩ সপ্তাহ পরে ধানের চারা রোয়া করা হয়। তা নাহলে জৈব পদার্থ থেকে যেসব ক্ষতিকারক জিনিষ বের হয় তার দ্বারা চারার ক্ষতি হয়। এই ক্ষতিকারক পদার্থগুলির মধ্যে দূষিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বনিক এ্যাসিড, মিথেন, দ্রবণীয় আয়রণ, সিলিকন ও ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি প্রধান। জমিতে জলজমা থাকলে জৈব পদার্থে যে নাইট্রোজেন থাকে তা এ্যামোনিয়ামে (NH_4) এ রূপান্তরিত হয়। মাটিতে ইহা সহজে পরিবর্তন হয় না। পরে ধান গাছের শিকড় তা থেকে নিতে পারে। কিন্তু জমিতে যদি জল জমা না থাকে তাহলে উঁচু জমির মত অবস্থা হয় অর্থাৎ এ্যামোনিয়াম থেকে নাইট্রেট (NO_3) নাইট্রোজেন হয়ে নষ্ট হয়। শেষে জমিতে জমলেও এটি রোধ করা যায় না। এইভাবে নাইট্রোজেনের নষ্ট হওয়াকে ডিনাইট্রিফিকেশন বলে।

যেহেতু জল থাকলে নাইট্রেট নাইট্রোজেন থেকে নাইট্রোজেন হয়ে নষ্ট হয় তাই এই অবস্থাতে নাইট্রেট ঘটিত সার ব্যবহার করা উচিত হবে না।

এ ছাড়া এ্যামোনিয়াম ঘটিত সার হিসাবে শেষ চাষের আগে প্রয়োগ করে মাটিতে ভাল করে মিশিয়ে না দিলেও ডিনাইট্রিফিকেশন হতে পারে।

অক্সিডাইজ স্তরে জীবাণুরা এ্যামোনিয়ামকে নাইট্রেটে রূপান্তরিত করে। নাইট্রেট নীচে রিডিয়ুসড্ স্তরে গিয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস হয়ে নষ্ট হয়। কিন্তু



চিত্র ১৫ : জল দাঁড়ানো জমির বিভিন্ন স্তর ও নাইট্রোজেনের পরিবর্তন

এ্যামোনিয়াম সার যদি নীচের স্তরে (Reduced Zone) ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সহজে নাইট্রেট এবং নাইট্রোজেন গ্যাস হয়ে নষ্ট হয় না। তাই এ্যামোনিয়া বা এ্যামোনিয়াম ঘটিত সার যেমন এ্যামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া, এ্যামোনিয়াম ফসফেট ইত্যাদি জলা জমিতে ব্যবহার করা হয়।

রাসায়নিক পরিবর্তন

জলা জমিতে যে রাসায়নিক পরিবর্তন হয়ে থাকে তাহা নিম্নরূপ।

- জলভরার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জমিতে অক্সিজেনের ভাগ কমে যায়।
- জারণ-বিজারণ বিভব (Redox potential) কমে যায়।
- অম্লমাটিতে পি এইচ বাড়ে এবং চূণা বা ক্ষার মাটিতে কমে। উভয় ক্ষেত্রেই জল জমার এক সপ্তাহের মধ্যে পি এইচ স্বাভাবিক (Normal) হয়ে আসে (অর্থাৎ ৬ থেকে ৭ এর মধ্যে হয়)।
- স্পেসিফিক কনডাকটেনস (Specific conductance) বেড়ে যায়।
- ফেরিক আয়রণ থেকে ফরাস আয়রন এবং ম্যাঙ্গানিক থেকে ম্যাঙ্গানাসে পরিবর্তিত হয়।

- নাইট্রেট থেকে নাইট্রাইট ও পরে গ্যাসীয় নাইট্রোজেনে ও নাইট্রাস অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়ে নাইট্রোজেন নষ্ট হয়।
- সালফেট থেকে সালফাইডে পরিবর্তিত হয়।
- নাইট্রোজেনের সরবরাহ ও গ্রহণীয় অবস্থার বৃদ্ধি হয়।
- গ্রহণযোগ্য ফসফরাস, সিলিকন ও মলিবডিনাম বৃদ্ধি পায়।
- জলে দ্রবণীয় দস্তাও কপারের পরিমাণ কমে যায়।
- কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন ও অন্যান্য বহুপ্রকার ক্ষতিকারক পদার্থ যেমন জৈব এ্যাসিড ও হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতি তৈরী হয়।

অধ্যায় সাত

চাষাবাদের বিভিন্ন পদ্ধতি

(The different methods of establishment)

অধ্যায় সাত

চাষাবাদের বিভিন্ন পদ্ধতি

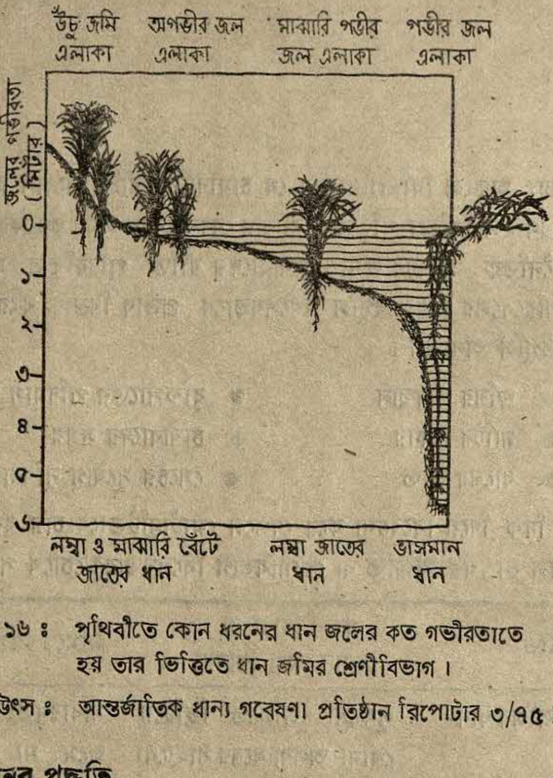
বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধানের যে চাষাবাদের রীতি প্রচলন রয়েছে তার একটি কারণ হল বিভিন্ন পরিবেশ, আবার কোন কোন সময় কৃষকের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার জন্যও চাষাবাদের রীতি পরিবর্তিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে যেগুলি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্যতম।

- জমির অবস্থান
- মাটির প্রকার
- ধানের জাত
- বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও বিস্তার
- চাষাবাদের সময়
- সেচের সুযোগ সুবিধা

সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখলে মোটামুটিভাবে চার ধরনের (চিত্র ১৬) ধান চাষের পদ্ধতি বা শ্রেণীবিভাগ বিশেষভাবে চোখে পড়বে !

চাষের পদ্ধতি	ফসল বোনা বা রোয়ার মধ্যে কোনটি	জমিতে জলের পরিমাণ
● উঁচু জমির ধান	শুকনো জমিতে ছিটিয়ে বোনা অথবা যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে বোনা	সাধারণতঃ জমিতে জল জমে না এবং বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল
● নীচু জমির ধান		
অগভীর নীচু	চারা রোয়া	৫ থেকে ১৫ সেঃ মিঃ
মাঝারি নীচু	চারা রোয়া	১৬ থেকে ৫০ সেঃ মিঃ
● গভীর জলের ধান	জমি যখন শুকনো থাকে তখন ছিটিয়ে বোনা হয়	৫১ থেকে ১০০ সেঃমিঃ
● ভাসমান ধানের চাষ	জমি শুকনো অবস্থায় বোনা হয়	১০১ থেকে ৬০০ সেঃ মিঃ

চাষাবাদের পদ্ধতি একটি থেকে অপরটির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে প্রথমে শস্য স্থাপনের পদ্ধতি আলোচনা করা গেল পরে চাষের পদ্ধতিগুলিও বলা হয়েছে।



চিত্র ১৬ : পৃথিবীতে কোন ধরনের ধান জলের কত গভীরতাতে হয় তার ভিত্তিতে ধান জমির শ্রেণীবিভাগ।

[উৎস : আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিপোর্টার ৩/৭৫]

শস্য স্থাপনের পদ্ধতি

ধান সাধারণত দুটি উপায়ে লাগানো হয়

- সরাসরি বুনে
- চারা রোয়া করে

এই দুই পদ্ধতির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল চারা রোয়ার ক্ষেত্রে চারা অন্য জায়গায় তৈরী করে পরে প্রধান জমিতে রোয়া করা হয়। কিন্তু অপর পদ্ধতিতে শুকনো বা কাদানো জমিতে সরাসরি ছিটিয়ে বা সারিতে বোনা হয়।

সরাসরি বীজ বোনা

এই ধরনের বীজ বোনা আবার দুভাবে হতে পারে

- শুকনো জমি চাষ দেওয়ার পর বীজ ছিটিয়ে অথবা সারিতে বোনা
- জলা জমি কাদানোর পর অংকুরিত বীজ ছিটিয়ে অথবা সারিতে বোনা

প্রথম অবস্থার জন্য মৌসুমী বৃষ্টি নামার আগে শুকনো জমিতে বেশ কয়েকবার লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি লাঙ্গল ও মই দিয়ে ঝুর ঝুরো করা হয়। গমের মত ধানকেও হাত দিয়ে ছিটিয়ে বোনা অথবা বীজ বোনা যন্ত্রের সাহায্যে বোনা অথবা লাঙ্গলের সাহায্যে সারিতে বোনা যেতে পারে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫ সেণ্টিমিটার রাখা হয়। এরূপভাবে ছিটিয়ে বা সারিতে বোনার জন্য বীজের পরিমাণ হেক্টার প্রতি যথাক্রমে ৭৫-৮৭ কেজি ও ৬২-৭৫ কেজি লাগে অবশ্য কোন জাতের বীজ এবং কোন সময়ে বোনা হবে তার উপর বীজের হার কিছুটা নির্ভর করে। বীজ বোনার পর বীজ মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া দরকার। বীজ ৩ সেণ্টিমিটারের বেশী গভীরে বোনা ঠিক হবে না। বীজ বোনার পর বৃষ্টি না হলে সেচের বন্দোবস্ত রাখা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অবস্থার জন্য প্রথমে জমিকে কাদা করতে হবে। শুধু একটি বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে তাহলো জলের পরিমাণ জমিতে যেন কম থাকে। কারণ বেশী জল থাকলে অংকুরিত বীজ পচে যাবার সম্ভাবনা থাকে। জমি ঠিক ঠিক মত কাদানোর পর অংকুরিত বীজ (শিকড় যখন এক থেকে দুই মিলিমিটারের মত লম্বা হয়) হেক্টার প্রতি ৯০ থেকে ১০০ কেজি হারে হাত দিয়ে সমানভাবে ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

এই দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বীজ বুনতে গেলে অসুবিধা যেগুলি দেখা যায় তাহলো বীজ বোনার পর পাখী বা ইঁদুরে খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া বীজ বোনার ঠিক পরে বেশী বৃষ্টি হলে ধুয়ে একদিকে চলে যেতেও পারে। এ ধরণের অসুবিধা দূর করার জন্য ৫ সেণ্টিমিটারের মত জল জমা অবস্থাতে বীজ বোনাটা ভাল। কাদানোর ঠিক পরে বীজ না বুনে ঘোলাটে মাটি ধীরে ধীরে থিতিয়ে গেলে তারপর বুনলে ভাল। এ ছাড়া আর একটি অসুবিধা দেখা দেয় তা হলো ঠিক ঠিক জলের পরিমাণ বিশেষ করে খরিফ মরশুমে বজায় রাখা সহজ হয় না। তাই খরিফের বদলে বোরো মরসুমে কিছুটা কার্যকরী পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

চারা রোয়া (Transplanting)

চারা দুরকম উপায়ে লাগানো হয়—কোন নির্দিষ্ট ছক মাফিক চারা রোয়া না করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রোয়া। এতে বিশেষ করে আগাছা দমনের সময় চাকা নিড়ানী বা অন্য কোন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায় না। অপর পদ্ধতি হলো সারিতে রোয়া। এর সুবিধা হলো নির্দিষ্ট জায়গায় গুছির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা ও শস্যের বিভিন্ন রকম পরিচর্যা ভালভাবে করা সম্ভব। যেখানে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাবে সেখানে ব্যবহারের সময় কোন অসুবিধা হয় না। তবে কোন অসুবিধা যে হয় না তা ঠিক নয়। এ পদ্ধতিতে চারা রোয়া করার খরচ একটু বেশী পড়ে। গাছ থেকে গাছ এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব কোন ঋতুতে রোয়া হবে, কোন্ জাতের ধান এবং মাটির উর্বরতা শক্তি কেমন হবে তার উপর নির্ভর করে থাকে। তবে সাধারণভাবে যেকোন জায়গায় সারির দূরত্বে ২০-২৫ সেণ্টিমিটারের বেশী হওয়া উচিত না।

চারা রোয়ার পদ্ধতি (চিত্র ১৯) প্রথমে বাতাসকে পেছনে রেখে জমির একধারে দাঁড় সোজা করে ভালভাবে টান করে বেঁধে দেওয়া হয়। এরপর একই দূরত্বে যারা রোয়া করবে তারা দাঁড়িয়ে যায়। চারার আঁটিগুলি মাঠের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এবার যেখানে দাঁড়িয়েছে তার কাছাকাছি আঁটির কিছু চারা বাম হাতে রেখে ডান হাতে তিনটি আঙ্গুলের মধ্যে কয়টি চারা এক একটি গর্তে দিতে হবে (সাধারণতঃ ২-৩ টি) সেগুলির গোড়া হাতে নিতে হবে। তারপর ঐ চারাগুলি ৪ থেকে ৫ সেণ্টিমিটার গভীরে পোঁতা হয়। যদি বেশী গভীরে চলে যায় তাহলে পুরানো শিকড় কাজ করতে পারে না এবং নতুন শিকড় মাটির ঠিক উপরে যে পর্ব থাকবে সেখান থেকে বের হয়। একে বলে পর্ব শিকড়। এর ফলে গাছ তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারে না। অপরদিকে খুব কম গভীরে চারা রোয়া করলে যদি জোর বাতাস চারার উপর দিয়ে বয়ে যায় তাহলে উঠে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। একটি সারি রোয়ার পর পরের সারিতে চলে যায়। এইভাবে জমিটি একসময় শেষ হয়। রোয়ার পর অন্ততপক্ষে ৩-৪ দিন ৪-৫ সেণ্টিমিটারের মত জল জমিতে রাখার চেষ্টা করা উচিত। রোয়ার ১০ দিন পর যেসব গর্তে চারা মরে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় সেগুলি পুনরায় পূরণ করে দিতে হবে।

বীজ বোনা বা চারা রোয়ার সুবিধা ও অসুবিধা

বীজ বোনার সুবিধা

- বীজ বুনতে জনমজুরের খরচ কম লাগে
- চারা রোয়ার জন্য বীজতলা তৈরী, চারার পরিচর্যা, বীজতলা থেকে চারা তোলা ইত্যাদি কাজ এখানে নেই
- রোয়ার থেকে বোনা শস্য ৭ থেকে ১০ দিন আগে পাকে

বীজ বোনার অসুবিধা

- বীজ বোনার পর বীজ পাখী বা ইঁদুর খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যার ফলে মাঠে গাছের সংখ্যা কমে যায়
- বীজ ছিটিয়ে বোনার পর ধানের চারা ও আগাছা একসঙ্গে বাড়তে আরম্ভ করে। অনেক আগাছা ধানের চারার থেকে শক্ত হয় ও তাড়াতাড়ি বাড়ে। শস্যকে বাড়তে দেয় না। রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার করে আগাছা দমন আমাদের দেশে খুব একটা সহজসাধ্য কাজ হয়ে ওঠেনি। তাই বোনা ধানে আগাছা দমন খুব কষ্টসাধ্য হয়।
- যেহেতু ছিটিয়ে বোনা ধানের শিকড় মাটির উপরের স্তরে বেশী থাকে তাই গাছ সামান্য বাতাসে শুয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

চারা রোয়ার সুবিধা

- মাঠে গাছের সংখ্যা সঠিক মাত্রায় থাকে
- রোয়ার জন্য প্রধান জমির দশ ভাগের এক ভাগ বীজতলার প্রয়োজন হয়। এই অল্প জায়গায় চারা যতদিন থাকবে ততদিন তার পরিচর্যা করতে কম খরচ পড়ে। কিন্তু বীজ বোনা করলে বড় জায়গায় ঐ সময়ের জন্য চারা পরিচর্যা করতে তুলনামূলকভাবে খরচ বেশী পড়বে।
- রোয়ার সময় চারার বয়স আগাছা থেকে সচরাচর বেশি হয় তাই পরে চারার সঙ্গে আগাছা সমানে বাড়তে পারে না। তাছাড়া সারিতে ধান লাগানো হলে আগাছা দমন বা অন্যান্য পরির্যা অনেকটা সহজ হয়।
- চারা রোয়া করলে বীজ বোনা থেকে ফলন বেশী হয়।

চারা রোয়ার অসুবিধা

- বীজ বোনার তুলনায় চারা রোয়ার খরচ বেশী।
- বোনা থেকে রোয়ার ফসল ৭ থেকে ১০ দিন দেরীতে পাকে।

ধানের জাত, লাগানোর সময় ও মাটির উর্বরতা শক্তির সংগে চারা রোয়ার দূরত্বের সম্পর্ক

ধানের জাত ও বৈশিষ্ট্য	খরিফ মরসুম		বোরো মরসুম	
	কম উর্বর সেমি×সেমি	বেশী উর্বর সেমি×সেমি	কম উর্বর সেমি×সেমি	বেশী উর্বর সেমি×সেমি
বেঁটে গড়ন, সহজে শুয়ে পড়ে না, আলোক সংবেদনশীল জাত নয়	২৫×২৫ বা ২০×২৫	২০×২০	২০×১০ বা ১৫×১৫	২০×১৫
লম্বা, বেশীপাতার, বেশী পাশকাঠি যুক্ত, শুয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে, আলোক সংবেদনশীল জাত	২৫×২৫	৩০×২০	২০×১৫	২০×২০

উঁচু জমির ধান চাষ

উঁচু জমির অর্থ বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে করে থাকে তবে সাধারণভাবে বলা যায় সমতল বা ঢালু উভয় প্রকারের উঁচু জমি। বেশীর ভাগ জমিতে চাষাবাদ বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে সেচের সুবিধা থাকলে ব্যবহার করা হয়।

ভারতে প্রায় ১৬,৪৪৩ হাজার হেক্টার ও পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৬৫০ হাজার হেক্টারে এই ধরণের ধান চাষ হয়। ফলন অবশ্য বেশ কম হয়। এর বিশেষ কারণগুলি হল—

- গাছের বৃদ্ধির প্রয়োজনমত সময়ে বৃষ্টি হয় না।
- গাছের গ্রহণীয় অবস্থায় মাটির খাদ্যোপাদান সমানভাবে থাকে না।
- আগাছার উপদ্রব খুব বেশী হয়

- রোগের আক্রমণও অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী হয়
- এছাড়া ঐ প্রকৃতির জমিতে চাষের জন্য আবহাওয়া উপযোগী উপযুক্ত জাতের অভাব।

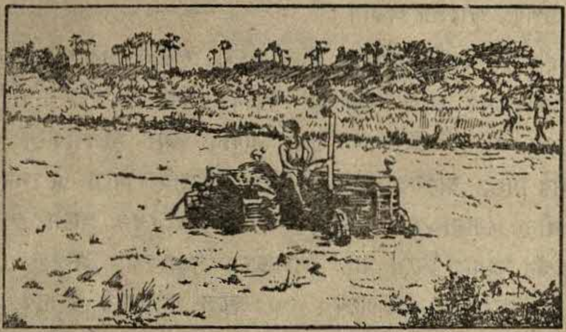
মৌসুমী বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে অথবা এক/দুই দিনের মধ্যে বৃষ্টি হবে এই অবস্থা দেখা দিলে এই ধরণের জমিতে বীজ ছিটিয়ে অথবা সারিতে বোনা হয়। উত্তরবঙ্গ তথা নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের দিকে অনেক সময় বৃষ্টি হয়। তাই দিয়ে এ সময়ে এসব জায়গায় বীজ বোনা হয়। এই বীজ বোনার বেশ আগে থেকে প্রাক মৌসুমী বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে মাটি ভালভাবে কয়েকবার লাঙ্গল দিয়ে কৃষক সাধারণতঃ জমি তৈরী করে রাখে। এর ফলে আগাছার উপদ্রব কিছুটা কম হয় এবং বৃষ্টির জল পাওয়ার সাথে সাথে সময় নষ্ট না করে বীজ বোনা যায়। জৈব সার সুপারিশ অনুযায়ী হেক্টার প্রতি ১০ টন বা যার যা সামর্থ্য তা দিয়ে জমি তৈরী করে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেশী ধান বুনে থাকে। জলের অনিশ্চয়তার জন্য অধিক ফলনশীল জাত অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করে না। দেশী ধানের জন্য সার বেশী ব্যবহার করা হয় না। তবে অধিক ফলনশীল ধান ব্যবহার করলে সুপারিশ অনুযায়ী সার দেওয়ার দরকার পড়ে।

বীজ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছিটিয়ে বোনা হয়। তখন হেক্টার প্রতি ৭৫ থেকে ৮৭ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। বীজ বোনা যন্ত্রের সুবিধা থাকলে এবং মাটির আর্দ্রতা যন্ত্র চালানোর উপযোগী হলে সারিতে বোনাটা ভাল হয়। বীজ বোনার সময় সন্তোষজনক আর্দ্রতা না থাকলে বীজ বোনার পর ভারী পাটাতন মই দিয়ে বীজ চেপে দিতে পারলে বীজের অঙ্কুরোদগম সহজ হয়। যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে বীজ বুনলে হেক্টার প্রতি ৬২-৭৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

নীচু জমির ধানের চাষ

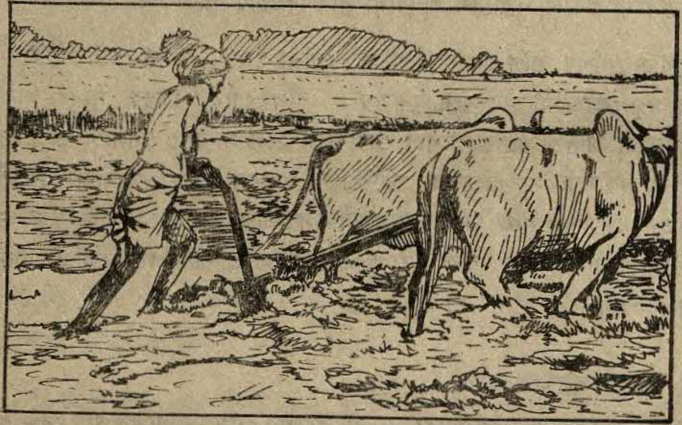
শুধু ভারতে কেন পশ্চিমবঙ্গেও এই ধরণের জমিতে ধানের চাষ বেশ হয়। নীচু প্রকৃতির জমিতে জল মোটামুটিভাবে ৫০ সেণ্টিমিটারের মধ্যে থাকে। ৫ থেকে ৮ সেণ্টিমিটারের মত জল জমতে থাকলে ৪ থেকে ৭ বার লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি লাঙ্গল দিয়ে জমিকে ভালভাবে কাদা (চিত্র ১৭, ১৮) করা হয়। এই জল হয় বৃষ্টির জন্য জমে অথবা সেচের সুবিধা থাকলে পেতে পারে। সেই হিসাবে বৃষ্টি সেবিত বা সেচ সেবিত ফসলের নাম দেওয়া হয়। চারা

রোয়া বা কলানো বীজ বোনার আগে জৈব বা অজৈব সার সুপারিশ অনুযায়ী শেষ চাষের আগে মাটির সংগে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা অন্য জায়গায়



চিত্র ১৭ : ট্রাকটার দিয়ে জমি কাদা করার পদ্ধতি

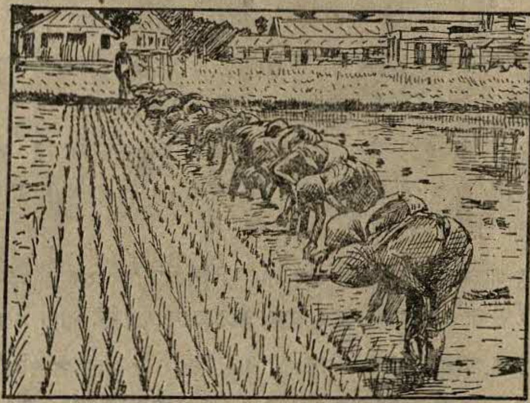
বীজতলা (পরের অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে) করে তৈরী করা হয়। পরে সেগুলিকে প্রধান জমিতে নিয়ে এসে সারিতে রোয়া (চিত্র ১৯) করা



চিত্র ১৮ : বলদ চালিত লাঙ্গল নিয়ে জমি কাদা করার পদ্ধতি

হয়। চারা রোয়া ছাড়া এসব জমিতে কোন কোন ক্ষেত্রে কাদানোর পর কলানো বীজও ছিটিয়ে অথবা সারিতে বোনা হয়। তবে এর ব্যবহার খুব সীমিত কারণ বৃষ্টির জল এত পরিমাণে বাড়তে থাকে যে বীজ পচে

যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। তাই বোরো চাষের সময় কিছুটা কার্যকরী হলেও আমন মরসুমে এর ব্যবহার সম্ভব হয় না। বৃষ্টি নির্ভর হলেও চারা রোয়া (চিত্র ১৯) অনেক সময় জুলাই মাসের শেষেও এসে যায়।



চিত্র ১৯ : চারা রোয়ার পদ্ধতি

জমিতে বীজ ছিটানোর থেকে কাদা জমিতে চারা রোয়ার কতকগুলি সুবিধা রয়েছে, যেমন—

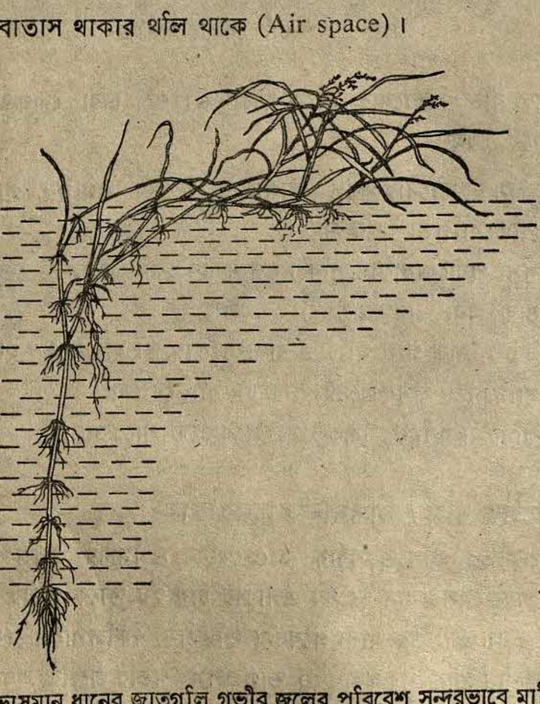
- জমি কাদানোর ফলে আগাছার উপদ্রব কম হয়, গাছের সংগে প্রতিযোগিতা থাকে না
- শস্য পর্যায়ে চাষের সুবিধা হয় কারণ কোন ফসল উঠতে দেরী হলে চারা অন্য জায়গায় তৈরী করা যায়
- যত সংখ্যক গাছ মাটিতে রাখা দরকার তা রাখা সম্ভব হয়
- আয়রণ ও ফসফরাসের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়
- কাদানো জমিতে শিকড় সহজে বাড়তে পারে না।

গভীর জলের ধান / ভাসমান ধানের চাষ

নীচু প্রকৃতির জমিতে বর্ষায় ১.৫ থেকে ৪ মিটার পর্যন্ত জল জমতে দেখা যায় এবং যেসব ধান ঐ সব এলাকায় চাষ হয় তাকে গভীর জলের ধান বলা হয়। আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ফিলিপাইন (১৯৬৯) এর হিসাবে এশিয়ায় প্রায় শতকরা ২০ ভাগ জমি গভীর জলের কবলে। এর-

মধ্যে আবার ভারতে সব থেকে বেশী জায়গা জুড়ে রয়েছে, প্রায় ২·৩ মিলিয়ন হেক্টার। ভারতে প্রধানতঃ আসাম, বিহার, মণিপুর, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, উত্তর-প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে গভীর জলের জায়গা বেশী দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে ঐ ধরণের নীচু জমি প্রায় ২০,০০ হেক্টারের মত (মুখার্জী, ১৯৭৫)। এছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ু প্রভৃতি কিছু কিছু জায়গাতে গভীর জলের জায়গা রয়েছে। এইসব ধানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (চিত্র ২০) অন্যান্য ধানের থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির হয়। যেমন—

- বেশী জলে বাড়তে পারে অর্থাৎ জলের গভীরতা বাড়ার সংগে সংগে গাছও বাড়তে পারে। অনেক সময় দিনে ২৫ থেকে ৩০ সেণ্টিমিটারের মত লম্বা হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই
- গোড়ায় গুচ্ছমূল ছাড়াও বিভিন্ন গাঁটেও শিকড় বের হয়। এই শিকড়গুলি গাছকে ভাসতে সাহায্য করে এবং প্রয়োজনে গাছের খাদ্য সংগ্রহ করে।
- গাঁট থেকে পাশকাঠি বার হতে পারে। ৪/৫টি মূল পাশকাঠি ছাড়াও উপরের দিকে ৪/৫টির মত গাঁটের থেকে পাশকাঠি বের হয়।
- কাণ্ডে বাতাস থাকার থলি থাকে (Air space)।



চিত্র ২০ : ভাসমান ধানের জাতগুলি গভীর জলের পরিবেশ সুন্দরভাবে মানিয়ে নেয়

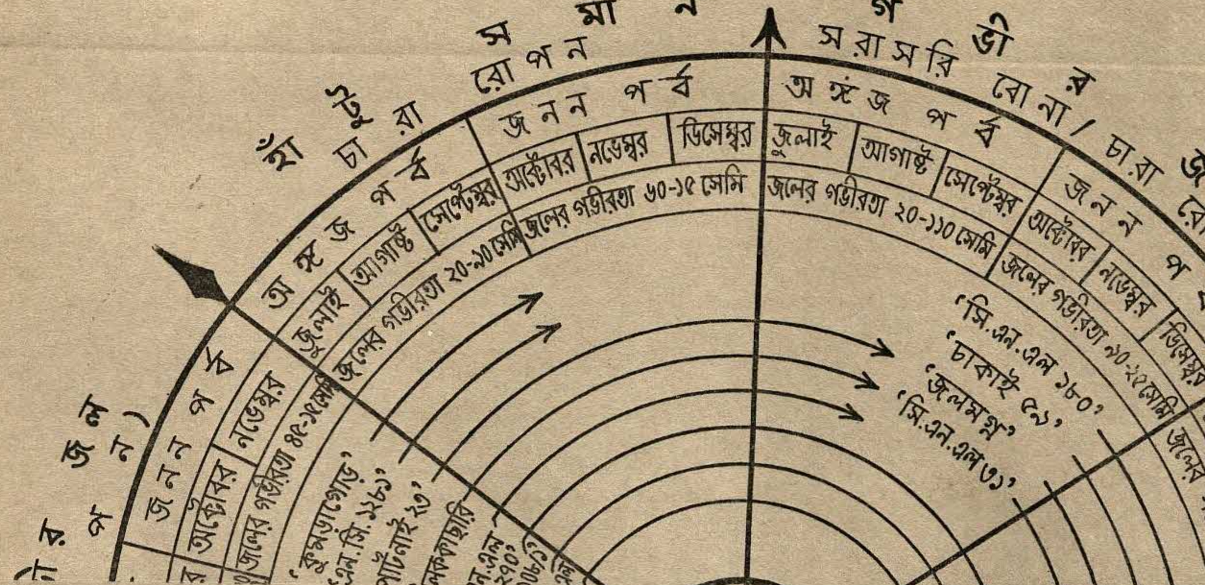
- এই ধরণের বীজের সুপ্তকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়। অনেক সময় জলে ধান ডুবে থাকা অবস্থাতেও বীজ পাকে। সে ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী সুপ্ত কাল থাকলে বীজের অঙ্কুর হয় না।

প্রকৃতিগত পার্থক্য যেমন রয়েছে তেমনি শস্যপরিচর্যা গত পদ্ধতির মধ্যেও কিছু কিছু জায়গায় পার্থক্য রয়েছে (চিত্র ২১) তা আলোচনা করা গেল।

- উঁচু জমিতে চাষের জন্য যে ধরণের জমি প্রস্তুতি, জৈবসার প্রয়োগ, হাড়ের গুঁড়ো, বীজবোনা, বীজের পরিমাণ (হেক্টার প্রতি ৮০ থেকে ১৩০ কেজি) দেওয়ার সুপারিশ করা হয় একইভাবে মার্চ/এপ্রিল মাসে বোনার জন্য এ ধানের চাষেও করা হয়ে থাকে। কারণ পরে ক্রমান্বয়ে জল বাড়তে থাকলে চারা রাখা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই বীজ বোনাটা বেশী প্রচলিত।
- আগাছার উপদ্রব প্রথম অবস্থাতে খুব বেশী হয়ে থাকে। তাই লোহা অথবা বাঁশের দাঁতের তৈরী বিদা চালিয়ে কিছুটা আগাছার উপদ্রব জমিতে দমিয়ে রাখতে হয়। কারণ পরে জল বাড়লে আগাছার উপদ্রব কিছুটা কমে আসে। এছাড়া অন্যান্য ধানের জন্য যেভাবে আগাছা ও রোগ-পোকা দমনের সুপারিশ করা হয়েছে এক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে।
- সার, প্রয়োগ বিশেষ করে চাপান সার দেওয়াটা একটা সমস্যাই বলা যায়। জলের গভীরতা এত বেশী হয় যে সার ছিটিয়ে দিলে কোন লাভ হয় না।
- নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস নাগাদ ধান কাটার সময় হয়। জল বেশী থাকলে কেবল শীষ কেটে নেওয়া হয়। তা নাহলে গোড়ায় অনেকটা খড় রেখে শীষের দিকটা কেটে নিতে হয়। ধান কাটা ও বয়ে আনা অনেক সময় নৌকার দ্বারা করতে হয়।

গভীর জলে ধান চাষ / ভাসমান ধান চাষের সমস্যা

- শুকনো জমিতে বীজ ছিটিয়ে বোনার জন্য অনেক সময় বীজের অঙ্কুরোদগম কম হয় এছাড়া খরার জন্য চারা অনেক মরে যায়
- চারা অবস্থায় আগাছার উপদ্রব খুব বেশী হয়
- মাঠে গাছের সংখ্যা কমে যায়
- হঠাৎ জল বেড়ে গেলে বা বন্যার ফলে পুনরায় অনেক চারা মারা যায়
- গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে জলে ডুবে যেতে পারে
- গাছ শুয়ে পড়ার প্রবণতা বেশী থাকে


সমান গভীর
চারা রোপন
জনন পর্ব
অঙ্গজ পর্ব
সরাসরি বোনা / চারা রো
জুলাই
আগাষ্ট
সেপ্টেম্বর
অক্টোবর
নভেম্বর
ডিসেম্বর
জলের গভীরতা ২০-৯০ সেমি
জলের গভীরতা ৬০-১৫ সেমি
জলের গভীরতা ২০-১১০ সেমি
জলের গভীরতা ৯০-২৫ সেমি
জলের গভীরতা ৪৫-১৫ সেমি
'সি.এন.এল ১৮০'
'চাকাই ৫৬',
'জলমগ্ন'
'সি.এন.এল ৩১',
'কুমড়াগোড়'
'এন.সি. ১২৮১'
'পাটনাই ২৩'

অধ্যায় আট

বীজ তলায় চারা তৈরী

(The Seedling Ralsing in Seedbed)

অধ্যায় আট

বীজ তলায় চারা তৈরী

সতেজ ও সবল চারা রোয়ার জন্য সব সময় প্রয়োজন। এ ধরণের চারা পেতে হলে বীজতলা বিশেষ যত্ন নিয়ে তৈরী করতে হবে। বীজতলা শুকনো অথবা ভেজা উভয় প্রকার হতে পারে। বীজতলার মাটি যথেষ্ট উর্বর হবে অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার যোগান দিতে হবে। বীজের মধ্যে যে খাবার থাকে তা দিয়ে চারা ১০-১২ দিন পর্য্যন্ত চালিয়ে নিতে পারে তারপর মাটি থেকে খাবার নেওয়ার দরকার হয়। তাই বীজতলায় উপযুক্ত পরিমাণে জল, প্রয়োজনমত তাপমাত্রা এবং অক্সিজেনের বন্দোবস্ত রাখা প্রয়োজন। দেখা গেছে অক্সিজেনের ঘনত্ব শতকরা ০·৩ ভাগ, সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১১° ও ৩৮° সেলসিয়াসের মধ্যে ও প্রতি সেন্টিমিটারে ইলেকট্রিকেল কনডাকটিভিটি ৪·৫ মিলিমোজ থাকলে বীজের অঙ্কুরোদগম ভালভাবে হতে পারে।

শুকনো বীজতলা (Dry seed bed)

ভেজা বীজতলা করতে গেলে যতটুকু জলের দরকার তার অভাব দেখা দিলে অথবা যেখানে পুরোপুরি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করতে হয় সেখানে শুকনো বীজতলা তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শুকনো বীজতলা তৈরীর পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

- আগের ফসল কাটার পর থেকে মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রথম বৃষ্টি হওয়া পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে জমিতে বার বার লাঙ্গল দিয়ে মাটি ঝুরো ঝুরো করে নিতে হয়। এর ফলে অনেক আগাছা মরে যায়।

- শেষ চাষের আগে (কমপক্ষে বীজ বোনার ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ আগে) কমপোষ্ট সার হেক্টার প্রতি ১৫ থেকে ২০ টন হারে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়।
- এক হেক্টার জমি রোয়ার জন্য ৮০০ থেকে ১০০০ বর্গমিটার বীজতলার দরকার হয় এবং ঐ এলাকার জন্য বীজ লাগে প্রায় ৪৫ থেকে ৬০ কেজি। সরু ধান হলে ৪৫ কেজি, মাঝারি প্রকৃতির হলে ৫২ কেজি এবং মোটা ধান হলে ৬০ কেজি লাগবে।
- বীজ বোনার আগে সাধারণ জমিতে প্রতি বর্গমিটারের জন্য ২০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ২০ গ্রাম ফসফেট ও ২০ গ্রাম পটাস প্রয়োগ করার দরকার হয়। পর্যাপ্ত মাত্রায় গোবর সার ব্যবহার করলে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ কিছুটা কম করা যেতে পারে।

বৃষ্টির উপর নির্ভর করে শুকনো বীজতলা তৈরী করলে প্রাথমিক মাত্রায় নাইট্রোজেন না দিয়ে, চারা তোলার ৭-১০ দিন আগে, জমিতে রস থাকলে প্রয়োজন বোধে প্রতি বর্গমিটারে ২০ গ্রাম নাইট্রোজেন চাপান হিসাবে দিতে হবে।

- বীজতলার চওড়া ১'২০ মিটার ও লম্বা প্রয়োজনমত ছোট বড় হয়। এ ছাড়া ৩০ সেন্টিমিটার চওড়া নালা বীজতলার চারিদিকে জল নিকাশীর জন্য রাখা হয়।
- বীজতলায় বীজ ফেলার আগে প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ৩ গ্রাম শুকনো গুঁড়ো ইথাইল মার্রকিউরিক ক্লোরাইড (বাজারে প্রচলিত নাম এগ্রোসান জি-এন, মোনোসান) বা ফিনাইল মার্রকিউরিক অ্যাসিটেট (সেরেসান পাউডার) মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে।
- বৃষ্টির পর অথবা বৃষ্টি হতে পারে এ ধরণের আবহাওয়া দেখে বীজ বুনতে হবে। বীজ বোনার পর হালকা ভাবে মই দিয়ে বীজ ঢেকে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। তা নাহলে পাখী খেয়ে নিতে পারে।
- চারার বয়স ১০ দিন হলে প্রতি লিটার জলে ½ মিলিলিটার ফসফোমিডন ১০০% বা এক মিলিলিটার ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি স্প্রে করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদী আমন ধানের বীজতলায় প্রথম স্প্রে করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদী আমন ধানের বীজতলায় প্রথম স্প্রের ২০ দিন

পর দ্বিতীয়বার একই মাত্রায় ফসফোমিডন স্প্রে করতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকাতে শস্য রক্ষার জন্য যে সুপারিশ করা হয় তা মেনে চলতে হবে।

- জাতগত প্রভেদ থাকলেও মোটামুটিভাবে বীজ বোনার ২১ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে অথবা চারায় ৫-৬ পাতা হলে বীজতলার চারা রোয়ার জন্য তৈরী হয়ে যায়। চারা রোয়ার আগে বীজতলা ভিজিয়ে নিলে চারা তোলা সহজ হয়।

শুকনো বীজতলা তৈরীর সুবিধা

- কম জল ব্যবহার করে চারা পাওয়া যায়
- ভেজা বীজতলার থেকে সহজে তৈরী করা যায়
- চারা বেশ শক্ত হয় তাই সহজে মাটিতে লেগে যায়
- এই ধরণের বীজতলা থেকে যে চারা পাওয়া যায় তার থেকে পাশকাঠি তাড়াতাড়ি বের হতে সাহায্যে করে।

শুকনো বীজতলার অসুবিধা

- বীজতলা তৈরী করতে অনেক সময় লাগে
- সব রকম মাটিতে এই ধরণের বীজতলা ভাল হয় না। বিশেষ করে অনুর্ব্বর, শক্ত অথবা কোন দোষ যুক্ত মাটিতে
- মাটিতে নোনা ধরলে চারা নষ্ট হয়ে যায়
- বেশী পরিমাণ বীজের প্রয়োজন হয় কারণ অনেক বীজের অঙ্কুর নষ্ট হয়।

ভেজা বা সিক্ত বীজতলা

এই ধরণের বীজতলা যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের বন্দোবস্ত রয়েছে সেখানে সাধারণতঃ করা হয়ে থাকে। চারা রোয়ার ২১ থেকে ৩৫ দিন আগে সাধারণভাবে বীজতলা তৈরী করা হয়। ভেজা বীজতলায় যেভাবে চারা তৈরী করা হয় তা নিম্নরূপ ঃ

- বীজতলার জন্য এমন জায়গা বেছে নিতে হবে যেখানে সেচ এবং জল নিকাশীর উভয়েরই ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া মাটি উর্বর হবে, কোন রকম লবণের পরিমাণ বেশী থাকবে না বা মাটি কোন দোষযুক্ত হবে না।

- মাটি ভাল কাদানো না হওয়া পর্য্যন্ত বার বার লাঙ্গল দেওয়া প্রয়োজন।
- এক একটি বীজতলার পরিমাপ হবে ১.২০ মিটার চওড়া ও প্রয়োজন মত লম্বা, ৩০ থেকে ৪০ সেন্টিমিটারের মত চওড়া ও ১০ সেন্টিমিটার গভীর জলনিকাশী নালা চারিদিকে রাখা হয়। (চিত্র ২২)
- বীজতলার উপরে একটু ঢেকে থাকার মত জল থাকে। জল বেশী থাকলে বের করে দেওয়ার দরকার অথবা কম থাকলে ঢোকানোর প্রয়োজন। বীজতলার মাঝখানটা একটু উঁচু রেখে উভয় দিকে হালকা ঢালু করে দেওয়া হয়
- কাদানো বীজতলার বীজ শোধনের জন্য প্রতি ১.৫ লিটার জলে ১.৫ গ্রাম মিথোক্সিমারকিউরিক ক্লোরাইড (ট্যাফাসন-৬, এরিটন-৬, এমিসান-৬ বা অ্যাগালল-৩) বা ফিনাইল মারকিউরিক এ্যাসিটেট (সেরেসান পাউডার) মিশিয়ে তাতে এক কেজি বীজ ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখতে হবে। যদি জলের তাপমাত্রা ২৭° সেণ্টিগ্রেড হয় তাহলে ২৪ ঘণ্টা ধরে বীজ জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে কিন্তু যদি তাপমাত্রা ২২° সেণ্টিগ্রেড হয় তাহলে ২ থেকে ৩ দিন পর্য্যন্তও ডুবিয়ে রাখার প্রয়োজন দেখা যায়।



চিত্র ২২ঃ সিক্ত বা ভেজা বীজতলা

- এর পর বীজগুলি ভিজে চটের উপর ২৫ সেন্টিমিটারের মত পুরু করে মেলে ভিজে চট দিয়ে ঢেকে ৩৬ থেকে ৪৮ ঘন্টা ছায়ায় রেখে কল গজিয়ে বীজতলায় বীজ ফেলতে হবে। শীতকালে বেশী সময় ধরে জাগ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কোন সময় বীজ যাতে শুকনো না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
- মাটি কম উর্বর হলে প্রতি বর্গমিটার বীজতলায় গোবর বা কমপোষ্ট ১০ কেজি, ২০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ২০ গ্রাম ফসফেট ও ২০ গ্রাম পটাস বীজ বোনার আগে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার দরকার হয়।



চিত্র ২৩ঃ সিক্ত বীজতলার পরিচর্যা

- এবার ৩ থেকে ৪ মুঠো অঙ্কুরিত বীজ (প্রায় ৭০ গ্রামের মত) প্রতি বর্গমিটার বীজতলায় সমানভাবে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। থামরুল পদ্ধতিতে (Thumb rule method) বীজের হার ঠিক করতে হলে নিম্নলিখিত সূত্রটি ব্যবহার করার দরকার হয়।

$$\text{বীজের হার (হেক্টার প্রতি কেজিতে)} = \frac{\text{১০০০ বীজের ওজন (গ্রামে)} \times ৪}{৩}$$

তবে সাধারণভাবে সরু ধান হলে ৪৫ কেজি, মাঝারি সরু ধান হলে ৫২ কেজি ও মোটা ধান হলে ৬০ কেজি বীজের দরকার হয়। যদি খুব ঘন করে বীজ বোনা হয় তাহলে ঘনভাবে চারা উঠলে চারা তুলতে অসুবিধা হয় ও চারা ছোট ও সরু হয়। তাই খুব ঘন বীজ বোনা উচিত না।

- বীজ বোনার পর এক সপ্তাহকাল বীজতলার মাটি ভেজা ভেজা করে রাখতে হয়। তার বেশী হলে চারা নষ্ট হতে পারে। এক সপ্তাহের পর ধীরে ধীরে ৫ সেণ্টিমিটারের মত জল বাড়ানো যেতে পারে অবশ্য জল বাড়ানোর গতি চারার বেড়ে উঠার উপর নির্ভর করে থাকে (চিত্র ২৩)।
- চারার বয়স ১০ দিন হলে দানাদার ঔষধ, প্রতি বর্গমিটার বীজতলার জন্য ৫ গ্রাম ফোরেট ১০ জি বা ১৫ গ্রাম কার্বোফুরান ৩ জি ব্যবহার করার দরকার হয়। ওষুধ শুকনো ছড়াতে হবে এবং ব্যবহারের সময় বীজতলায় ২˙৫-৫ সেণ্টিমিটার জল ৫-৭ দিন ধরে রাখতে হবে। যেখানে বীজতলায় জল দাঁড় করানো সম্ভব নয় সেখানে প্রতি লিটার জলে ১˙৫ মিলি লিটার ফসফোমিডন ১০০% বা ১ মিলিলিটার ক্লোরপাইরিফস ২০ ই. সি. স্প্রে করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদী আমন ধানের বীজতলায় প্রথম স্প্রের ২০ দিন পরে দ্বিতীয়বার একই মাত্রায় ফসফোমিডন স্প্রে করতে হবে।

এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় যে ধরনের ঔষধ সুপারিশ করা হয়েছে তা মেনে চলতে হবে।

ভেজা বীজতলার সুবিধা

- কম বীজ লাগে
- মোটামুটিভাবে সব ধরনের মাটিতে হতে পারে
- চারা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে
- সামান্য নোনা লাগাও সহ্য করতে পারে

ভেজা বীজতলার অসুবিধা

- খুব বেশী জলের প্রয়োজন হয়
- বীজ বোনার পর যদি খুব ভারী বৃষ্টি হয় তাহলে বীজতলার বীজ ধুয়ে একধারে চলে যেতে পারে
- বীজতলা তৈরী, পরিচর্যা করা এবং চারা তোলা ইত্যাদি কাজ বেশ কষ্টকর হয়ে থাকে
- চারা খুব বেশী লম্বা হয় না, তাড়াতাড়ি পাশকাঠি ছাড়ার প্রবণতা বেশী থাকে।
- বেশী জায়গার প্রয়োজন হয়ে থাকে
- কখনো খরা হলে বীজতলার চারা তা সহ্য করতে পারে না।

বীজতলা থেকে চারা তোলা (Uprooting of seeding from seedbad)

২০ থেকে ২৫ দিন পর রোয়ার জন্য বীজতলায় চারা তৈরী হয়ে যায় (চিত্র ২৪)। যেগুলি ১৩০ দিন বা তারও বেশী দিন স্থায়ীজাত সেগুলির চারা ৩০ থেকে ৪০ দিন পরে তুললেও সমান ফলাফল পাওয়া যায়। ৩০ দিনের বেশী বয়সের চারা রোয়া করলে কম বয়সের চারার তুলনায় দেরীতে



চিত্র ২৪—বীজতলা থেকে চারা তোলার পদ্ধতি

সেরে ওঠে। বিশেষ করে চারা তুলতে গিয়ে যদি কাণ্ড বা শিকড়ের কিছুটা ক্ষতি হয় তাহলে সারতে আরো বেশী সময় লাগে। ২০ দিনের কম বয়সের চারা তুলতে কিছুটা অসুবিধা দেখা দেয়। যদি চারা তোলার সময় (চিত্র ২৪) বেশী মাটি চারার শিকড়ে লেগে থাকে তাহলে ঝাঁকিয়ে মাটি ধুয়ে ফেলতে হয়। অনেক সময় নাবি জাতের বীজ হলে ৬০ থেকে ৭০ দিনের চারা রোয়াতে আশাপ্রদ ফল দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে অনেক জায়গায় ২০ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার গভীর জলে রোয়া করতে হয় সেখানে একই চারা থেকে দ্বিতীয়বার রোয়াও করতে দেখা যায়। এছাড়া তাপমাত্রা কম থাকলে বয়স্ক চারা রোয়া করার প্রয়োজন দেখা যায়। সেখানে ফলন খারাপ হয় না।

দেপক (Dapog) পদ্ধতিতে চারা তৈরী

দেপক পদ্ধতিতে চারা তৈরী ফিলিপাইনে বেশ সন্তোষজনক ভাবে হয়ে থাকে। ভারতে এই পদ্ধতির প্রবর্তন ফিলিপাইন থেকেই। এই ধরণের

বীজতলাকে অস্থায়ী বীজতলা বলা যেতে পারে। অন্ধ্রপ্রদেশের কোন কোন জায়গার কৃষক এই পদ্ধতিতে চারা তৈরী করে ব্যবহার করছে। চারা তৈরী হতে প্রায় দুই সপ্তাহের মত সময় নেয়। অন্য পদ্ধতিতে যেখানে এক হেক্টার জমি রোয়া করতে ১০০০ বর্গমিটার বীজতলার প্রয়োজন হয়ে থাকে সেখানে দেপক পদ্ধতিতে মাত্র ৪০ বর্গমিটার বীজতলায় ৪৫ থেকে ৬৫ কেজি বীজ বোনা যায় ও সমান কাজ হয়। দেপক পদ্ধতিতে চারা তৈরী নিম্নলিখিত উপায়ে হয়ে থাকে।

- ভেজা বীজতলার জন্য যেভাবে জমি তৈরী করার কথা বলা হয়েছে একই ভাবে এখানেও জমি তৈরী করার প্রয়োজন। যদি তৈরীর এরূপ সুযোগ না থাকে তাহলে যেকোন পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে করা যায়।
- এবার বীজতলার এক-একটি অংশকে কলাপাতা (মাঝের শিরা বাদে), খালি সিমেণ্ট বস্তা বা পলিথিনের চাদর দিয়ে মুড়ে দিতে হয়। ঢেকে দেওয়ার কারণ হলো যাতে চারার শিকড় মাটির সংগে মিশতে না পারে। সারের সাধারণতঃ প্রয়োজন হয় না কারণ চারা যতদিন ঐখানে থাকবে ততদিনের খাদ্য বীজের মধ্যেই থাকে। সিমেণ্টের মেঝেতে করা হলে খুব ঘন ঘন জল দিতে হয়।
- প্রতি বর্গমিটারে ৩ কেজি হারে বীজ সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হয়। অংকুরিত বীজের উপর মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে দিতে হয় এবং মাঝে মাঝে হাত দিয়ে অথবা হালকা কাঠের তক্তা দিয়ে প্রতিদিন সকালে ও বিকালে চেপে দিতে হয়। এইভাবে জল দেওয়া ও পরে চেপে দেওয়া ৩ থেকে ৬ দিন ধরে করতে হয়। এর ফলে শিকড়গুলি উপরের দিকে উঠে আসতে পারে না। চেপে দেওয়ার ফলে বীজগুলি একটির সংগে অপরটি জুড়ে থাকে।
- যে কোন জাতের বীজ হোক না কেন রোয়ার জন্য চারা এই পদ্ধতিতে ৯—১৪ দিনের মধ্যে তৈরী হয়ে যায়।
- দেপক বীজতলায় তৈরী চারা রোয়ার জন্য বীজতলায় বসে বসে তোলার প্রয়োজন হয় না। মাদুর যেমন গোল করে জড়িয়ে রাখা হয় তেমনি চারাগুলিকে গোল করে গুটিয়ে নিয়ে যেখানে রোয়া হবে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একটি চারা অপর চারা থেকে আলাদা করার পর রোয়া হয়।

দেপক বীজতলা তৈরীর সুবিধা

- বীজতলায় চারা কর্মদিন থাকে
- বীজতলার জন্য জায়গা কম লাগে
- যেকোন জায়গায় এ ধরণের বীজতলা তৈরী করা সম্ভব
- চারার শিকড় বা কাণ্ডে আঘাত প্রায় লাগেই না
- চারা তোলার জন্য বীজতলায় বসে থাকার প্রয়োজন হয় না
- বীজতলার বীজ বৃষ্টির জলে ধূয়ে যায় না ।

দেপক বীজতলায় চারা তৈরীর অসুবিধা

- বীজ বেশী লাগে
- চারা বেশ সরু ও ছোট হয় কারণ বয়স মাত্র দু'সপ্তাহ হয় । লম্বায় মাত্র ৮ থেকে ১০ সেন্টিমিটারের মত হয় । আমাদের দেশের অবস্থাতে বিশেষ করে খরিফ মরসুমে জমিতে জল বেশী থাকে তাই এই পদ্ধতিতে যে চারা পাওয়া যায় তা দিয়ে রোয়া প্রায় অসম্ভবই বলা যায় । এই ভাবে তৈরী চারা দিয়ে বোরো মরসুমে রোয়া কিছুটা সম্ভব বলা যেতে পারে । এছাড়া কোন কারণে দু'সপ্তাহের বেশী যদি চারা বীজতলায় রাখার প্রয়োজন হয় তাহলে চারা না খেতে পেয়ে মারা যাবে । কারণ শিকড় মাটির মধ্যে যেতে পারে না । রোয়ার সময় প্রতি গর্তে নির্ধারিত সংখ্যক চারা রাখা অসুবিধা দেখা যায় ।

অধ্যায় নয়

পুষ্টিসাধন ও সার প্রয়োগ

(Plant Nutrition and Fertilizer Application)

অধ্যায় নয়

পুষ্টিসাধন ও সারপ্রয়োগ

সূচনা

ষাটের দশকের আগে ধান চাষে খুব কম সার ব্যবহার করা হত, কারণ দেশী ধানের জাতগুলোতে সার ব্যবহার করলেও সঠিক পরিচর্যার অভাবে সব সময় সার ব্যবহারের সুফল পাওয়া যেত না। কিন্তু ঐ দশকের মাঝামাঝি অধিক ফলনশীল ধানের চাষ শুরু হওয়ায় কৃষকের কাছে এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল এবং সত্তরের দশকে একথা সুপ্রমাণিত হল যে অধিক ফলনশীল ধান চাষে সবচেয়ে বেশী ফলন পেতে হলে সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি জেনে সুষম সার জমিতে ব্যবহার করতেই হবে। তবে এর আগে অর্থাৎ অধিক ফলনশীল জাতের ধান আবিষ্কৃত হওয়ার আগে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে সাধারণ দেশী বা উন্নতমানের দেশী ধান চাষে অণুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সঠিক পরিচর্যার সংগে সার ব্যবহার করলে উৎপাদন নিশ্চয়ই বাড়ে। অনেক সময় দেখা গেছে যে ধানে সার ব্যবহারে সুফল কিছুটা অনিয়মিত ভাবে পাওয়া যাচ্ছে। এর সঙ্গত কারণও রয়েছে— যথাযথ মাত্রায় সার ব্যবহারের কয়েকটা নিয়ম আমাদের মেনে চলা দরকার, যেমন সঠিক সার এবং পরিমাণ নির্বাচন, ঠিক সময়ে এবং ঠিকভাবে তার প্রয়োগ ও শস্যের বিভিন্ন পর্যায়ে দেয় সারের মাত্রাকে যথাযথভাবে ভাগ করে ব্যবহার। গাছে সার প্রয়োগ করার আগে গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে তার পুষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হবে। এছাড়া যে খাদ্যোপাদানটি গাছ গ্রহণ করবে তা উৎপাদনে কতখানি লাগছে তাও জানতে হবে।

গাছের পুষ্টিসাধন

গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান সরবরাহও গ্রহণকে গাছের পুষ্টি বলে। শস্যের খাদ্যোপাদান হল সেই ধরণের উপাদান যেগুলি গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্বে প্রয়োজন হয় এবং গাছের স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়ার ফলে তৈরী হয় না।

ধানের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান

ধানের জন্য ১৭টি খাদ্যোপাদানের প্রয়োজন হয়। যেমন কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, জিঙ্ক, আয়রণ, কপার, মলিবডেনাম, বোরন, ম্যাঙ্গানিজ, ক্লোরিন ও সিলিকন। এগুলিকে প্রয়োজন ভিত্তিতে পুনরায় দুভাগে ভাগ ভাগ করা যায় যেমন—

- প্রধান খাদ্যোপাদান—কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও সালফার—আনুপাতিক হারে এগুলি বেশী পরিমাণে প্রয়োজন হয়।
- অপর ভাগটি হল অণুখাদ্য বা কম পরিমাণে প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান যেমন আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, কপার, জিঙ্ক, মলিবডেনাম, বোরন, ক্লোরিন ও সিলিকন ইত্যাদি।

প্রত্যেক প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদানগুলি একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় এবং গাছের ব্যবহার উপযোগী অবস্থায় থাকা উচিত। নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম সাধারণভাবে কৃষক ব্যবহার করে থাকে। সালফার এমনিতে ব্যবহার হয় না তবে সুপার ফসফেট প্রয়োগ করলে স্বাভাবিকভাবে কিছুটা সরবরাহ হয়। বাদবাকি খাদ্যোপাদান গাছে অভাবের লক্ষণ প্রকাশ পেলে সাধারণতঃ ব্যবহার হয়।

অন্য সকল প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদানগুলি হয় বাতাস, জল, মাটি অথবা পুরনো গাছ বা যে সার প্রয়োগ করা হয় তার সংগে মিশে আসে।

কোন বিশেষ উপাদান গাছের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কিনা তা দুরকম উপায়ে বোঝা যায়

- এক-একটি খাদ্যোপাদান জলে মিশিয়ে সেই দ্রবণে গাছ লাগালে গাছে যদি কোন অস্বাভাবিকত্ব দেখা যায় এবং
- ঐ বিশেষ উপাদানটি প্রয়োগ করলে গাছের লক্ষণাবলী যদি স্বাভাবিক হয় অথবা কিছুটা কমে যায় তাহলে ঐ উপাদানটি প্রয়োজনীয় বলে ধরে নিতে হবে।

খাদ্যোপাদানের অভাব বা আধিক্যজনিত লক্ষণাবলী

কোন বিশেষ উপাদানের অভাব দেখা দিলে ধান গাছের পাতা, কাণ্ড বা শিকড়ের রঙ, গাছের উচ্চতা, পাশকাঠির প্রকৃতি বা শিকড়ের বৃদ্ধি দেখে সাধারণতঃ বুঝতে হবে।

গাছের উচ্চতা হয় স্বাভাবিক হবে অথবা বেঁটে খাটো প্রকৃতির হবে, পাশকাঠির সংখ্যা হয় স্বাভাবিক আর তা নাহলে হয় কমবে বা বাড়বে। এছাড়া পাতাতে যে সব লক্ষণ দেখা যাবে তা নিম্নরূপ

- হলদেটে অথবা গাঢ় সবুজ রঙের হবে
- শিরাতে কালো রঙের পচা দাগ থাকতে পারে অথবা থাকবে না
- পাতার উপরে অথবা নীচে বাদামী রঙের দাগ দেখা যেতে পারে অথবা থাকবে না।
- পাতার ডগায় অথবা ধারে বাদামী রঙের দাগ ক্রমান্বয়ে বড় হবে অথবা কমবে।

এই সব লক্ষণাবলী সাধারণতঃ গাছের বৃদ্ধির প্রাথমিক অবস্থাতে অর্থাৎ চারা রোয়ার ২-৩ সপ্তাহ বা ১-২ মাসের মধ্যে দেখে চিনতে হবে।

অনেক সময় কিছু কিছু রোগের লক্ষণের সংগে এই প্রকার খাদ্যোপাদানের অভাব বা আধিক্য জনিত অস্বাভাবিকত্বের পার্থক্য ধরতে গণ্ডগোল হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দস্তার অভাব জনিত লক্ষণাবলী ও কুটে রোগের লক্ষণ আলাদা করা খুব সহজ হয় না।

বিভিন্ন খাদ্যোপাদানের কাজ ও এগুলির অভাবজনিত লক্ষণাবলী

নাইট্রোজেনের কাজ—

পাশকাঠি বেরুবার সময় ধান গাছে নাইট্রোজেন বেশী পরিমাণে প্রয়োজন। নাইট্রোজেন শীষ হওয়ার প্রারম্ভে যদি দেওয়া যায় তাহলে শীষে ফুলের সংখ্যা বেশী হয়। পুষ্টি পর্বেও ধান বেশ কিছু নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। নাইট্রোজেনের কাজ নিম্নরূপ—

- গাছে পত্র হরিতের অঙ্গ (chlorophyll) হিসাবে গাছের রঙ গাঢ় সবুজ হয়
- তাড়াতাড়ি গাছের বড় হতে সাহায্য করে অথবা গাছের উচ্চতা বা পাশকাঠি বাড়ায়

- গাছের পাতা ও দানার আকৃতি বাড়াতে সাহায্য করে
- শীষে দানার সংখ্যা বাড়ায়
- শীষে পুষ্ট দানার সংখ্যাও বাড়াতে সাহায্য করে
- দানায় প্রোটিনের পরিমাণ বাড়াতে চেষ্টা করে

নাইট্রোজেনের অভাবজনিত লক্ষণাবলী

- গাছের বৃদ্ধি কমে যায় এবং সেই সংগে পাশকাঠির সংখ্যাও কমতে থাকে।
- পাতা সরু ও ছোট হয়। খাড়া হয়ে থাকে ও হলদেটে সবুজ রঙের হয়। তবে নতুন পাতার রঙ সবুজ থাকে।
- পুরানো পাতার রঙ হালকা খড়ের মত হয় ও পাতা পরে মরে যায়।

ফসফরাসের কাজ

- ধান গাছে যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলতে থাকে ফসফরাস তার শক্তি যোগায়।
- শিকড়ের দ্রুত বৃদ্ধি হতে সাহায্য করে।
- জল্দি শীষ আসা ও ফসল অপেক্ষাকৃত দ্রুত পাকতে সাহায্য করে বিশেষ করে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়।
- সক্রিয় পাশকাঠি সৃষ্টিতে উৎসাহ যোগায়। এর ফলে গাছ যেকোন প্রতিকূল পরিবেশ সহ্য করতে পারে ও তাড়াতাড়ি সেরে উঠে।
- ভাল ও পুষ্ট দানা গঠনে সহায়তা করে।

ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণাবলী

- গাছ বাড়ে না ও পাশকাটি কম হয়।
- পাতা সরুও ছোট হয় এবং খাড়া হয়ে থাকে। পাতার রঙ হয় গাঢ় সবুজ।
- নতুন পাতা পুরানো পাতা অপেক্ষা বেশি সতেজ থাকে। পুরানো পাতার রঙ হয় বাদামী ও পরে মরে যায়।
- পাতাতে লালচে অথবা বেগুনী রঙ দেখা যায়।

পটাশিয়ামের কাজ

- পটাশিয়াম গাছের জৈব উপাদান নয় কিন্তু ৪০টি বা তারও বেশী এনজাইমের সংগে জড়িত।

- পাশকাঠির সংখ্যা, দানার ওজন ও আকৃতি বাড়তে সাহায্য করে।
- ফসফরাস প্রয়োগে গাছে যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা বাড়িয়ে দেয়।
- গাছের শারীরবৃত্তীয় কাজে সাহায্য করে বিশেষ করে পত্ররন্ধ্রের খোলা বা বন্ধের কাজে। এছাড়া গাছের প্রতিকূল আবহাওয়া সহ্য করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

পটাশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণাবলী

- গাছ বাড়ে না এবং পাশকাঠির সংখ্যা কিছুটা কমে যায়।
- পাতা ছোট গাঢ় সবুজ রঙের হয় এবং কিছুটা ঢলে পড়ে।
- নীচের পাতার মধ্যশিরা ডগার দিক থেকে হলুদে রঙের হতে থাকে। শুকনো হলে দেখতে প্রায়ই বাদামী রঙের হয়।
- কোন কোন সময় গাঢ় সবুজ পাতার উপর বাদামী দাগ দেখা যায়।
- শীষের উপর কোন কোন সময় বিক্ষিপ্তভাবে কালো পচা দাগ দেখা যেতে পারে।
- সরু ও লম্বাটে শীষ হয়।
- যখন অতিরিক্তভাবে নাইট্রোজেনের অসমতা দেখা যায় তখন গাছ শুকনো হয়ে উঠার লক্ষণ দেখা যায়। পটাশিয়াম ও নাইট্রোজেনের অনুপাত কম হয়।

ক্যালসিয়ামের কাজ

- গাছে প্রোটিনের সংগে মিলে ক্যালসিয়াম পেকটেট তৈরী করে। ইহা উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর শক্ত হতে সাহায্য করে।
- উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরের রসস্ফীতি (Turgidity) বজায় রাখে।
- স্বাভাবিক শিকড় বৃদ্ধির প্রবর্তক হিসাবে কাজ করে।
- উদ্ভিদ কোষের জমানো উপাদান (Cementing material) হিসাবে কাজ করে।

ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণাবলী

সাধারণভাবে এর অভাবের জন্য গাছের আকৃতি গত খুব একটা পরিবর্তন দেখা যায় না। তবে খুব বেশী অভাব হলে নিম্নরূপ লক্ষণ দেখা যায়।

- উপরের দিকের নতুন পাতার ডগার রঙ সাদা হয় ও পাকিয়ে গুটিয়ে যায়।
- খুব বেশী অভাব দেখা দিলে গাছের বৃদ্ধি হয় না এবং বর্দ্ধিত ডগা শুকিয়ে যায়।

ম্যাগনেশিয়ামের কাজ

- পত্রহরিতের (Chlorophyll) একটি উপাদান
- বেশ কয়েকটি দরকারী এনজাইমের একটি অঙ্গ
- ক্যালসিয়ামের মত একই ধরণের কাজ করে।

ম্যাগনেশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণাবলী

- মাঝারি ধরণের অভাব দেখা দিলে গাছের উচ্চতা, পাশকাঠির সংখ্যা খুব কম হ্রাস পায়।
- পাতার ফলক এবং কাণ্ডবেষ্টক পত্রাবরণীর মধ্যের কোনটি (Angle) বেশী হওয়ার ফলে পাতা ঢেউ খেলানো হয় এবং ঢলে পড়ে।
- আন্তঃ শিরায় পাণ্ডুরোগ হওয়ার জন্য নীচের পাতা কমলা বা হলদে রঙের হয়।

সালফারের কাজ

- অ্যামিনো এসিড সিসটেন, মিথিওনাইন এবং উদ্ভিদ হরমোন থিয়ামিন ও বায়োটিনের একটি বিশেষ উপাদান
- অনেক উদ্ভিদ এনজাইম এবং জারণ ও বিজারণের কাজ চালু রাখতে লাগে।

সালফারের অভাবজনিত লক্ষণাবলী

- নাইট্রোজেনের অভাবের ফলে যেসব লক্ষণাবলী দেখা যায় এর ক্ষেত্রেও একই রকম হয়। সেজন্য একটি থেকে অপরটি আলাদা করে দেখা প্রায় অসম্ভবই মনে হয়। তবে কয়েকটি বিষয় ভালভাবে লক্ষ্য করলে পার্থক্য বোঝা যাবে যেমন সালফারের অভাব হলে সারা গাছে সাধারণভাবে পাণ্ডুরোগ দাগ দেখা যায় কিন্তু পুরানো পাতা তাড়াতাড়ি শুকনো হয় না। নাইট্রোজেনের বেলায় পুরানো পাতায় গভীর ভাবে পাণ্ডুরোগ দাগ দেখা যায়। সালফারের অভাব হলে গাছের বৃদ্ধি দেরীতে হয় কিন্তু নাইট্রোজেনের বেলায় ফুল আসা এবং দানা পুষ্টি তাড়াতাড়ি হয়। সালফার পুরানো পাতা থেকে নতুন পাতায় যেতে পারে না কিন্তু নাইট্রোজেনের বেলায় তা হয়।
- গাছের উচ্চতা ও পাশকাঠি কম হয়। পাকার সময় কম সংখ্যক ছোট আকারের শীষ দেখা যায় এবং শীষে দানার সংখ্যাও কম হয়।
- পাশকাঠি ছাড়ার সময় কাণ্ড বেষ্টক পত্রাবরনী হলুদ রঙের হতে থাকে এবং ক্রমে পাতার ফলকে দেখা যায় ও শেষে সারা গাছে ছড়িয়ে পড়ে।

জিঙ্কের কাজ

- সম্ভবতঃ অক্সিন তৈরীর কাজে যুক্ত
- এনজাইম ঘটিত বিক্রিয়াকে সক্রিয় করে
- নাইট্রোজেন মেটাবলিজম এর সংগে নিবিড়ভাবে জড়িত

জিঙ্কের অভাবজনিত লক্ষণাবলী

- নতুন পাতার মাঝ শিরা বিশেষ করে পাতার গোড়ার দিকে পাণ্ডু রঙের দাগ দেখা যায়।
- বাদামী লম্বা দাগ নীচের দিকের পাতায় দেখা যায়। বৃদ্ধি কমে যায়, তবে পাশকাঠির সংখ্যা অব্যাহত থাকে।
- পাতার ফলকের আকৃতি ছোট হয় কিন্তু কাণ্ডবেষ্টক পত্রাবরণীর দ্বারা খুব কমই আক্রান্ত হয়।
- অনিয়মিত বৃদ্ধি এবং মাঠে দেরীতে পাকতে দেখা যায়।

আয়রনের কাজ

- পত্র হরিৎ (Chlorophyll) তৈরীর সংগে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু এর একটি উপাদান হিসাবে গণ্য হয় না।
- গাছের পটাশিয়াম গ্রহণে বাধ সাধে।

আয়রনের অভাবজনিত লক্ষণাবলী

- সমস্ত পাতাতে পাণ্ডু দাগ দেখা যায় এবং পরে সাদা হয়ে যায়।
- যদি হঠাৎ করে আয়রন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে নতুন যে পাতাটি বেরুবে তাতেও পাণ্ডু দাগ দেখা যায়।

ম্যাঙ্গানিজের কাজ

- সালোক সংশ্লেষ ও জারণ ও বিজারণ প্রক্রিয়ার একটি গুণক হিসাবে কাজ করে।
- অনেক এনজাইম যেমন অক্সিডেজ, পেরোক্সিডেজ, ডিহাইড্রোজিনেজ, ডিকারবোক্সিলেজ এবং ফাইনেজ প্রভৃতির কাজ ত্বরান্বিত করে।

ম্যাঙ্গামিজের অভাবজনিত লক্ষণাবলী

- গাছ ছোট আকৃতির হয় কিন্তু পাশকাঠির সংখ্যা স্বাভাবিক থাকে।
- পাতার আন্তশিরায় পাণ্ডু দাগ দেখা যায়।

- পাতায় পাণ্ডু লম্বা দাগ পাতার ডগা থেকে গোড়ার দিকে আসতে থাকে এবং পরে গাঢ় বাদামী রঙের দাগে পরিবর্তিত হয়।
- নতুন পাতা ছোট, সরু এবং হালকা সবুজ রঙের হয়।

বোরনের কাজ

- গাছে ক্যাটালিষ্ট হিসাবে কাজ করে।
- বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রন করে যেমন নাইট্রোজেন মেটাবলিজম, খাদ্যগ্রহণ বিশেষ করে ক্যালসিয়াম বিপাকীয় কার্য্যাবলী।

বোরনের অভাজনিত লক্ষণাবলী

- গাছের উচ্চতা হ্রাস পায়।
- নতুন পাতার ডগা সাদা রঙের হয় ও গুটিয়ে যায়। যেমনটি ক্যালসিয়ামের অভাবের জন্য দেখা যায়।
- বাড়ন্ত পাতার ডগা মরে যায় কিন্তু নতুন পাশকাঠি তৈরী অব্যাহত থাকে।

মলিবডেনাম

উদ্ভিদ দেহে নাইট্রেট থেকে নাইট্রাইটে বিজারিত হওয়ার সংগে সম্পর্কযুক্ত। এর অভাবের জন্য লক্ষণাবলী খুব স্পষ্ট করে ধানের ক্ষেত্রে বলা নেই।

কপারের কাজ

- বিপাকীয় এনজাইমের একটি অঙ্গ
- এনজাইম ঘটিত বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে

কপারের অভাবজনিত লক্ষণাবলী

- পাতার রঙ হয় নীলাভ সবুজ এবং ডগা পাণ্ডু রঙের হয়।
- পাতার ডগা থেকে গোড়ার দিকে লক্ষ্য করলে মধ্য শিরার উভয় দিকে পাণ্ডু রঙের দাগ দেখা যায় ও ডগা গাঢ় বাদামী রঙের হয়।
- নতুন পাতা গুটিয়ে গোল হয়ে যায়। ফলে পুরো পাতা দেখতে একটি সূচের মত লাগে। অনেক সময় পুরো পাতা না হয়ে গোড়ার দিকে অর্ধেক পাতা স্বাভাবিক থাকে।

ক্লোরিন

সালোক সংশ্লেষের জন্য অতি প্রয়োজনীয় উপাদান তবে এর অভাবজনিত লক্ষণাবলী ধানের ক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে বলা হয়নি।

সিলিকন

যেসব মাটিতে সিলিকন কম রয়েছে সেখানে সিলিকন বেশী মাত্রায় নাইট্রোজেন সারের সংগে প্রয়োগ করলে আধুনিক ধানের জাতে ফলন বাড়ায়। সিলিকন প্রয়োগের ফলাফল চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির উপর

- গাছের বৃদ্ধি বাড়ায়, কাণ্ড এবং শীষের শক্তি জোগায় এবং শীষ তাড়াতাড়ি আসতে সাহায্য করে
- শীষে অনুমঞ্জরী ও পরিপক্ক দানার পরিমাণ বাড়ায়
- পাতা খাড়া হয়ে থাকতে সাহায্য করে। খাড়া পাতায় সালোক সংশ্লেষের পরিমাণ বেশী হয়

(২) গাছের জলের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের উপর

- যেসব পরিবেশে বাষ্পীমোচন বেশী হয় বা জলের শোষণ বাধাপ্রাপ্ত হয় সেসব জায়গায় সিলিকন বিহীন গাছ ভেতরে ভেতরে জলের অভাব বোধ করে
- গাছে শীষ মুকুল আসার সময় সিলিকনের সরবরাহ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় আসে কারণ শীষ মুকুল বেরুবার সময় শিকড়ের কার্যকারিতা কমে আসে এবং বাষ্পীমোচনের ফলে জলের প্রয়োজন বেশী হয়।

(৩) রোগ ও পোকামাকড়ের প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর

- পুরু সিলিকা কৃত্তিক (cuticle) স্তর ছত্রাক বা পোকামাকড় আক্রমণ প্রতিহত করে
- সিলিকন ঝলসা প্রভৃতি রোগের আক্রমণ কমিয়ে দেয়

(৪) অন্যান্য খাদ্যোপাদানের উপর

- সিলিকন সম্ভবতঃ ধান গাছে ফসফরাস সরবরাহ ত্বরান্বিত করে এবং বেশী ফসফরাস ধরে রাখতে সাহায্য করে
- সিলিকন গাছে ফসফরাস সহজলভ্য পর্যায়ে আসতে সাহায্য করে।

সিলিকনের অভাবে গাছ নরম ও দুর্বল প্রকৃতির হয় এবং ঢলে পড়ে।

গাছের বিভিন্ন খাদ্যোপাদানের আধিক্যজনিত ক্ষতির লক্ষণাবলী

আয়রন

- প্রথমে ছোট্ট বাদামী বিন্দু নীচের পাতায় দেখা যায়। পাতার ডগা থেকে পাতার গোড়ার দিকে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে এই বিন্দুগুলি অন্তঃশিরায় জোড়া লেগে যায়।
- পাতার রঙ সাধারণতঃ সবুজই থাকে। বেশী মাত্রায় বিষক্রিয়া দেখা দিলে পুরো পাতাটা নীল বাদামী রঙের হয়।

ম্যাঙ্গানিজ

- গাছের বৃদ্ধি হ্রাস পায় ও পাশকাঠির সংখ্যা সীমিত হয়।
- পাতার শিরায় ও কাণ্ডবেষ্টক পত্রাবরণীতে বাদামী দাগ দেখা যায় বিশেষ করে নীচের পাতায় এ ধরণের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বোরণ

- পুরানো পাতার ডগাতে পাণ্ডু দাগ হয় বিশেষ করে পাতার ধার বরাবর। পরে বড় বড় বাদামী দাগে পরিণত হয় ও শুকনো হয়ে যায়।

অ্যালুমিনিয়াম

- আন্তশিরা কমলা হলদে রঙের দাগ দেখা যায়। ক্রমে তা আরো বড় হয়।

বেশী লবণের জন্য ক্ষতির লক্ষণ

- গাছের বৃদ্ধি হ্রাস পায়
- পাশকাঠির সংখ্যা কমে যায়
- পাতার ডগার রঙ ক্রমশঃ সাদাটে হয়। এছাড়া পাতার কিছু কিছু অংশ প্রায়ই পাণ্ডু দাগ দেখা যায়।

সারনি ১৬ ঃ কোথায় এবং কখন খাদ্যোপাদনের অভাব বা আধিক্যজনিত ক্ষতির লক্ষণাবলী দেখা যায়

খাদ্যোপাদান	অভাব বা আধিক্য	নির্দিষ্ট মাপ যার কম বা বেশীতে লক্ষণ প্রকাশ পায়	গাছের বিভিন্ন অংশ	বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্ব
নাইট্রোজেন	অভাব	২.৫%	পত্র ফলকে	পাশকাঠি ছাড়ার সময়
ফসফরাস	অভাব	০.১%	পত্র ফলকে	পাশকাঠি ছাড়ার সময়
	আধিক্য	১.০%	খড়ে	পাকার সময়
পটাশিয়াম	অভাব	১.০%	খড়ে	পাকার সময়
	অভাব	১.০%	পত্র ফলকে	পাশকাঠি ছাড়ার সময়
ক্যালসিয়াম	অভাব	০.১৫%	খড়ে	পাকার সময়
ম্যাগনেসিয়াম	অভাব	০.১০%	খড়ে	পাকার সময়
সালফার	অভাব	০.১০%	খড়ে	পাকার সময়
আয়রন	অভাব	৭০ পিপিএম	পত্র ফলকে	পাশকাঠি ছাড়ার সময়
	আধিক্য	৩০০ ,,	পত্র ফলকে	পাশকাঠি ছাড়ার সময়
জিঙ্ক	অভাব	১০ ,,	ডাঁটায়	পাশকাঠি ছাড়ার সময়
		১৫০০ ,,	খড়ে	পাকার সময়
ম্যাঙ্গানিজ	অভাব	২০ ,,	ডাঁটায়	পাশকাঠি ছাড়ার সময়
	আধিক্য	২৫০০ ,,	ডাঁটায়	পাশকাঠি ছাড়ার সময়
বোরণ	অভাব	৩.৪ ,,	খড়ে	পাকার সময়
		১০০ ,,	খড়ে	পাকার সময়
কপার	অভাব	৬ ,,	খড়ে	পাকার সময়
	আধিক্য	৩০ ,,	খড়ে	পাকার সময়
য়্যালুমিনিয়াম	আধিক্য	৩০০ ,,	ডাঁটায়	পাশকাঠি ছাড়ার সময়

উৎস ঃ তানাকা ও জোসিদা (১৯৭০)—রাইস প্রোডাকসন (এস. কে. দেদত্তর লেখা) বই থেকে নেওয়া। পৃঃ ৩৫৭।

বিভিন্ন অণুখাদ্যের অভাবজনিত অসুবিধা দূর করার উপায়

দস্তা

● পাতায় স্প্রে করে--

গাছে দস্তার অভাব জনিত লক্ষণ প্রকাশ পেলে হেক্টার প্রতি ৫ কেজি দস্তা (০.১ শতাংশ তরল জিঙ্ক সালফেট বা জিঙ্ক ক্লোরাইড হিসাবে) দুবারে স্প্রে করতে হবে। ঐ সংগে ১.৫ কেজি চুন মিশিয়ে ব্যবহার করলে ভাল কাজ হয়।

যদি খুব বেশী মাত্রায় লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহলে ০.৫ শতাংশ জিঙ্ক সালফেট ও ০.২৫ শতাংশ চুন মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

● মাটিতে প্রয়োগ—

হেক্টার প্রতি ২৫ কেজি জিঙ্ক সালফেট অথবা জিঙ্ক ক্লোরাইড অথবা ষ্টারজিন মূলসার হিসাবে দেওয়া যায়। চাপান সার হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। জিঙ্ক ক্লোরাইড হাতের চামড়া নষ্ট করে। তাই ব্যবহারের সময় হাতে দস্তানা ইত্যাদি জড়িয়ে নিতে পারলে ভাল।

● চারার শিকড় ডুবিয়ে—

১ থেকে ২ শতাংশ হারে জিঙ্ক অক্সাইডের মিশ্রণ তৈরী করে চারা রোয়ার আগে চারার শিকড় এক মিনিটের জন্য ডুবিয়ে নিতে হবে। ডোবানোর কিছু সময় পরে চারা রোয়া উচিত।

লৌহ

● পাতায় স্প্রে করে—০.১ থেকে ০.২ শতাংশ ফেরাস সালফেট বা ফেরাস সাইট্রেটের মিশ্রণ করে তাতে চুণ মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে (দস্তার বেলায় যেভাবে বলা হয়েছে)।

● মাটিতে সালফারের গুঁড়ো প্রয়োগ—মাটিতে সালফার গুঁড়ো ব্যবহার করলে মাটির পি এইচ কমে যায় অর্থাৎ মাটি অম্ল হয়। ফলে লৌহের অভাব কমে যায়। এক্ষেত্রে চারা রোয়ার ২ থেকে ৩ সপ্তাহ পরে হেক্টার প্রতি ২০০ থেকে ৫০০ কেজি সালফার গুঁড়ো আলাদা ভাবে মাটির সংগে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর ঐটি জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। মাটির সংগে মেশানোর ফলে সালফিউরিক এ্যাসিড তৈরী করে।

- কমপোস্ট সার হেক্টার প্রতি ৮ টন হারে জমিতে প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এর সংগে হেক্টারে ৪ কেজি আয়রন সালফেট বা আয়রণ ক্লোরাইড মিশিয়ে দিতে পারলে আরো ভাল হয়।
- ধানের শুকনো মাঠে জল ভরে দিলে গাছ মাটি থেকে বেশী মাত্রায় লৌহ নিতে পারে। এভাবেও লোহার অভাব মেটানো যেতে পারে।

ম্যাঙ্গানিজ

ম্যাঙ্গানিজের অভাব জনিত লক্ষণাবলী দেখতে অনেকটা লৌহের মত। তাই আগের ক্ষেত্রে যে ধরণের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে এক্ষেত্রেও অনুরূপ হবে।

- ০.১ থেকে ৩.২ শতাংশ ম্যাঙ্গানাস সালফেট বা ম্যাঙ্গানাস ক্লোরাইড চুনের সংগে মিশিয়ে স্প্রে করলে কাজ দেবে। সংগে ইউরিয়াও স্প্রে করা যেতে পারে।
- মাটিতে ম্যাঙ্গানাস সালফেট বা ক্লোরাইড হেক্টার প্রতি ৩০ থেকে ৫০ কেজি প্রয়োগ করলে ফল ভাল পাওয়া যায়।

সার প্রয়োগের আগে বিচার্য বিষয়

ধানে যথাযথ সার প্রয়োগ করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি ওয়াকিবহাল হতে হবে।

- গাছের ঠিকঠিক ভাবে কতখানি খাদ্যের চাহিদা রয়েছে
- গাছের বৃদ্ধির কোন কোন পর্বে কতখানি খাদ্য নিয়ে থাকে
- গাছের যে খাদ্য চাহিদা দেখা দেবে তার মধ্যে মাটি থেকে কতখানি পাওয়া যাবে
- গাছের বিভিন্ন পর্বে যে খাদ্য শোষণ করে তার মধ্যে কতটুকু এবং কখন উৎপাদনের কাজে লাগে।

এ বিষয়ে দেশে বিদেশে নানান বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে, অনেক অজানা তত্ত্বের উত্তর মিলেছে। অনেক সময় সংশয়ও দেখা দিয়েছে। তবে এ বিষয়ে আরো নিবিড়ভাবে প্রত্যেকটি এলাকার জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত যা কিছু পাওয়া গেছে তা সংক্ষেপে আলোচিত হল।

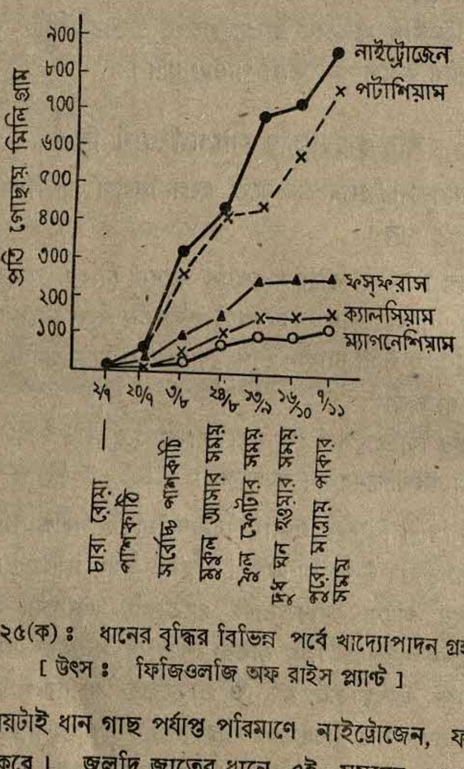
ঋতু, প্রকৃতি, আবহাওয়া, মাটি ও জাতভেদে গাছের খাদ্য চাহিদা ভিন্ন রকম হয়। সুতরাং সার ব্যবহারের পরিমাণও সেইভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। গাছের মাটি থেকে খাদ্য কতখানি নিতে পারে তার একটা মোটামুটি হিসাব

দেখানো হল। উদাহরণ স্বরূপ দেখানো হয়েছে যদি ধানের ফলন হেক্টার প্রতি ৪ টনের মত হয় তাহলে নিম্নরূপ খাদ্যোপাদান (হেক্টার প্রতি কেজিতে) অপসারণ করতে পারে।

নাইট্রোজেন	৯০	পটাশিয়াম	২১৯	ম্যাগনেসিয়াম	২৫	ম্যাঙ্গানিজ	১২
ফসফরাস	২০	ক্যালসিয়াম	৩৪	লৌহ	১২	সিলিকন	১৭০০

দেখা যায় নাইট্রোজেন, ফসফরাস বা পটাসিয়াম ছাড়াও লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ বা সিলিকনেরও চাহিদা যথেষ্ট রয়েছে। পরের পাতার সারনিতে (সারনি ৮) দেখানো হল। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন জাতের ধান কি পরিমাণে খাদ্যোপাদান অপসারণ করে থাকে।

ধানের জীবনচক্রের পর্বগুলির সংগে বিভিন্ন খাদ্যোপাদান গ্রহণের পরিমাণ (চিত্র ২৫ক) বিচার করলে দেখা যায় যে রোয়ার সময় থেকে ফুল আসা



চিত্র ২৫(ক) ঃ ধানের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্বে খাদ্যোপাদন গ্রহণ

[উৎস ঃ ফিজিওলজি অফ রাইস প্ল্যান্ট]

পর্যন্ত পুরো সময়টাই ধান গাছ পর্যাপ্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং সালফার গ্রহণ করে। জলদি জাতের ধানে এই সময়ের মধ্যে উক্ত খাদ্য

গ্রহণের পরিমাপে কোনও ছেদ পড়ে না। নাবি বা মাঝারি জাতের ধানেও এই সম্পর্ক বিদ্যমান কিন্তু জীবন চক্রের একটি বিশেষ পর্যায়ে যখন গাছের বৃদ্ধি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তখন এই খাদ্যগুলিও নিতে পারে না। পটাশিয়াম গ্রহণের চিত্রও পায় একই রকম। তবে রোয়া থেকে আরম্ভ করে দানা শক্ত

সারনি ৮ঃ কতকগুলি অধিক ফলনশীল ও দেশী ধানের খাদ্যোপাদান অপসারণের পরিমাণ

বিভিন্ন জাত	ঋতু	ধানের ফলন হেক্টার প্রতি কেজিতে	অপসারিত খাদ্যোপাদান (হেক্টার প্রতি কেজি) নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম
অধিক ফলনশীল জাত					
আই-আর-৮	খরিফ	৬৩০৮	৯৫	২৫	১৪৯
	রবি	৬৯৩৯	৯৯	২৩	১২৪
জয়া	খরিফ	৬১৩৬	৮৪	২৫	১৪৭
	রবি	৬৬৩৫	১০৫	২৩	১২৯
বালা	খরিফ	৪২৬২	৫৯	১৯	১০৮
	রবি	৫৭১৩	১০২	২০	১০৩
কৃষ্ণা	খরিফ	৫৩৯৯	৯৪	২২	১০৭
	রবি	৬৫৭৪	৯৬	২৩	১০৯
কাবেরী	খরিফ	৪৪৫৭	৮৫	১৭	৯৬
	রবি	৫৬৯০	৮৮	২১	১১৬
কান্চী	খরিফ	৪৪৭০	৭৬	২০	১১৫
	রবি	৫৭৪৫	১০৩	২৪	১৪১
দেশী জাত					
পি-টি-বি	খরিফ	২৪১৫	৪৫	১২	৫৪
	রবি	১৮০০	২২	৮	২৯
এম-টি-ইউ-১৫	খরিফ	১৯৪২	৪৩	১৩	৪৯
	রবি	৩২৪১	৪১	১৩	৬৫

উৎস: ফার্টিলাইজার ষ্ট্যাটিস্টিকস্, ১৯৭৪-৭৫, ফার্টিলাইজার এ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া, নিউ দিল্লী, ১-১৩৯ (১৯৭৫)।

হবার আগে পর্যন্ত গাছ পটাশিয়াম নিতে পারে। জল্দি, মাঝারি বা নাবি জাতের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া একই রকম হয়। ধানের প্রাথমিক বৃদ্ধির মুখে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেশিয়াম নেওয়ার মাত্রা খুবই কম, কিন্তু পাশকাঠির সংখ্যা সবচেয়ে যখন বেশী হয় তখন থেকে ধান পাকা পর্যন্ত এই দুই খাদ্য উপাদান তুলনামূলক অনুপাতে বেশী নিতে পারে।

সব মাটি সমানভাবে সব সময় গাছকে খাদ্য যোগান দিতে পারে না। মাটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খাদ্য উপাদানগুলির স্বরূপ ও তার যোগানের পরিমাণ নির্ভর করে। যে মাটির পুষ্টিমান কম সেখানে সার ব্যবহার করলে ফল তুলনামূলকভাবে বেশী পাওয়া যায়। বিপরীতভাবে প্রাকৃতিক খাদ্যগুণ বেশী থাকলে, সার ব্যবহার করলে সুফল অতটা পাওয়া যায় না। তাই মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সব সময় সার ব্যবহার করা উচিত।

গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্বে যে পরিমাণ খাদ্য মাটি থেকে নিয়ে থাকে তার সবটাই ফসলের উৎপাদনের কাজে লাগে না। গাছে যে সার ব্যবহার করা হয় তার কতটুকু পরিমাণ গাছের বৃদ্ধির ঠিক কোন সময়ে কাজে লাগছে তার কিছুটা হিসাব নিচের এই সূত্রটির সাহায্যে বের করা সম্ভব। সূত্রটির নাম 'আংশিক উৎপাদন কার্যকারিতা সূত্র বা Partial productive efficiency'

$$Y_n - Y_{n-1} / X_n - X_{n-1}$$

এখানে Y এবং X যথাক্রমে ফসলের উৎপাদন ও গাছ কতটা খাবার নিয়েছে তার সূচক। n এবং $n-1$ গাছের বৃদ্ধির দুই পর্বের সূচক।

কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ খাদ্যোপাদান শোষণ হয় এবং তার কতখানি উৎপাদনের কাছে লাগছে সেই বিষয়টি এই আংশিক উৎপাদন কার্যকারিতা সূত্র থেকে জানা যায়। তানাকা ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ (১৯৫৯এ) ও পট্টনায়ক ও সহযোগীগণ (১৯৬৯) বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন খাদ্যোপাদানের উপর কাজ করে দেখেছেন। যদিও বা নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম চারা রোয়ার পর থেকে দানা পাকা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে শোষণের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে থাকে কিন্তু সব সময়ের শোষণ উৎপাদনের কাজে লাগে না। তাই বৃদ্ধির ঐ নির্দিষ্ট সময়গুলিকে চিহ্নিত করে সার প্রয়োগ করা উচিত।

এইসব বিজ্ঞানীগণ দেখিয়েছেন গাছের বৃদ্ধির দুটি পর্বে পাশকাঠি ছাড়া ও শীষ মুকুল আসার সময় নাইট্রোজেনের শোষণ ও চারা রোয়ার ৮ সপ্তাহের মধ্যে ফসফরাস ও পটাশিয়ামের শোষণ উৎপাদনের কাজে লাগে। তাই এ সূত্র থেকে বলা যেতে পারে যে ধান চাষে প্রাথমিক সার হিসাবে ফসফরাস

ও পটাশিয়ামের পুরোটা এবং নাইট্রোজেন সারের অন্ততপক্ষে শতকরা ৭৫ ভাগ গাছ বেড়ে ওঠার সময় ও বাকি ২৫ ভাগ থোড় আসার থেকে ফুল ফোটা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে !

এবার কি ধরনের সার কতখানি ব্যবহার করতে হবে, কিভাবে সার ব্যবহার করলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কৃষক বেশী লাভবান হবে বা সারের বেশীর ভাগ অংশ কিভাবে গাছ নিতে পারে সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হল। অনেক সময় মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার প্রয়োগের সুবিধা থাকে না সেখানে সামর্থ্য ও সংগতির মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে কতখানি সার ব্যবহার করতে হবে তারও হিসাব পরে বলা হয়েছে। শুধু নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম ছাড়াও আজকাল নিবিড় শস্য পর্যায়ে চাষাবাদের ফলে অণুখাদ্যেরও অভাব দেখা যায়। এ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

নাইট্রোজেন

নাইট্রোজেনের উৎস (Sources of nitrogen)

এ্যামোনিয়াম ঘটিত সার বা যেসার প্রয়োগে পরে এ্যামোনিয়াম হবে এমনসার চারা রোয়া বা বীজ বোনার আগে অথবা চাপানসার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। নাইট্রেট ঘটিত সার মূলসার হিসাবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না তবে কোন কোন ক্ষেত্রে চাপান হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তুলনামূলক বিচারে এ্যামোনিয়ামে নাইট্রোজেনের থেকে কম ফল পাওয়া যায়।

যদি নাইট্রেট সার বীজ বোনার বা চার রোয়ার আগে মূল সার হিসাবে কাদানো জলা জমিতে ব্যবহার করা হয় তাহলে নাইট্রেট সহজে চুঁইয়ে নীচের অবায়বীয় বিজারিত স্তরে (Reduced Zone) চলে যাবে এবং সেখানে ডিনাইট্রিফিকেসান প্রক্রিয়ায় নাইট্রাইট (N_2O) ও পরে গ্যাসীয় নাইট্রোজেন (N_2) আকারে নষ্ট হয়। এ্যামোনিয়াম ঘটিত সারের মধ্যে এখনো এ্যামোনিয়াম সালফেট একটি ভাল সার হিসাবে গণ্য হয়। অবশ্য মাটি যদি খুব অম্ল প্রকৃতির বা হালকা ধরনের হয় তাহলে সেখান থেকে সহজে চুঁইয়ে নষ্ট হয়, তখন এই সার ব্যবহার না করাই ভাল। এ্যামোনিয়াম সালফেটে, সালফেট র‍্যাডিক্যাল থাকার ফলে নীচের বিজারিত স্তরে হাইড্রোজেন সালফাইড হয় যা গাছের পক্ষে ক্ষতিকারক। কিন্তু প্রশমিত (neutral) মাটিতে কোন সমস্যা হয় না কারণ মাটির আয়রনের সংগে আয়রন সালফাইড হয়, এবং তা জলে দ্রবণীয় হয় না। বেশী অম্ল মাটিতে

(পি. এইচ ৩.৫—৪.৫) এ্যাল্যুমিনিয়ামের বিষক্রিয়া দেখা যায় ও ফসফেট গাছের সহজলভ্য আকারে কম পাওয়া যায়।

ইউরিয়া আজকের দিনে খুব একটি জনপ্রিয় সার হিসাবে প্রচলিত। কারণ এর নাইট্রোজেনের ভাগ বেশী থাকে, পরে এ্যামোনিয়াম হতে পারে, মাটিতে সালফারের জন্য অসুবিধা হয় না, পরে কোন বাকি লবণ থাকে না। ইউরিয়া ব্যবহারের ফলাফল বিচার করলে দেখা যায় এই ইউরিয়া এ্যমোনিয়াম সালফেটের মত প্রায় সমান ফল দেয়। যদি তা না হয় তাহলে অনেকক্ষেত্রে সারের ব্যবহার পদ্ধতি সুপারিশ মত হয়নি বলে দেখা গেছে।

যদিও ইউরিয়ার অনেক গুণাবলী রয়েছে তথাপি এর পেছনে কিছু সমস্যাও রয়েছে। এগুলির মধ্যে

- ইউরিয়া বাতাস থেকে জলীয় অংশ (রস) টেনে নিতে পারে। ফলে মাঠে ব্যবহার করা বা সংরক্ষণ করে রাখা খুব একটা সহজ হয় না।
- ইউরিয়া সার যদি জমির উপরে ছিটিয়ে দেওয়া হয় বিশেষ করে উষ্ণ প্রধান অঞ্চলে তাহলে নাইট্রোজেন এ্যামোনিয়াম আকারে উবে যায়। তাই এইসব সার ব্যবহার করার সংগে সংগে মাটির সংগে মিশিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। যদি তা না করা হয় তাহলে দেখা গেছে ৬০ শতাংশের মত নাইট্রোজেন নষ্ট হয়। এটি একটি বড় ধরনের সমস্যা।

আজকের দিনে ইউরিয়া সারের এই ধরনের অসুবিধা দূর করার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয় তা পরে আলোচিত হল।

এ্যাকোয়া বা এ্যানহাইড্রাস এ্যামোনিয়াম যদিও বা অনেক বেশী নাইট্রোজেন থাকে তথাপি এর ব্যবহার আমাদের দেশে সহজসাধ্য হয়ে উঠেনি। অনেক সময় সেচের জলের সংগে মিশিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু উদ্‌বায়ী হয়ে নাইট্রোজেন অনেক নষ্ট হয়।

নাইট্রোজেন ব্যবহারের মাত্রা (Rate of nitrogen application)

নাইট্রোজেনের মাত্রা নির্ভর করবে বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর।

- মাটির প্রকৃতি (উর্বর বা অনুর্বর)
- কোন ঋতুর ধান (খরিফ, বোরো বা গ্রীষ্মকালীন)

- ধানের জাত (দেশী বা অধিক ফলনশীল, জলদি, নাবি বা মাঝারি ইত্যাদি)
- জমির অবস্থান (উঁচু, মাঝারি বা নীচু প্রকৃতির)

সব দিক বিবেচনা করে যে সুপারিশ করা হয় তা ১৪০ এবং ১৪১ পৃষ্ঠায় দেখানো হলো।

ঋতু ও নাইট্রোজেন ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া (Season and response to nitrogen application)

বেশীর ভাগ ধান ভারতে খরিফ ঋতুতে চাষ হয়। এ সময়ে তাপমাত্রা বেশী থাকে, বেশীর ভাগ সময় আকাশ মেঘে ঢেকে থাকে তাই আলোক কম সময় পায়। আলোক কম সময় ধরে পেলে সালোক সংশ্লেষ কম হবে কিন্তু শর্করা জাতীয় জমা খাবারের খরচ বেশী হবে, শিকড় কম বাড়বে, গাছের শিকড় নাইট্রোজেন কম নেবে। তাই নাইট্রোজেন গ্রহণ ও শর্করাজাতীয় খাদ্য তৈরীর মধ্যে একটা অসম ভাব আসবে। অন্যদিকে কম আলোর ফলে গাছের পাতায় ছায়া পড়ে, গাছ লম্বাটে হতে থাকে, পাশকাঠির সংখ্যা বেশী হয়। তাই ফলনের থেকে গাছের ওজন বেশী হয়ে যায়।

বোরো মরসুমে গাছ বেশী নাইট্রোজেন শোষণ করতে পারে কারণ এ সময়ে আকাশে মেঘ থাকে না, বেশী সময় ধরে আলো পায়, সালোক সংশ্লেষ বেশী হয় ইত্যাদি।

নাইট্রোজেন প্রয়োগ করার পদ্ধতি (Method of nitrogen application)

আগে বলা হয়েছে অবায়বীয় বিজারিত স্তরে (Reduced layer) নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা হলে কম নষ্ট হয়। ঐ স্তরে অক্সিজেনের অভাব থাকে এবং সেজন্য ডিনাইট্রিফিকেশন হতে পারে না। তাই দেখা গেছে ৫ থেকে ১০ সেণ্টিমিটার মাটির নীচে সার প্রয়োগ খুব কার্যকরী হয়। পরের পাতার সারনি থেকে এটি খুব স্পষ্ট হবে।

যদিও বীজ বোনা বা রোয়ার আগে মূলসার হিসাবে সার প্রয়োগ করা হয় তাহলে শেষ চাষের আগে সার ছিটিয়ে দিয়ে সংগে সংগে চাষ দিতে হবে। এক্ষেত্রে আর কোন সমস্যা দেখা দেবে না।

সারণি—

বিভিন্ন পদ্ধতিতে নাইট্রোজেনের প্রয়োগ	ধানের ফলন হেক্টার প্রতি কেজিতে		নাইট্রোজেনের শোষণ (শতকরা)	
	কটক সি. আর ২০০২	হায়দ্রাবাদ এইচ আর ৩৫	কটক সি-আর ২০০২	হায়দ্রাবাদ এইচ-আর ৩৫
উপরে ছিটিয়ে দেওয়া	৪৮৮৬	২৮৫০	৩৪.৫	২৮.৭
মাটির ৫ সেন্টিমিটার নীচে সার প্রয়োগ	৫১২১	৩৪৫৪	৪৭.২	৩৬.৪

চারা রোয়ার পর চাপান হিসাবে সার যদি সরাসরি জলের উপর ছিটিয়ে দেওয়া হয় তাহলে শুধু শুকনো জমির উপরে প্রয়োগ করলে যেমন নষ্ট হয় তেমনি নষ্টই হবে। যেসব জায়গায় জল বের করে দেওয়ার পর আবার জমিতে জল ঢোকানোর মত সুবিধা রয়েছে সেখানে সার প্রয়োগ করার আগে জল বের করে দিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে এবং সংগে সংগে মাটির সংগে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের একদিন পর আবার জল ঢুকিয়ে দিতে হবে। এ অবস্থায় নষ্টের সম্ভাবনা কম থাকে। অবশ্য প্রথমের দিকে অর্থাৎ গাছ বড় হওয়ার আগে এইভাবে সার মাটিতে মেশানো সম্ভব হয়। গাছের বৃদ্ধি খুব বেশী হলে এভাবে সার প্রয়োগ করতে অসুবিধা দেখা দেয়।

যেখানে জল বের করা এবং পুনরায় জল ঢোকানোর সুবিধা নেই বা মাঠে অনেক বেশী জল জমে থাকে সেখানে চাপান হিসাবে সার ব্যবহারের খুব সমস্যা দেখা দেয়। এ অবস্থায় নাইট্রোজেনের অপচয় রোধ করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির ব্যবহার করা যায়।

- ভেজা মাটির সংগে ইউরিয়া মিশিয়ে মাটির দলা বা বল (Mud ball) করে এই ছোট ছোট বল ৪টি গোছের (Hill) মাঝের জায়গায় পুঁতে দিতে হয়। এক্ষেত্রে ৬০০ গ্রাম মাটির সংগে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া মেশানো বিধেয়।
- ইউরিয়া সার সরাসরি মাঠে না দিয়ে ভেজা মাটির সংগে মিশিয়ে দুই থেকে তিন দিন রেখে দিতে হবে তারপর মাঠে ছড়ানো বিধেয়। এক্ষেত্রেও ঐ একই পরিমাণ মাটির সংগে ইউরিয়া (৬ : ১) মেশাতে হবে।

- এছাড়া ইউরিয়াকে জলে মিশিয়ে স্প্রেয়ারের সাহায্যে স্প্রে করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মিশ্রণের পরিমাণ হবে ২ থেকে ৩ শতাংশ যদি সাধারণ স্প্রেয়ারের সাহায্যে স্প্রে করা হয় কিন্তু পাওয়ার স্প্রেয়ার ব্যবহার করলে ঐ দ্রবণ হবে ১০ থেকে ১১ শতাংশ)।
- নাইট্রোজেন যে পরিমাণ মাটিতে প্রয়োগ করা হয় তার খুব বেশী হলে ৪০ শতাংশ বা তারও কম পরিমাণ গাছের খাদ্য হিসাবে কাজে লাগে। সেগুলি তাড়াতাড়ি জলে মিশে যায় এবং তারপর হয় চুঁইয়ে না হয় উদ্‌বায়ী হয়ে নষ্ট হয়। বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, যে ইউরিয়া ব্যবহার করা হয় তা যদি তাড়াতাড়ি দ্রবীভূত না হয়ে ধীরে ধীরে জলের সংগে মিশে তাহলে গাছ সেগুলিকে বেশীমাত্রায় নিতে পারবে। এই ধারনার উপর ভিত্তি করে কিছু কিছু সার এখন বেরিয়েছে যেমন আইসো বিউটিলিডিন ডাই ইউরিয়া (৩০ শতাংশ নাইট্রোজেন), সালফার ঢাকা ইউরিয়া (৩৬ শতাংশ নাইট্রোজেন), লাক্ষা দিয়ে ঘেরা ইউরিয়া, নিম খইল ঢাকা ইউরিয়া ইত্যাদি এগুলি মাটিতে প্রয়োগ করলে খাদ্যোপাদান ধীরে ধীরে গাছের গ্রহণযোগ্য হয় এবং নাইট্রোজেন কম নষ্ট হয়।
- অপরদিকে এন-সারভ (N-serve), এ-এম (AM) ইত্যাদি কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে যেগুলি সারের সংগে মিশিয়ে মাঠে প্রয়োগ করলে মাটিতে ডিনাইট্রিফিকেশন হতে বাধা দেয়। ফলে নাইট্রোজেনের নষ্ট কম হয়।

আগে যে নিম খইল ঢাকা ইউরিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি কৃষক নিজে থেকে তৈরী করতে পারে। এক্ষেত্রে ৫০০ গ্রাম আলকাতরা, একলিটার কেরোসিন তেল, ২০ কেজি নিমের খইল দরকার হয় ১০০ কেজি ইউরিয়ার সারের সংগে মেশাবার জন্য। বর্তমানে কয়লার সার (soluble coal fertilizer) যেমন এ্যামোনিয়াম পলিকারবোক্সিলেট (AMP-14.6% নাইট্রোজেন), কম্পোজিট এ্যামোনিয়াম পলিকারবোক্সিলেট (CAMP-14.5% নাইট্রোজেন) ইত্যাদি ব্যবহার করলে খাদ্যোপাদান ধিরে ধীরে গাছের গ্রহণীয় অবস্থায় আসে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এছাড়া সর্বভারতীয় ধান্য উন্নয়ন প্রকল্পের (খরিফ ১৯৮০) পরীক্ষায় দেখিয়েছে ইউরিয়া ব্রিকেট বা বড় দানা (Super granule) ইউরিয়া ধানের মাঠে ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া গেছে। বড় দানা ইউরিয়া একটি একটি করে

ধানের মাঠে ফেলার সংগে সংগে পা দিয়ে চেপে দিতে হয়। ফলে দানাটি মাটির বিজারণ স্তরে গিয়ে দ্রবীভূত হয়। ঐ স্তরে গিয়ে দ্রবীভূত হয় বলে নাইট্রোজেন চুঁইয়ে বা উদ্‌বায়ী হয়ে অপচয় কম হয় (বার্ষিক রিপোর্ট, আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৭৯)।

নাইট্রোজেন প্রয়োগের সময় (Timing of nitrogen application)

আজকের দিনে নাইট্রোজেন সার গাছের বৃদ্ধির ঠিক কোন সময়ে দিতে হবে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার দরকার হয়। আগে দেশী জাতের ধানে ভাগে ভাগে সার দেওয়ার কথা বলা হত কারণ এক সময়ে দিলে গাছের বৃদ্ধি বেশী হওয়ার ফলে গাছ শুয়ে পড়ার প্রবণতা বেশী দেখা দিত। কিন্তু এখন অধিক ফলনশীল ও নাইট্রোজেন প্রয়োগে সাড়া দেয় এমন বেঁটে জাতের বেলায় ঐ কথা যদিও বা খাটে না তথাপি এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কারণ গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্বে সার প্রয়োগ করলে ভিন্নরকমের ফলাফল দেখা যায়। তা নীচে দেখানো হলো

- যদি বেশ আগে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা হয় তাহলে পাশকাঠি তাড়াতাড়ি বেরুতে সাহায্য করে
- দেরীতে নাইট্রোজেন ব্যবহার করলে পাশকাঠি বাড়ে না। তবে ধানের ফলন বাড়ায় ও শীষের ওজন বাড়ায়
- গাছের থোড় আসার সময় ব্যবহার করলে গাছ লম্বায় বাড়ে ও সেই সংগে শীষে দানার সংখ্যা ও ১০০০ দানার ওজন বাড়ায়। তবে এ ধরনের বাড়াটা কতটা পরিমাণ নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হবে তার উপর কিছুটা নির্ভর করবে।
- দেরীতে বিশেষ করে থোড়ের সময় বা তার কিছু আগে বেশীমাত্রায় সার ব্যবহার করলে দানায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ায়। এইটিই দানার প্রোটিন বাড়ানোর কারণ হিসাবে ধরে নেওয়াটা ঠিক হবে না। অন্য কারণও এর সংগে যুক্ত থাকে।
- খরিফ মরসুমে পাতায় যে ধসা রোগ দেখা যায় তার একটা কারণ হিসাবে বলা হয় নাইট্রোজেন সারের বেশী মাত্রায় প্রয়োগ। সেজন্য দফে দফে ব্যবহার করলে এর প্রকোপ কিছুটা কম হয়।

তবে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের ঠিক সময় ও তার মাত্রা বেশ কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন

- কোন ধরনের মাটি হবে
- আবহাওয়ার অবস্থা কিরূপ থাকবে
- মাঠে জলের ব্যবহার কি ধরণের হবে
- কিভাবে সার ব্যবহার করা হবে
- কোন জাতের ধান চাষ হবে ও তার বৃদ্ধির পর্ব কিরূপ ইত্যাদি

সমস্ত বিষয়গুলিকে মিলিয়ে (টেন হাভে, ১৯৭১) নিম্নলিখিতভাবে পথ নির্দেশ করা হয়।

- যেখানে যেকোন সময় মাঠ থেকে জল বের করানো বা ঢোকানো একটা সমস্যা নয় সেখানে বীজ বোনা বা রোয়ার পর থেকে থোড় আসার (চিত্র ১২খ) সময়ের মধ্যে প্রতি ২.৫ থেকে ৩ সপ্তাহ অন্তর সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। মোট সারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে প্রত্যেকবারে হেক্টার প্রতি ২০ থেকে ৩০ কেজির মত নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- যেসব মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম থাকে সেখানে তুলনামূলক ভাবে মূলসার হিসাবে রোয়ার সময় বেশী সার প্রয়োগ করা ভাল। যেখানে মাটিতে পরিমিত নাইট্রোজেন সার রয়েছে যেসব জায়গায় চাপান সারের উপর নজর দিতে হবে।
- যেসব মাটিতে সার ব্যবহার করার পর চুঁইয়ে কিছুটা নষ্ট হয় এবং মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম থাকে সেখানে ঘন ঘন নাইট্রোজেন সার চাপান হিসাবে দেওয়া উচিত।
- জলদি জাতের ধানে বা যে ধানের পাশকাঠি কম হয় তাদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির প্রথমের দিকে তুলনামূলকভাবে বেশী নাইট্রোজেন দেওয়ার দরকার।
- নাবি জাতের ধানে অথবা যেসব জাত ঠাণ্ডার জন্য প্রথমের দিকে বৃদ্ধি কম হয় সেখানে চাপান সার প্রয়োগের দিকে সচেষ্ট হতে হবে।
- যেসব ধানে সামান্যতে ধসা রোগ হয় সেখানে চাপান হিসাবে প্রতিবারে খুব কম মাত্রায় সার ব্যবহার করা উচিত।

- অঙ্কুরিত ধান ছিটিয়ে বোনা হলে প্রথমের দিকে কম সার দিয়ে পরে চাপান বেশী দেওয়া ভাল। এর ফলে নাইট্রোজেন কম নষ্ট হয় ও আগাছার উপদ্রব কম হয়। এছাড়া প্রথমে বেশী সার দিলে শেওলার বৃদ্ধি বেশী হয়।
- যেখানে বেশী বয়সের চারা রোয়া হয় সেখানে মূলসার হিসাবে বেশী নাইট্রোজেন ব্যবহার করার প্রয়োজন। কিন্তু ছোট বয়সের চারা (দেপক পদ্ধতিতে যেমন ১২-১৪ দিন বয়সের চারা) রোয়া করা হলে মূলসার কম দেওয়া বাঞ্ছনীয়।
- বেশী জলে ধানের চাষ (Deep water rice) করতে হলে মূলসার বেশী পরিমাণে দেওয়ার কথা ভাবা উচিত (কোন সময়ে হেক্টার প্রতি ৪০ কেজির বেশী হবে না)।
- বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল ধানে মূলসার বেশী করে দিতে হবে ও পরে এক বা দুবার চাপান হিসাবে দিলে চলবে। তবে বৃষ্টির দিনগুলি দেখে প্রয়োগ করতে পারলে ভাল।

ফসফরাস

গাছের বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য নাইট্রোজেনের মত ফসফরাসেরও প্রয়োজন রয়েছে তবে নাইট্রোজেন প্রয়োগে যে ধরনের ফল চোখে ধরা পড়ে ঠিক ততটা এর জন্য দেখা যায় না। তার উপর উঁচু জমিতে যে ধানের চাষ হয় সেখানে ফসফরাসের ফলাফল দেখা গেলেও জলা, রোয়া জায়গার ধানে এর কাজ তেমন দেখতে পাওয়া যায় না। যে কারণের জন্য এরূপটি হয় তা আগে বলা হয়েছে। ফসফরাস বিশেষ করে বিয়ান ছাড়ার সময় ও থোড় আসা থেকে ফুল ফোটা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে খুব প্রয়োজন দেখা দেয়। আবার খরিফ মরসুমের থেকে বোরো ধানে এর ব্যবহার বেশী পাওয়া যায় কারণ দেখা গেছে ঠাণ্ডা সময়ে ফসফরাস দিলে গাছে তাড়াতাড়ি পাশকাঠি বেরুতে সাহায্য করে এবং সেই পাশকাঠির বেশীর ভাগেতে শীষ হয়। এ ছাড়া বেশী জলের ধান চাষে ফসফরাস দিলে গাছে তাড়াতাড়ি পাশকাঠি দেখা যায়।

বর্তমানে অনেক বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে আমন ধানে ফসফরাস ব্যবহার না করে তার আগের ফসলে ব্যবহার করলে ধানে তার উপকার বেশী পাওয়া যায়। তার কারণ আগের ফসলে যে ফসফরাস ব্যবহার হয় না জলা-জমিতে তা গ্রহণীয় অবস্থায় আসে ও ধান তা ব্যবহার করে।

ফসফরাসের উৎস হিসাবে সুপার ফসফেট অন্য যে কোন ফসফেট ঘটিত সারের থেকে ভাল। তবে মাটি অম্ল প্রকৃতির হলে রকফসফেট বা হাড়ের গুঁড়া সুপার-ফসফেটের থেকে ভাল ফল দেয়। এছাড়া এ্যামোনিয়েটেড ফসফেট নাইট্রোফসফেট, বেসিকস্ল্যাগ ইত্যাদি থেকেও ফসফেট পাওয়া যায়। এগুলি অনেক সময় ভাল ফল দিতে দেখা গেছে।

ফসফরাস প্রয়োগের সময় ও বিধি

ফসফরাস সাধারণতঃ মূল সার হিসাবে শেষ চাষের আসে অথবা জমি কাদা করার সময় অথবা বীজ বোনা বা রোয়ার আগে সমান ভাবে ছিটিয়ে দিয়ে চাষ দিয়ে দিলে সব থেকে ভাল ফল পাওয়া যায়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রয়োগের মধ্যে সুস্পষ্ট সুফল দেখা যায় না। বেশী গভীরে প্রয়োগে কোন লাভ হয় না। চাপান হিসাবে পাশকাঠি বের হওয়ার সময় ব্যবহারের কথা অনেকে বলে থাকলেও মূলসার হিসাবে ব্যবহার করলে অনেক ভাল কাজ দেয়। যে সব মাটিতে ফসফরাসের অভাব রয়েছে সে সব জায়গায় সুপার ফসফেট, জল, মাটি ও গোবর মিশিয়ে একটি দ্রবণ করার পর তাতে রোয়ার আগে চারার শিকড় ডুবিয়ে রেখে তার কিছুক্ষণ পর রোয়া করে অনেকে উৎসাহজনক ফলাফল পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। এই দ্রবণ তৈরী করার জন্য সুপার ফসফেট, মাটি ও জলের অনুপাত ১ : ৩·৫ : ৫ দেওয়া হয়। এই দ্রবণ ব্যবহার করার এক ঘণ্টা আগে তৈরী করতে হবে এবং শিকড় ভালভাবে ডোবানোর পর রোয়া করতে হবে।

পটাসিয়াম

নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের মত পটাসিয়াম প্রয়োগের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে পটাশিয়ামের মাত্রা বেশী আছে বলে অনেক সময় এর ব্যবহারের ফলাফল ভালভাবে বোঝা যায় না। গাছ মাটি থেকে পটাসিয়াম শুষে নেয়। তবে গাছ কতটা নিতে পারবে তার পরিমাণ নির্ভর করবে জমিতে গাছের শিকড়ের কাছাকাছি পটাসিয়ামের ঘনত্ব, মাটিতে সংযোজিত পটাসিয়ামের বিযুক্তি, শিকড়ের কাছাকাছি পটাসিয়ামের অবস্থান এবং গাছের শিকড়ের বিস্তারের উপর।

পটাসিয়ামের উৎস—

পটাসিয়ামের উৎস হিসাবে মিউরিয়েট অফ পটাস (KCl) ও সালফেট অফ পটাসের (K_2SO_4) ব্যবহার বেশী। মিউরিয়েট অফ পটাসের ব্যবহার

কিছুটা বেশী হয় দাম কমের জন্য। কিন্তু চুনা মাটিতে যেখানে পি এইচ বেশী সেখানে সালফেট অফ পটাসের ব্যবহার বেশী হয়।

পটাসিয়াম ব্যবহারের সময় ও বিধি

পটাসিয়াম বিশেষ করে মূলসার হিসাবে শেষ চাষের আগে প্রয়োগ করে চাষ দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে চাপান হিসাবে প্রয়োগ করে ভাল ফল কেউ কেউ পেয়েছেন। তবে যে সব মাটিতে পটাসিয়ামের অভাব রয়েছে বা পাহাড়ী এলাকার জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে। এছাড়া হালকা ধরণের মাটিতে বা নীচু ও নোনা জমিতে পটাসিয়াম সার ভাগে ভাগে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। পটাসিয়াম ব্যবহারে যেমন ফলন বাড়ে তেমনি কিছু কিছু রোগের প্রকোপ কম হয়। পটাসিয়াম ব্যবহারের পরিমাণ (১৪০ এবং ১৪১ পৃষ্ঠায়) দেখানো হল।

বিজ্ঞানী নেগুচি (১৯৫৪) দেখিয়েছেন যে যদি সূর্যালোক কম থাকে তাহলে পটাসিয়ামের দ্বারা কার্বন-ডাই অক্সাইড সংশ্লেষ বৃদ্ধি পায়। তার মানে সূর্যালোক কম হওয়ার জন্য (বর্ষাকালে এ ঘটনা খুব ঘটে) যেখানে ফলন কম হয় সেখানে অনেক সময় পটাশিয়াম বেশী প্রয়োগ করলে ফলন অনেকটা বেশী পাওয়া যায়।

নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের সুষম হারে প্রয়োগ

অনেক সময় একই জমিতে বিভিন্ন ধরণের ফসল চাষের ফলে কোন কোন খাদ্যোপাদান বেশী বা কম হারে অপসারণ হয়। এছাড়া ভাল ফলন পেতে গেলে সবসময় সুষম হারে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম সার ব্যবহার করা উচিত। যদি কোন একটি উপাদান কম বা বেশী মাত্রায় ব্যবহার করা হয় তাহলে মাটিতে খাদ্যোপাদানের সমতা থাকে না। তার ফলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম বিভিন্ন মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সুষমহারে প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে তা ১৪০ এবং ১৪১ পৃষ্ঠায় দেখানো হল।

অনুখাদ্য (Micronutrients)—অনুখাদ্য বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে আলোচনা করা হয়েছে (১১৯ থেকে ১২৫ পৃষ্ঠায় আছে)

ধান উৎপাদনে জৈব সারের কার্যকারিতা

জৈব সার প্রয়োগে মাটির ভৌত ধর্মের উন্নতি হয় এবং মাটির উর্বরতা

শক্তি বৃদ্ধি পায়। ধানের জমিতে জৈব সার প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেক কাজ হয়েছে। বিশেষ করে ধানের জমিতে ধইন্চা বা শণের ব্যবহার নিয়ে। মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রাক মৌসুমী বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে ধইন্চার বীজ বুনতে হবে এবং গাছ যখন বেড়ে উঠবে ধান রোয়ার প্রায় এক মাস আগে লাঙ্গল ও মই দিয়ে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। ঐ সবুজ সার যখন পচে উঠবে তখন জমি কাদা করে রোয়া হয়। যেখানে সারা বছরে মাঠে একটি মাত্র ফসল হিসাবে আমন মরসুমে ধান চাষ হয় সেখানে এ পদ্ধতিতে সবুজ সার যোগ করা সম্ভব হয়। কিন্তু যেখানে নিবিড় শস্য পর্যায়ে চাষাবাদ হয়ে থাকে সেখানে কৃষক ধইন্চা লাগিয়ে একটি শস্যঋতু নষ্ট করতে চাইবে না। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে জৈব পদার্থের জন্য গোবর সার, কম্পোষ্ট, স্পেন্টহপ, সবুজ কলমী-পাতা (*Ipomea* Sp) ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারা যায়। এই সব জৈব পদার্থ চারা রোয়ার ১৫ থেকে ২১ দিন আগে মাঠে প্রয়োগ করে ভালভাবে লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি করে লাঙ্গল ও মই দিয়ে মাঠে জল ভরে দিতে হবে। জৈব সার ব্যবহার করার ঠিক পরে পরেই রোয়া উচিত হবে না কারণ ঐগুলি পচনকালে অনেক ক্ষতিকারক পদার্থ তৈরী হয় যেমন বিভিন্ন প্রকারের জৈবিক অম্ল, মিথেন গ্যাস এবং ফেনলিক পদার্থ ইত্যাদি। এর ফলে চারার ক্ষতি হয়।

এখন জৈবিকসার (bio-fertilizer) হিসাবে এ্যাজোলা ও সবুজ শ্যাওলা ধানের মাঠে ব্যাপকহারে ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে। এগুলির ব্যবহার এখনও সীমিতভাবে পরীক্ষা আকারে রয়েছে। এগুলির মধ্যে এ্যাজোলা একটি ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ যার পাতাতে এ্যানাবিনা এ্যাজোলী (*Anabaena azollea*) নামে সবুজ শ্যাওলা থাকে। এগুলি আবহাওয়ামণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে। এই এ্যাজোলা প্রথমে ছোট্ট বাঁধানো চৌবাচ্চায় করে বাড়ানো হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটার জায়গার জন্য এ্যাজোলা ০.২ থেকে ০.৪ কেজি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সংগে সুপার ফসফেট হেক্টর প্রতি ৪ থেকে ২০ কেজি মিশিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনবোধে কেজি প্রতি ১ গ্রাম হারে ফুরাডন মিশিয়ে দিতে পারলে পোকার হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে। এইভাবে এক সপ্তাহ ধরে রেখে দিলে একটি এ্যাজোলার স্তর তৈরী হবে এবং সেটিকে তখন তুলে প্রধান ধানের জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। এই ভাবে ক্রমান্বয়ে পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব। প্রধান জমিতে চারা রোয়ার কমপক্ষে ৮—১০ দিন আগে প্রয়োগ করতে হবে এবং ভালভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। এক হেক্টার জমিতে একস্তর এ্যাজোলা প্রায় দশ টন সবুজ পদার্থ

সরবরাহ করে এবং তা থেকে হেক্টার প্রতি ২৫—৩০ কেজি নাইট্রোজেন পাওয়া সম্ভব হয়। এর সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে আবহাওয়া, মাটি ও পরিচর্যা পদ্ধতির উপর।

একই ভাবে সবুজ শ্যাওলা (Blue green algae)-কেও অন্যত্র বাড়িয়ে নিয়ে প্রধান জমিতে ব্যবহার করা হয় এবং জমিতে নাইট্রোজেন সরবরাহ করতে সাহায্য করে। তবে এর ব্যবহারও আগের মত আবহাওয়া, মাটি ও পরিচর্যা পদ্ধতির উপর নির্ভর করে।

মাটির উদ্ভিদ খাদ্যের মান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ায় যে পরিমাণ উদ্ভিদ-খাদ্যের সুপারিশ হয় তা দেখানো হল (হেক্টার প্রতি কেজি)

[বিঃ দ্রঃ জৈবসার ব্যবহার করতে পারলে প্রতি টন জৈব সারের জন্য ২.৫ কেজি নাইট্রোজেন ৩২.৫ কেজি ফসফরাস প্রস্তাবিত পরিমাণের থেকে কম দেওয়া যেতে পারে]*

উর্বতার মান	নাই-ট্রোজেন	ফস-ফেট	পটাশ	প্রয়োগ বিধি (সবক্ষেত্রে ফসফেট ও পটাস মূল সার হিসাবে ব্যবহার করতে হবে)
(ক) অধিক ফলনশীল, জলদি জাত, বোনা আউস, প্রাক খরিফ মরসুমে				
অতি উচ্চ	১০	০	০	মূলসার হিসাবে নাইট্রোজেনের দরকার নেই ; চাপানসার—নাইট্রোজেন বীজের অঙ্কুরোদগমের ২ সপ্তাহ পরে অথবা নিড়ানীর পর ১/৩ অংশ এবং ২-৩ সপ্তাহ অন্তর দুই ভাগে।
উচ্চ	২০	২০	২০	
মধ্যম	৩০	২৫	২৫	
মধ্যনিম্ন	৪০	৩০	৩০	
নিম্ন	৫০	৪০	৪০	
অতিনিম্ন	৬০	৫০	৫০	
(খ) অধিক ফলনশীল, জলদি জাত ও মাসুরী, খরিফ মরসুমে, রোয়া হিসাবে				
অতি উচ্চ	৪০	০	০	মূলসার—নাইট্রোজেনের দরকার নাই চাপানসার—রোয়ার ১৫ দিন পরে ২/৩ অংশ রোয়ার ৪৫ দিন পরে ১/৩ অংশ
উচ্চ	৪৫	২০	২০	
মধ্যম	৫০	২৫	২৫	মূলসার—নাইট্রোজেন ১/৪ অংশ চাপানসার—রোয়ার ১৫ দিন পরে ১/২ অংশ রোয়ার ৪৫ দিন পরে ১/৪ অংশ মাসুরীর জন্য রোয়ার ৬০ দিন পরে ১/৪ অংশ
মধ্যনিম্ন	৬০	৩০	৩০	
নিম্ন	৭০	৪০	৪০	
অতিনিম্ন	৮০	৫০	৫০	

* পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন সংস্থার সারগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

উর্বরতার মান	নাই-ট্রোজেন	ফস-ফেট	পটাশ	প্রয়োগ বিধি
(গ) অধিক ফলনশীল, মাঝারি নাবিজাতের, খরিফ মরসুমে রোয়া করে।				
অতি উচ্চ	৪০	০	০	মূলসার—নাইট্রোজেনের প্রয়োজন নেই চাপানসার—রোয়ার ২০ দিন পরে ১/৩ অংশ রোয়ার ৫৫ দিন পরে ২/৩ অংশ
উচ্চ	৫০	২০	২০	
মধ্যম	৬০	৩০	৩০	মূলসার—নাইট্রোজেন ১/৪ অংশ চাপানসার—রোয়ার ২০ দিন পরে ১/২ অংশ —রোয়ার ৫৫ দিন পরে ১/৪ অংশ
মধ্যনিম্ন	৭০	৪০	৪০	
নিম্ন	৮০	৫০	৫০	
অতিনিম্ন	৯০	৬০	৬০	
(ঘ) অধিক ফলনশীল, মধ্যদীর্ঘ মেয়াদী জাত, বোরো মরসুমের জন্য রোয়া করে				
অতি উচ্চ	৭০	৩০	৩০	মূলসার—নাইট্রোজেন ১/৪ অংশ চাপানসার—রোয়ার ২৫ দিন পরে ১/২ অংশ —রোয়ার ৬০ দিন পরে ১/৪ অংশ
উচ্চ	৯০	৪০	৪০	
মধ্যম	১০০	৫০	৫০	
মধ্যনিম্ন	১১০	৬০	৬০	
নিম্ন	১২০	৭০	৭০	
অতিনিম্ন	১৪০	৮০	৮০	
(ঙ) অধিক ফলনশীল, জলদি জাত, বোরোতে, রোয়া অবস্থায়				
অতি উচ্চ	৪০	০	০	মূলসার—নাইট্রোজেন ১/৪ অংশ চাপানসার—রোয়ার ২৫ দিন পরে ১/২ অংশ রোয়ার ৫৫ দিন পরে ১/৪ অংশ
উচ্চ	৫০	২০	২০	
মধ্যম	৬০	৩০	৩০	
মধ্যনিম্ন	৭০	৪০	৪০	
নিম্ন	৮০	৫০	৫০	
অতিনিম্ন	১০০	৬০	৬০	
(চ) স্থানীয় আমন ধানের জাত (নাগরা, ভাসামানিক, রঘুশাল ইত্যাদি) খরিফে				
অতি উচ্চ	১০	০	০	নাইট্রোজেন মূলসার ও চাপান সার ফসলের অবস্থা অনুযায়ী দিতে হবে।
উচ্চ	২০	০	০	
মধ্যম	২৫	১৫	১৫	মূলসার—১/৪ অংশ চাপানসার—রোয়ার ১৫ দিন পরে ১/২ অংশ রোয়ার ৬০ দিন পরে ১/৪ অংশ
মধ্যনিম্ন	৩০	১৫	১৫	
নিম্ন	৩৫	২০	২০	
অতিনিম্ন	৪০	২০	২০	

মাটির উর্বরতার মান

উর্বরতার মান	জৈবকার্বন (শতকরা হিসাব)	গ্রহণযোগ্য ফসফেট (হেক্টার প্রতি কেজি)	গ্রহণযোগ্য পটাশ (হেক্টার প্রতি কেজি)
অতি উচ্চ	১.০০-এর উপরে	১১৫-এর উপরে	৩৬০-এর উপরে
উচ্চ	০.৮১—১.০০	৯৩—১১৫	৩০১—৩৬০
মধ্যম	০.৬১—০.৮০	৭১— ৯২	২৪১—৩০০
মধ্যনিম্ন	০.৪১—০.৬০	৪৬— ৭০	১৮১—২৪০
নিম্ন	০.২১—০.৪০	২৩— ৪৫	১২১—১৮০
অতিনিম্ন	০.০০—০.২০	০— ২২	০—১২৫

সারাংশ

বর্তমানে অধিক ফলনশীল ধান চাষের ফলে সার প্রয়োগের গুরুত্ব বেশী-ভাবে অনুভূত হয়েছে কারণ এগুলি অনুকূল পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সংগে সঠিক ভাবে প্রয়োগ করতে পারলে আশাতীত ফলন পাওয়া যেতে পারে। একই ভাবে দেখা যায় অনেক সময় সুফল ঠিক ঠিক মত পাওয়া যায় না। সে সব জায়গায় ভালভাবে খতিয়ে দেখলে দেখা যায় ঠিক ঠিক নিয়ম মেনে সুষমহারে সার প্রয়োগ করা হয় নি। তাই প্রতিটি পদক্ষেপ ভালভাবে বিচার করে তবে হাত দিতে হবে। নাইট্রোজেন ছাড়া ফসফরাস ও পটাসিয়াম ঘটিত সারের বাচ-বিচার বেশী নেই। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মূলসার হিসাবে প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। এই কারনে নাইট্রোজেন সারের মাত্রা, প্রয়োগ বিধি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া কিছু অনুখাদ্যের অভাব বিশেষ করে দস্তার অভাব পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় তাই সে বিষয়েও আলোচনা করা গেল। জৈব সারের সংগে অজৈব সার মিশিয়ে ব্যবহার করলে সব থেকে বেশী লাভের আশা থাকে। এখনো পর্য্যন্ত যে সব কৃষি-পণ্ডিত বলে সম্মানিত হয়েছেন তাদের সবাই এ কথাটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে কৃতকার্য্য হয়েছেন। এই বিষয়েও সামান্য বলা হয়েছে।

অধ্যায় দশ

ধানে জলের প্রয়োজন ও সুষ্ঠু ব্যবহার

(Requirement and Proper Use of Water in Rice)

অধ্যায় দশ

ধানে জলের প্রয়োজন ও সুষ্ঠু ব্যবহার

আমাদের দেশে ৩৯০ লক্ষ হেক্টার জমি সেচের আওতায় রয়েছে। এর মধ্যে দানা শস্যের চাষ হয় ২৭০ লক্ষ হেক্টার জমিতে অর্থাৎ তা প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ। এই ২৭০ লক্ষ হেক্টারের মধ্যে প্রায় ১৪০ লক্ষ হেক্টারে ধানের চাষ হয় (শতকরা হিসাবে প্রায় ৩৭ ভাগ)। যদিও বা বলা যায় মোট সেচ ব্যবস্থার প্রায় ৪৫ শতাংশ ধান চাষের জন্য লাগে। যে কোন দানা শস্যের থেকে নিঃসন্দেহে বেশী তথাপি মোট ধান চাষের জমির তুলনায় তা মাত্র ৩৮ শতাংশ। অন্যভাবে বলতে গেলে প্রায় ৬২ শতাংশ জমিতে ধানের চাষ বৃষ্টির উপর নির্ভর করেই হয়।

পশ্চিমবঙ্গের হিসাবে ২১ লক্ষ হেক্টার জমিতে সেচের সুবিধা রয়েছে অর্থাৎ মোট চাষযোগ্য জমির মাত্র ২৮ শতাংশ। এর মধ্যে ১৭২ লক্ষ হেক্টার জমিতে ধান চাষ হয়। যদিও বা সেচের বেশীর ভাগ অংশ (মোট সেচের ৭৬%) ধান চাষের জন্য লাগে তথাপি প্রায় ৭২ শতাংশ জমির ধানের চাষ বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল। এই সেচের জল চারটি উৎস থেকে আসে যেমন অগভীর বা গভীর নলকূপ, পুকুর বা ডোবা, সেচ খাল এবং নদীর জল থেকে। এই চারটি উৎসের মধ্যে সেচ খাল দ্বারা ৮·২ (৪৭·৭%), নদীর জল দ্বারা ১·৫ (৮·৭৮%), নলকূপ দিয়ে ৪·৫ (২৬·২%) এবং পুকুর, ডোবা ইত্যাদির জল দিয়ে ০·৩০ (১৭·৪৪) লক্ষ হেক্টারে চাষ হয়।

ধানে জলের প্রয়োজন কেন ?

জল ছাড়া গাছের জীবন অচল। গাছের বিভিন্ন জাতি, তার গঠন এবং বয়সকালের উপর জলের প্রয়োজন কত হবে অনেকটা নির্ভর করে। গাছ মাটি থেকে শিকড়ের সাহায্যে জল নিয়ে থাকে। গাছ যে পরিমাণ জল গ্রহণ করে তার মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ জল তার নিজের প্রয়োজনে লাগে বাদ-বাকি বাষ্পমোচনের দ্বারা নষ্ট হয়।

বিজ্ঞানী ক্যামার (১৯৬৯) গাছের জলের কার্যকারিতা সম্বন্ধে যা বলেছেন তা হলো এই—

- উদ্ভিদ কোষে প্রোটোপ্লাজমের এক বিশেষ উপাদান হল জল
- গাছে রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য জল একটি ক্রিয়াত্মক হিসাবে ব্যবহৃত হয়
- গাছের মধ্যে জৈব, অজৈব দ্রবণ সংবহক হিসাবে কাজ করে
- পরোক্ষভাবে গাছের যান্ত্রিক শক্তি হিসাবে কাজ করে।

পরিমিত জল সরবরাহ ধান উৎপাদনে অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধান গাছ হয় খুব বেশী বা খুব কম জলের জন্য ভোগে। অনিয়মিত বৃষ্টি অথবা জমির অবস্থানের জন্য এরূপটি হয়।

জলের সুবন্দোবস্তের ফলে জলের সদ্ব্যবহার হয় ও তার ফলে শস্যের ফলন যথাযথ হয়। শুধু তাই নয় জলের সরবরাহ কম থাকলে তারও প্রকৃত ব্যবহার হয়।

জমি জলে ডুবিয়ে দেওয়ার ফলাফল

ধানের জমি জলে ডুবে থাকলে গাছের বৃদ্ধি ভালভাবে হয় ফলে ফলনও ভাল হয়। তাহলে ধান গাছের ভৌত গুণাগুণ, খাদ্যোপাদানের সরবরাহ, মাটির ভৌত অবস্থা ও আগাছার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করে।

ধানগাছের ভৌত গুণাগুণ—

গাছের উচ্চতা সরাসরিভাবে মাঠের জলের গভীরতার উপর নির্ভর করে। আর পাশকাঠির সংখ্যা অন্ততপক্ষে কিছুদূর পর্যন্ত, বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত।

গাছ যত লম্বায় বাড়বে কাণ্ডের শক্তিও কমতে থাকবে অর্থাৎ জলের গভীরতা বাড়ার সংগে সংগে কাণ্ডের শক্তিও কমতে থাকবে। পরীক্ষায় দেখা যায় যে প্রাথমিক স্তরে গাছের বৃদ্ধি জল জমা জমির থেকে জল না জমা

জমিতে বেশী হয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে বিপরীত ফলাফল ফলতে দেখা যায়।

জল জমা জমিতে খাদ্যোপাদানের অবস্থা ও মাটির ভৌত গুণাগুণ—

জল জমা ধানের জমির একটি সুবিধা হল অনেকগুলি খাদ্যোপাদান বিশেষ করে ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, সিলিকন এবং আয়রণের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়। কিন্তু মাটি যদি হালকা প্রকৃতির হয় তাহলে খাদ্যোপাদানগুলি শিকড়ের অঞ্চল থেকে চুঁইয়ে নিচে চলে যাবে।

মাটিতে ক্ষতিকারক পদার্থের উদ্ভব—

মাটিতে জল জমলে আয়রণ ও ম্যাঙ্গানিজের রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন ধরণের জৈব অম্ল যেমন এ্যাসেটিক ও বিউটেরিক এ্যাসিড এবং গ্যাসের মধ্যে কার্বন-ডাই অক্সাইড মিথেন এবং হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি তৈরী হয়। অন্য সবের মধ্যে বিশেষ করে মিথেন যখন বেশি পরিমাণে থাকবে তখন শিকড়ের বৃদ্ধি কমে যাবে, গাছের খাদ্যোপাদান গ্রহণ ক্ষমতা কমবে এবং শেষে শিকড় পচা রোগ দেখা যায়। যখন বিশেষ করে অক্সিজেনের অভাব দেখা যায় এবং মাটিতে জৈবপদার্থ বেশী হলে তখন এই সমস্ত ক্ষতিকারক পদার্থ দেখা যায়।

যদি মাঝে মাঝে জমি শুকনো করে দেওয়া যায় তাহলে অক্সিজেন মাটিতে আসতে পারে। অন্য দিকে জল মাটির গভীরে চলে যাওয়ার হার যদি দিনে ২-৩ মিলিমিটারের মত হয় তাহলে এই ক্ষতিকারক পদার্থগুলি কিছুটা দূর করা যেতে পারে।

জলের তাপমাত্রা—

জলের তাপমাত্রা খুব বেশী বা কম উভয়ই গাছের বৃদ্ধি এবং ফলনের পক্ষে ক্ষতিকারক। আই-আর-৮ বা বিভিন্ন ইণ্ডিকা জাতের ক্ষেত্রে ৩০° সেলসিয়াস কোন ক্ষতি করে না। তবে জলের তাপমাত্রা খুব বেশী হলে ফলন ও পাশকাঠির সংখ্যা কমে সেইসংগে চিটে ধান, সিলিকন ও পটাশিয়ামের পরিমাণ বাড়ে। অনেক সময় বাদামী দাগ রোগও হতে দেখা যায়।

একইভাবে জলের তাপমাত্রা কম হলে ইণ্ডিকা ধানে ফলন কম দেয়, পাশকাঠির সংখ্যা কম হয়, পরের দিকে এর জন্য ফুল দেরিতে আসে, শীষ

ছোট হয় এবং চিটের সংখ্যা বেড়ে যায়। খাদ্যোপাদান গ্রহণ করার ক্ষমতাও কমে যায়।

জলের গভীরতা ও আগাছার সংখ্যা

কি ধরণের আগাছা কতখানি হবে তা সরাসরি জলের গভীরতার উপর নির্ভরশীল। আগাছা বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে জলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হলে আগাছা দমন কিছুটা করা সম্ভব। কিন্তু একবার আগাছা ভালভাবে জমিতে বসে গেলে জলের সুবন্দোবস্ত যতই করা হোক না কেন আর এদিয়ে দমন করা সম্ভব নয়। রোয়া ধানের ক্ষেত্রে ঠিক ঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে আগাছা দমন কিছুটা সম্ভব হয়। গাছের বয়সকালের মধ্যে যদি ১৬ সেণ্টিমিটারের মত জল রাখা যায় তাহলে ঘাসজাতীয় আগাছা দমন সহজ হয়। এমনকি সারা সময় ৫ সেণ্টিমিটার জল ধরে রাখলেও ঘাসজাতীয় আগাছা দমন সম্ভব হয়। তবে সারা সময় যদি ১৫ সেণ্টিমিটার জল ধরে রাখা যায় তাহলে মুথাজাতীয় ঘাস নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আর চওড়া পাতার আগাছা বিভিন্ন জলের গভীরতার দ্বারা দমন সব সময় সম্ভব হয় না। এবিষয়ে আগাছা দমন অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

ধানের মাঠে কতভাবে জল নষ্ট হয়?

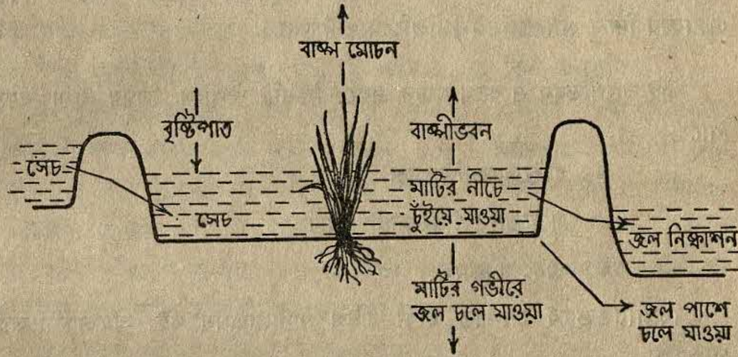
জলের প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন শস্যের বিভিন্ন ধরণের। ধান যেহেতু মাঝারি ধরণের জলজ উদ্ভিদ, এর জলের প্রয়োজন অন্যান্য শস্যের তুলনায় অনেক বেশী। গাছের বাষ্পমোচন, বাষ্পীভবন, মাটির নীচে চুঁইয়ে ও উপর দিয়ে গড়িয়ে যে জল নষ্ট হয় তা পূরোটা পূরণ করতে পারলে তবেই ধানের আশানুরূপ ফলন পাওয়া সম্ভব। সময়মত জল সরবরাহ ধানের বৃদ্ধি ও ফলনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

মাঠ থেকে যে জল নষ্ট হয় তা প্রধানতঃ নিম্নরূপ (চিত্র—২৫ খ)

- তরল থেকে বাষ্প আকারে
  - (ক) পাতার বাষ্প মোচনের জন্য
  - (খ) জলের উপরিতল থেকে বাষ্পীভবনের জন্য
- তরল অবস্থায়
  - (ক) মাটির নীচে সরাসরি জল চুঁইয়ে
  - (খ) মাঠের উপর দিয়ে বা পাশ দিয়ে গড়িয়ে।

বাষ্পীভবন ও বাষ্পমোচন (Evapotranspiration)

বাষ্পমোচন—পাতার পত্ররন্ধ্র দিয়ে জল বাষ্প আকারে বায়ুমণ্ডলীতে মিশে যাওয়াকে বাষ্পমোচন বলে। এই বাষ্পমোচন বিকালের দিকে বেশী হয় এবং সূর্য ওঠার ঠিক আগে সব থেকে কম থাকে। মাটিতে জলের পরিমাণ কতখানি রয়েছে এবং পাতায় কোথায় কত পত্ররন্ধ্র রয়েছে তার উপর বাষ্পমোচন নির্ভর করে।



চিত্র—২৫ (খ): ধানের জন্য কতখানি জলের প্রয়োজন হবে তা ঠিক করতে হলে যে যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করতে হয়।
[উৎস: রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই, ১৯৭০]

বাষ্পীভবন—জলের বা জমির উপরিভাগের তরল থেকে বাষ্প আকারে পরিবর্তিত হওয়াকে বাষ্পীভবন বলে। মাঠে ধানগাছের মধ্যের সারির দূরত্বের উপরও বাষ্পীভবনের পরিমাণ কম বেশী হয়।

এই বাষ্পীভবন ও বাষ্পমোচন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল। যেমন—

- সৌরশক্তি—সৌরশক্তি বেশী থাকলে এগুলি বেশী হবে।
- তাপমাত্রা—তাপমাত্রা বেশী হলে বাষ্পীভবন বেশী হবে।
- বাতাসের গতি—শুকনো হাওয়া বইতে থাকলে রস বেশী শুষে নেবে।
- আর্দ্রতা—আর্দ্রতা (৪০ শতাংশের কম) কম থাকলে এগুলি বেশী হয়।

- গাছের বৈশিষ্ট্য—বাষ্পমোচন ও বাষ্পীভবন বিশেষ করে গাছের বৈশিষ্ট্য যেমন পাতার আকৃতি, শিকড় কত গভীরে গিয়েছে, বয়সকাল কত ইত্যাদির উপর অনেকখানি নির্ভর করে।
- জল ও মাটির পরিমাণ—যদি মাটি সংপৃক্ত থাকে অথবা ডুবে থাকে তাহলে এগুলি বেশী হবে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই বাষ্পীভবন ও বাষ্পমোচনের হার খরিফ মরসুমে দিনে প্রায় ৪ থেকে ৫ মিলিমিটার হয়। শুকনো মরসুমে সেচ সেবিত এলাকায় দিনে ৬ থেকে ৭ মিলিমিটারে দাঁড়ায়।

এই বাষ্পীভবন ও বাষ্পমোচন একত্রে তিনটি উপায়ে নির্ণয় করা যেতে পারে—

- হাইড্রোলোজিক্যাল
- মাইক্রোমেটিরিওলোজিক্যাল
- এমপেরিক্যাল

বিস্তারিতভাবে জানতে হলে 'রাইস প্রোডাকসন' বই আলোচনা করা প্রয়োজন।

মাটির গভীরে যে জল চুঁইয়ে নষ্ট হয় (Percolation loss)

জল মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকলে যে চাপের সৃষ্টি হয় এবং নীচের টানের ফলে সংপৃক্ত মাটি থেকে জলমাটির গভীরে চলে যায়। যেখানের মাটি ভারী প্রকৃতির এবং মাটির নীচের জলের স্তর খুব কাছাকাছি সেখানে এই ধরণের জল নষ্ট কম হয়—দিনে প্রায় ১ মিলিমিটার বা আরো কম হয়। কিন্তু যেখানে মাটি হালকা ধরণের এবং মাটির নীচের জলের স্তর অনেক গভীরে সেখানে এ ধরণের জল নষ্ট খুব বেশি পরিমাণে হয়। দিনে প্রায় ১০ মিলিমিটার বা আরো বেশী। যদি মাটির নীচে জল চুঁইয়ে যাওয়ার গতি খুব বেশী হয় তাহলে সেখানকার মাটিকে সংপৃক্ত রাখা বা জলে ডুবিয়ে রাখা খুব অসুবিধাজনক। মাঠে যদি শস্য থাকে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও বিস্তার কম বা বেশী হলে, মাটি শুকনো হচ্ছে কিনা বা ফেটে যাচ্ছে কিনা, মাটি তাড়াতাড়ি করে জমে যাচ্ছে কিনা, জমিতে জল জমে থাকছে কিনা বা জলের গভীরতা কত, জমি কাদানো আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর মাটির গভীরে জল চলে যাওয়া নির্ভর করে।

মাটির উপর বা পাশ থেকে জল বেরিয়ে নষ্ট হওয়া (Run off and Seepage Loss)

এই ধরণের জল নষ্ট দুভাবে হতে পারে। প্রথমটি যেমন ধানের জমি থেকে পাশে যেখানে ধান নেই এমন জমিতে জল চুঁইয়ে যায় এবং অপরটি যেমন পাশাপাশি ধানের জমিতে জল চলে যায়।

এইভাবে যে জলটি নষ্ট হয় তা মাপা খুব কষ্টকর হয়। কারণ মাটির দানার মাঝের ছিদ্র ছোট বড় বা কম বেশী থাকে, মাটি মাঝে মাঝে শুকনো হতে পারে এমনকি ফেটেও যেতে পারে এবং কোন পরিবেশে সেচ দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ সেচ জমির পাশে কোন উঁচু জমি রয়েছে কিনা ইত্যাদি।

এই দুইভাবে যে জল নষ্ট হয় তা মোটামুটি হিসাবে দেখা গেছে যে পলিমাটি অঞ্চল হলে খরিফ মরসুমে দিনে ০-২ মিলিমিটার এবং শুকনো মরসুমে তা দিনে ২ থেকে ৬ মিলিমিটারে দাঁড়াবে। এই পরিমাণ মোটামুটিভাবে বাষ্পীভবন ও বাষ্পমোচনের মিলিত পরিমাণের প্রায় অর্ধেক। যদি সুবিধাজনক পরিবেশ না থাকে তাহলে উভয় মরসুমেই জল নষ্টের পরিমাণ দিনে প্রায় ২০ মিলিমিটার বা তারও বেশী হতে পারে।

এই ধরণের ক্ষতির পরিমাণ মাপার জন্য চোঙ্গ, ম্যানোমিটার বা ওয়াটার ব্যালান্স পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানতে হলে 'রাইস প্রোডাকসন'-বইটি (পৃঃ ৩১১-৩১২) আলোচনা প্রয়োজন।

মাটির উপরের নালা দিয়ে জল নিষ্কাশন—উভয় মরসুমে এইরূপভাবে জল নিষ্কাশন করার ফলেও জল অনেকখানি নষ্ট হয়।

গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে জলের প্রয়োজন ও তার অভাবে প্রতিক্রিয়া

গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে জলের ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। গাছের বৃদ্ধির বিশেষ বিশেষ কিছু সময়ে জলের প্রয়োজন খুব বেশী দেখা যায় এবং তেমনি এর অভাব হলে ফলনও কমতে থাকে।

জলের ব্যবহার—

সাধারণভাবে দেখা যায় দানাশস্যের যখন জনন অঙ্গ তৈরী হয় এবং ফুল ধরে তখন জলের অভাব হলে খুব বেশী প্রতিক্রিয়া হয়। তবে যে কোন দানাশস্য স্বল্পসময়ের জন্য বা অল্প পরিমাণ জলের অভাব দেখা দিলে অনেক সময় তা সহ্য করতে পারে। অল্প সময়ের মধ্যে জল পাওয়া গেলে

স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। থোড় আসার আগে জলের অভাব হলে খুব একটা অসুবিধা হয় না তবে ফুল ধরলে এবং দানা পুরণের সময় এর অভাব হলে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া হয়।

ধানে জলের ব্যবহারের দিক থেকে গাছের বৃদ্ধির কালকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে যেমন চারা অবস্থা, অঙ্গজপর্ব, জনন পর্ব ও দানা-পুষ্টি অবস্থা।

চারা অবস্থা—চারা অবস্থায় জলের প্রয়োজন কম হয়। বীজ যদি জলে ডুবে থাকে তাহলে অক্সিজেনের অভাবে র‍্যাডিকেল নষ্ট হয়ে যায়।

অঙ্গজ পর্ব—যথেষ্ট পরিমাণ পাশকাঠি হলে ধানের ফলনও বেশী হতে সাহায্য করে। চারা রোয়ার পর তাড়াতাড়ি শিকড় বেরুনোর জন্য জলের প্রয়োজন হয়। শিকড় হওয়ার পর পাশকাঠির জন্য অল্প পরিমাণে জল রাখতে হবে। এই অবস্থায় জল বেশী থাকলে পাশকাঠি কম হয় এবং শিকড় ভালভাবে বাড়ে না। এছাড়া পাতার ফলক এবং কাণ্ডবেষ্টক পত্রাবরণী খুব শক্ত হয় না। গাছের রঙ হয় হালকাসবুজ এবং তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে পড়তে পারে।

জনন পর্ব—সব থেকে বেশী পাশকাঠি হওয়ার পর জনন পর্ব আরম্ভ হয়। এর মধ্যে শীষ মুকুল আসা, থোড় আসা, ফুলফোটা ইত্যাদি পড়বে। বেশীর ভাগ জল এই পর্যায়ে প্রয়োজন হয়। এ পর্যায়ে খরা দেখা দিলে নিষিক্তিকরণে অসুবিধা দেখা দেবে এবং চিটে ধানের সংখ্যা বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অন্যদিকে এই পর্যায়ে বিশেষ করে থোড় অবস্থাতে বেশী জল হলে কাণ্ডের শক্তি কমে যাবে এবং সামান্য বাতাসে শুয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

দানাপুষ্টি পর্ব—এই অবস্থায় ধানের দুধ আসে, পরে দুধ ঘন হয় ও হলদেটে রঙের হয়ে পাকতে থাকে। খুব কম জল এই অবস্থায় প্রয়োজন হয়। ধান যখন হলদেটে হতে আরম্ভ করে তখন মাঠে জল দাঁড়ালে ভাল হয় না। তাই কাটার ১০ দিন আগে মাঠ থেকে জল বের করে দিতে হবে। অবশ্য তাতে ইঁদুরের আক্রমণ কিছুটা বেশী দেখা যায়।

ধানগাছের মোট জলের প্রয়োজন

মোট জলের প্রয়োজন বলতে বোঝায় চারা তৈরী, জমি প্রস্তুতি এবং চারা রোয়া থেকে ধান কাটা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে জলের প্রয়োজন হয়

তার সমষ্টিকে। মোট জলের পরিমাণ নির্ধারণ করতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি যত্নবান হতে হবে।

- কোন ধরণের মাটি রয়েছে অর্থাৎ মাটির প্রকৃতি কেমন।
- জমির অবস্থান কেমন (সমতল বা অসমতল, ঢালু ইত্যাদি)।
- জলের উৎস কতদূরে অর্থাৎ কতদুর থেকে জল নালা দিয়ে জমিতে আসবে।
- মাটির কত নীচে জলের স্তর রয়েছে।
- ধানের জমির পাশে কি আছে অর্থাৎ পাশে ধানের জমি আছে না, শুকনো জমি থাকছে।
- জমির আলের অবস্থা কেমন।
- জমির উর্বরতার মান কেমন।
- শস্যের বয়সকাল কত ?
- কোন পদ্ধতিতে জল মাঠে দেওয়া হবে ?
- জমি তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় জল কতখানি লাগছে ?
- গাছের বয়সকালে মোট বাষ্পীভবন ও বাষ্পমোচনের পরিমাণ কত ?

চারা তৈরীর জন্য—

বিভিন্ন অবস্থায় দেখা গেছে যে প্রায় ১৫০-২০০ মিলিমিটারের মত জল বীজতলা তৈরীর জন্য প্রয়োজন হয়। সাধারণভাবে এক হেক্টার জমি রোয়ার জন্য প্রায় ৮০০-১০০০ বর্গমিটার ভেজা বীজতলার প্রয়োজন হলে সেখানে ২৫০-৪০০ মিলিমিটার জল সেচ হিসাবে দেওয়া হয়। বীজতলায় চারা ৩০-৪০ দিনের জন্য থাকবে এই হিসাবে। বর্তমানে অবশ্য অধিক ফলনশীল ধানের জন্য ২১ দিনের চারার জন্য বলা হয় তবে ১৬ থেকে ৩৫ দিনের চারা ও রোয়া করতে দেখা যায়।

জমি প্রস্তুতির জন্য—

এই কাজের জন্য যে জলের প্রয়োজন হয় তা বিশেষ করে মাটির প্রকৃতি, মাটির জল ধারণ ক্ষমতা ও কোন ধরণের জমি তৈরী হবে তার উপর নির্ভর করবে। মাটি নরম করার জন্য লাঙ্গল দেওয়ার ১-২ দিন আগে জল দেওয়ার দরকার হয়। অনেকদিন শুকনো থাকার ফলে জলের প্রয়োজন বেশী হয়।

জমি ভেজানো থেকে প্রথম চাষ দেওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রায় ১১০ মিলিমিটারের মধ্যে জলের প্রয়োজন হয়। মাটির গভীরে ও পাশে যে জল

চু'ইয়ে যায় তার পরিমাণ ধরলে মোটামুটিভাবে ৩৯৬ মিলিমিটারের মত দাঁড়াবে। এছাড়া জলের উপর থেকে বাষ্পীভবনের জন্য প্রায় ১৫০ মিলি-মিটারের মত জল নষ্ট হয়।

জমিতে সেচ—

চারা রোয়ার পরও যথেষ্ট জলের প্রয়োজন হয়। সাধারণভাবে ধানের বয়সকাল (চারা রোয়া থেকে ধান কাটা) ৯০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে ধরা হয়। জলদি জাতের ক্ষেত্রে ১০-২০ দিন কম ধরা যেতে পারে। জলের প্রয়োজন সাধারণভাবে ধরা হয় কতটা জল রাখা হবে, কোন পদ্ধতিতে জল ব্যবহার হবে, মাটির প্রকৃতি এবং বাষ্পীভবনের উপর। তবে চারা রোয়া থেকে ধান কাটা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৮০০ থেকে ১২০০ মিলিমিটারের মত জলের প্রয়োজন হয়।

জল সেচের বিভিন্ন পদ্ধতি ঃ

যদি সমস্ত জায়গার সেচ ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা যায় তাহলে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলিই প্রধানভাবে দৃষ্টিগোচর হবে। এগুলি সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আলোচিত হল।

একটানা জমিকে ডুবিয়ে রাখা, এক্ষেত্রে জলের চলাচল থাকবে না (Continuous submergence or flooding ; Static)

এ ব্যবস্থা আবার তিন ধরণের হতে পারে—

- অগভীর বা স্বল্প গভীরতায় জল রাখে (যেমন ২·৫ সেণ্টিমিটার)
- মাঝারি গভীরতায় জল ধরে রাখে (যেমন ২·৫-৭·৫ সেণ্টিমিটার)
- বেশী গভীরতায় জল ধরে রাখে (যেমন ১০-১৫ সেণ্টিমিটার)

এ ধরণের সেচ পদ্ধতিগুলির সুবিধা অসুবিধা ঃ

- এই পদ্ধতিতে মোটামুটি ভাল ফলন পাওয়া যায়।
- মোটামুটিভাবে ১০০ দিনের মত সেচের সময় (তার মানে চারা রোয়া থেকে ফসল পাকার সময় পর্যন্ত) ধরলে বাষ্পীভবন ও পাতার বাষ্প-মোচন মিলিয়ে ৬০০ মিলিমিটারের মত জলের প্রয়োজন দেখা যায়। মাটির গভীরে যে জল যায় তা নির্ভর করবে মাটির প্রকার এবং কতটা জল জমির উপরে রয়েছে। এক্ষেত্রে মোট জলের প্রয়োজন হয় অগভীর পদ্ধতির জন্য

৮০০ থেকে ১০০০ মিলিমিটার এবং মাঝারি বা বেশী গভীর পদ্ধতির জন্য ১০০০ থেকে ২০০০ মিলিমিটার।

● যদি বেশী জল পাওয়ার সুবিধা থাকে, তাহলে খুব কম পরিশ্রমে ধানের পরিচর্যা সম্ভব হয়। কিন্তু যদি কম পরিমাণ সেচের জন্য জল থাকে তাহলে জমি খুব ভালভাবে সমান করতে হবে। তা না হলে সমান-ভাবে জল দাঁড়াবে না। ফসলও ভাল হবে না।

● এভাবে জল ধরে রাখতে পারলে ঘাসজাতীয় আগাছা খুব ভালভাবে এবং মুথাজাতীয় ও বড় পাতার আগাছা মাঝারিভাবে দমন হবে। যদি দানাদার আগাছানাশক ঔষধছড়ানো যায় তাহলে খুব ভালভাবে এই অবস্থায় আগাছাদমন সম্ভব হয়।

● দিনের বেলায় জলের তাপমাত্রা মোটামুটিভাবে বাতাসের থেকে কম থাকে।

● যে সব জায়গায় মাটি এঁটেল প্রকৃতির সেখানে পুরো মাত্রায় নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম শেষ চাষের আগে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারা যায়। কিন্তু মোটা দানার মাটিতে (বালিমাটি) নাইট্রোজেন সার দফে দফে প্রয়োগ করাটা ভাল হবে কারণ মাটির গভীরে যে জল যায় তার পরিমাণ এখানে বেশী হবে ও খাদ্যোপাদান বেশী নষ্ট হবে।

জমি একটানা জলে ডুবে থাকবে তবে জলের চলাচল থাকবে
(Continuous flooding or submergence ; Flowing)

পাহাড়ী এলাকায় ধানের জমি অনেক সময় একটু ঢালু প্রকৃতির হয়, জল পেতে অসুবিধা হয় না পাহাড়ী ঝর্ণা থেকে যথেষ্ট জল পাওয়া যায়। সেসব জায়গায় এ ধরণের সেচ ব্যবস্থা থাকতে অসুবিধা সেই।

সুবিধা ও অসুবিধা

● আগের পদ্ধতির মত এখানেও গাছের বৃদ্ধি ও ফলন একপ্রকার সমানই থাকে।

● গাছের বাষ্পীমোচন ও বাষ্পীভবন, মাটির নীচে ও চুঁইয়ে জল নষ্ট হওয়ার পরিমাণও একপ্রকার সমানই থাকে। ১০০ দিনের জন্য গাছের জলের প্রয়োজন প্রায় ৬০০ থেকে ১০০০ মিলিমিটারের মত দাঁড়ায়। কিন্তু চারা রোয়া ও ফসল কাটা পর্য্যন্ত জমিতে মোট জল লাগবে প্রায় ৪৮০০ মিলিমিটারের মত।

- এই পদ্ধতিতে মাটিতে অক্সিজেন পরিমাণ মত থাকতে পারে। সেই সংগে জল বেরিয়ে যেতে না পারলে যে হাইড্রোজেন সালফাইড ও অন্যান্য দোষনীয় পদার্থ জমা হত তা আর হয় না। কারণ এখানে জল জমে থাকতে পারে না।
- জলের তাপমাত্রা আগের পদ্ধতির তুলনায় কমই হয়। দিনের বেলায় বাতাস ও জলের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য কম হয়।
- এই পদ্ধতিতে যেসব অসুবিধা হয় তাহলো অনেক জলের প্রয়োজন হয় এবং তার বেশীর ভাগ নষ্টই হয়। সেই সংগে মাটির খাদ্য অনেক ধুয়ে চলে যায়।

পর্যায়ক্রমে সেচ বা মাঝে মাঝে সেচ (**Rotational irrigation or intermittent irrigation**)

এই ধরণের সেচ ব্যবস্থা বেশীর ভাগ জায়গাতে চালু আছে কারণ যেখানে জল কম থাকে অথবা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে না সেখানেই এই পদ্ধতির সুযোগ নেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে সেচ দিতে গেলে শস্যের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্বগুলি সম্বন্ধে ভাল ধারণা থাকতে হবে। বৃদ্ধির কোন পর্যায়ে জল না হলে বা কম পরিমাণে দিলে চলতে অথবা কোন সময় জল না পেলে সমূহ ক্ষতি হবে তা ভালভাবে জানতে হবে।

এই পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা

- এই পদ্ধতিতে ফলন যথেষ্ট পরিমাণে হতে পারে।
- ১০০ দিনে গাছের বাষ্পীমোচন ও বাষ্পীভবনের জন্য প্রায় ৬০০ মিলিমিটার জলের প্রয়োজন হয়। জল চুঁইয়ে যাওয়ার মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম হবে। মাটির গভীরে যে জল চলে যায় তার মাত্রাও অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় সামান্য কম হয়। যদি ঠিক ঠিকমত এই পদ্ধতিতে জলের ব্যবহার করা যায় তাহলো প্রায় ৭০০ মিলিমিটারের বেশী জল লাগে না।
- পর্যায় ক্রমিক সেচ ব্যবস্থায় পরিমাণ মত জল মেপে শস্যের বৃদ্ধির সময়ে দেওয়া হয় তাই অতিরিক্ত জল অন্য জায়গায় ব্যবহার করা যায়। কিন্তু আগের পদ্ধতিগুলিতে এইভাবে ব্যবহার সম্ভব হয় না।
- জল মাঠে সব সময় জমে না থাকার জন্য ক্ষতিকারক পদার্থ তৈরী হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। তাই গাছের শিকড় বেশ ভাল থাকে। গাছের বৃদ্ধিও ফলন কিছুটা বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

- এই পদ্ধতিতে সেচ দিতে গেলে মাঠের মধ্যে বা যে উৎস থেকে জল আসবে, সেখান থেকে মাঠ পর্য্যন্ত সেচ নালা ভালমত তৈরী করতে হবে। এর ফলে জল নষ্ট কম হয়। এ সবের জন্য প্রথমের দিকে একটু খরচ বেশী পড়তে পারে।
- একটানা জল জমিতে দাঁড় করিয়ে রাখার বদলে পর্যায়ক্রমে সেচ দিতে থাকলে আগাছার উপদ্রব কিন্তু বেশী হতে পারে। যেখানে নিবিড় ধান চাষের প্রকল্প চালু রয়েছে সেখানে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা না। কারণ সেখানে আগাছা দমনের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখা হয়।
- তাপমাত্রার পার্থক্য কম বেশী হতে থাকে কারণ কখন কতটা পরিমাণ জল মাঠে থাকছে তার উপর তাপমাত্রা নির্ভর করবে। সেচ দেওয়ার পর তাপমাত্রা যথেষ্ট কম হবে কিন্তু জল যখন মাঠে কমে আসবে তখন স্বাভাবিক ভাবে তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে। দিনের তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্যও জলের গভীরতার উপর নির্ভর করবে।
- এই পদ্ধতিতে সেচের জন্য মজুরের প্রয়োজন বেশী হয়।

সেচবিহীন বা বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল চাষ

সুবিধা অসুবিধা

- শস্য যেহেতু বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল তাই ফলনেরও কোনও নিশ্চয়তা থাকে না। যদি বৃষ্টির জল শস্যের বৃদ্ধির সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তগুলিতে (critical stages) যেমন পাশকাঠি তৈরীর সময়, থোড় আসা থেকে ফুল ফোটা পর্য্যন্ত সময় বা দুধ ঘন অবস্থায়, পায় তাহলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যাবে।
- শস্যের বৃদ্ধি বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল। যদি ঠিক সময়ে বৃষ্টি না পায় তাহলে গাছ বেঁটে হয় ও কিছুটা বেশী পাশকাঠি ছাড়ে। আবার বেশী বৃষ্টির ফলে জল দাঁড়িয়ে গেলে উল্টো ফল হয় অর্থাৎ পাশকাঠি কমে যায় ও গাছ লম্বায় বাড়তে থাকে।
- গাছে জলের প্রয়োজন ৯০০ থেকে ১০০০ মিলিমিটারের মত। যদি বৃষ্টিপাত ১৫০০ বা ১০০০ মিলিমিটারের মত হয় ও বৃদ্ধির পর্যায়গুলির সময় হয় তাহলে হয়তো কোন রকম অসুবিধায় পড়তে হয় না। কিন্তু যেসব জায়গায় ৭০০ মিলিমিটারের মত বৃষ্টি হয় সেখানে খুব সতর্ক হতে হবে যাতে কোন প্রকারে জল নষ্ট না হয়। তার জন্য ভালমত

আল ঠিক সময়ে দিতে হবে এবং জমি যতটা সম্ভব সমতল রাখা প্রয়োজন।

- আগাছার উপদ্রব খুব বেশী হয়। এজন্য আলাদাভাবে আগাছা দমনের ব্যবস্থা রাখতে হয়।
- তাপমাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি বৃষ্টির উপর নির্ভর করবে।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাতে জলসেচের সুপারিশ

প্রাকখরিফে আউস ধানের জমিতে ঃ

- বীজ বোনার সময় মাটিতে ভাল রস থাকলে বীজের অঙ্কুরোদগম কোন অসুবিধা নেই।
- অঙ্কুরোদগমের পর প্রতি ১০/১৫ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে এবং প্রতি সেচে ৫ সেণ্টিমিটার মত জল দেওয়া প্রয়োজন।
- গাছে থোড় আসার শুরু থেকে ফুল ফোটা বা তারও পরে দুধ ঘন হওয়া পর্য্যন্ত মাটিতে রসের যোগান বেশী হওয়া প্রয়োজন এবং এই সময়টিই গাছের সংকটপূর্ণ অবস্থা বলা যায়। তাই এ সময়ে সেচ ৭/১০ দিন অন্তর হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং প্রতি সেচে জলের পরিমাণ তবে ২.৫ থেকে ৫ সেণ্টিমিটার।
- ফসল কাটার ৭/১০ দিন আগে কোন সেচ দেওয়া দরকার হবে না।
- জমিতে সুষ্ঠু জলবণ্টনের জন্য জমিতে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নিতে হবে যতটা সম্ভব সমতল হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- যদি কোন সেচের সময় বা তার সামান্য আগে বৃষ্টি হয় তাহলে সে সেচটি বাতিল করতে হবে।

খরিফ মরসুমে আমন ধানের জমিতে

খরিফ মরসুমে বেশী বৃষ্টির জন্য অধিক ফলনশীল ধান চাষে সুপারিশমত জল রাখা সব সময় সম্ভব হয় না। যদি সম্ভব হয় তবে গাছে থোড় আসা শুরু হওয়ার সময় থেকে ফুল ফোটা পর্য্যন্ত ৫ সেণ্টিমিটার জল দাঁড় করানো দরকার এবং অন্য সময় কেবলমাত্র ছিপ্‌ছিপে থাকলেও চলবে। কোন সময় জমির মাটি যেন শুকিয়ে ফেটে না যায়। ৫ সেণ্টিমিটারের বেশী জল দাঁড় করিয়ে ফলন বেশীও পাওয়া যায় না। অধিকন্তু জলের সংগে অতি মূল্যবান খাদ্যও নষ্ট হয়। যদি জলকে উল্লিখিত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয়,

তবে ৫ সেণ্টিমিটার জল দিয়ে ঐ জল যখন মাটির নীচে চলে যাবে, তখন আবার ৫ সেণ্টিমিটার জল দাঁড় করিয়ে দিলে চলবে। ৫ সেণ্টিমিটারের বেশী জল দাঁড় করানো কোন সময়ই দরকার হবে না। এই জল সব জায়গায় ৫ সেণ্টিমিটার পরিমাণ দাঁড় করানোর জন্য জমিকে ভালভাবে সমতল করা দরকার। যেখানে সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টি নির্ভরশীল সেখানে বৃষ্টির অনিশ্চয়তা থাকে তাই ২৫ সেণ্টিমিটার পর্যন্ত জল ধরে রাখার দরকার হতে পারে। সেক্ষেত্রে বেশী জলসহ্য করতে পারে এমন জাতের কথা ভাবা উচিত।

বোরো মরসুমের ধানে সেচ

বোরো মরশুমে সকলে সেচের জলের সুবিধা না থাকলে চাষ করে না। এছাড়া অধিক ফলনশীল ধানের চাষ করলে জমি সাধারণতঃ মাঝারি বা নীচু প্রকৃতির নির্বাচন করে। তাই সেচের জলের সুবন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়।

- এক্ষেত্রে চারা রোয়ার সময় ৩ সেণ্টিমিটার জল রাখা হয়।
- এর পর ৩/৪ দিন আর কোন জল দেওয়ার দরকার পড়ে না।
- ৪ দিন থেকে ১৫ দিনের মধ্যে মোটামুটি ভাবে জল ছিপছিপে করে ঢুকিয়ে রাখা হয়। কারণ চারা তখনো পর্যন্ত ঠিকঠিক বসে না।
- ১৫ দিনের পর থেকে সব সময়ের জন্য ৫ সেণ্টিমিটার জল ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন বোধে সেচ দিতে হবে। সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে মাটি ফেটে যেন না যায়।
- যে যে সময় নাইট্রোজেন সার চাপান হিসাবে দেওয়া হবে সেইসময় জলের মাত্রা কম থাকলে ভাল।
- ধান কাটার ৭/১০ দিন আগে জমির জলবার করে দিতে হবে। তার ফলে ফসল ঠিকঠিক মত পাকতে পারবে।

অধ্যায় এগার

ধান ক্ষেতের আগাছা ও তার দমন

(Weeds and its Control in Rice)

অধ্যায় এগার

ধান ক্ষেতের আগাছা ও তার দমন

যেখানে প্রয়োজন নেই এমন জায়গায় যে কোন গাছ থাকলে তাকে আগাছা নামে চিহ্নিত করা হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আগাছা সাধারণতঃ শস্যের থেকে বেশী কষ্টসহিষ্ণু হয়, তার আর্থিক মূল্য কম হয়, তাড়াতাড়ি সংখ্যায় বাড়ে বা বিস্তার লাভ করে।

আগাছার দ্বারা ধানের ক্ষতির পরিমাণ ঃ আগাছা ধানের খুব ক্ষতি করে থাকে। সর্ব ভারতীয় ধান্য উন্নয়ন প্রকল্পের এক হিসাবে দেখা গেছে যে রোয়া ধানের ক্ষেত্রে প্রায় ১৫-২০ শতাংশ, কাদানো জমিতে কলানো বীজ ছিটানো হলে ৩০-৩৫ শতাংশ এবং আউস ধানে ৫০ শতাংশের বেশী শস্যের ফলন কমে গেছে। নিচের সারনি ১১ থেকে ইহা আরো পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে।

সারনি ১১ ঃ আগাছার জন্য ধানের ফলন কতখানি কমতে পারে তার হিসাব (হেক্টার প্রতি কেজিতে)

অবস্থা	কাদানো জমিতে রোয়া করে		কাদানো জমিতে কলানো বীজ ছিটিয়ে বোনা		উঁচু জমিতে ছিটিয়ে বোনা	
	খরিফ '৭২	রবি '৭২	খরিফ '৭২	রবি '৭২	খরিফ '৭২	খরিফ '৭৩
১। হাত দিয়ে আগাছা দমন	৪৯৩০	৩১৯৫	৪০১১	৪৯৭৫	২৪৪৩	২০৩২
২। আগাছা দমন না করলে	৪২৭৯	২২৯৩	২৬৫২	৩১০৪	১৬৯৩	৭৬২
৩। আগাছার জন্য যে ফলনের ক্ষতি হয় তার শতকরা হিসাবে	১৩	২৮	৩৪	৩৭	৩০	৬২

মোটামুটি হিসাবে বলা যায় ভারতে আগাছার জন্য সারা বছরে প্রায় ১৫০ লক্ষ টনের মত ধানের ক্ষতি হয়ে থাকে। এই ক্ষতির পরিমাণ ছিটিয়ে বোনা ধানের ক্ষেত্রে বেশী হয়। কারণ এখানে জলের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং জমি তৈরী ভালভাবে হয় না। আগাছা ধানের ফলন যে কমিয়ে দেয় তার একটি বড় কারণ হল খাদ্যের জন্য আগাছা ও ধান গাছের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা। নিচের সারনি ১২, ১৩ থেকে এটি ভালভাবে বোঝা যাবে।

সারনি ১২ : ক্ষেতে যদি আগাছা দমন না করা হয় তাহলে আগাছার দ্বারা খাদ্যোপাদান অপসারণ (শতকরা হিসাবে)

[মুখোপাধ্যায়, ১৯৮১]

বিভিন্ন অবস্থা	আগাছার দ্বারা খাদ্যোপাদান অপসারণ নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশ
(১) উঁচু জমিতে ধান ছিটিয়ে বোনা অবস্থায়	৩০.৪	৮.২	৪৮.৭
(২) কাদানো জমিতে ধান ছিটিয়ে বোনা	২১.১	২.৪	২৬.৯
(৩) নীচু জমিতে রোয়া আমন ধান	১১.৮	১.৩	১৩.৬

সারনি ১৩ : ধান খাদ্যোপাদান কতখানি গ্রহণ করে (হেক্টার প্রতি কেজিতে) [মুখোপাধ্যায়, ১৯৮১]

বিভিন্ন অবস্থা	আগাছা দমন না করা ক্ষেতে			আগাছা দমন করা ক্ষেতে		
	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশ	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশ
উঁচু জমিতে বীজ ছিটিয়ে বোনা	১.৪	০.৬	২.৭	৮০.২	১৪.৭	৬১.৯
কাদানো জমিতে ছিটিয়ে বোনা	১১.৬	২.৩	১৭.৫	৯৯.০	১৯.৩	১৪৫.৫
নীচু জমিতে চারা রোয়া	৬৪.৫	১১.১	৪৬.৯	৭৬.০	১৩.৩	৯৬.২

আগাছা শস্যের সংগে সূর্যের আলো, জল এবং জায়গার জন্য প্রতিযোগিতা করে থাকে। পরোক্ষভাবে ধান কাটার পর ধানের রোগ পোকার জীবাণু আগাছার মধ্যে লুকিয়ে থাকে এবং পরে আবার ধান চাষ হলে আক্রমণ

করে। এ ব্যতিরেকে আগাছা সেচ বা জলনিকাশী নালা বন্ধ করে দিয়ে জল চলাচলের ব্যাঘাত ঘটায়। আগাছা পরিষ্কার করতে জনমজুরের খরচ বেশী লাগে এবং শস্যের গুণগত মানও কমিয়ে দেয়।

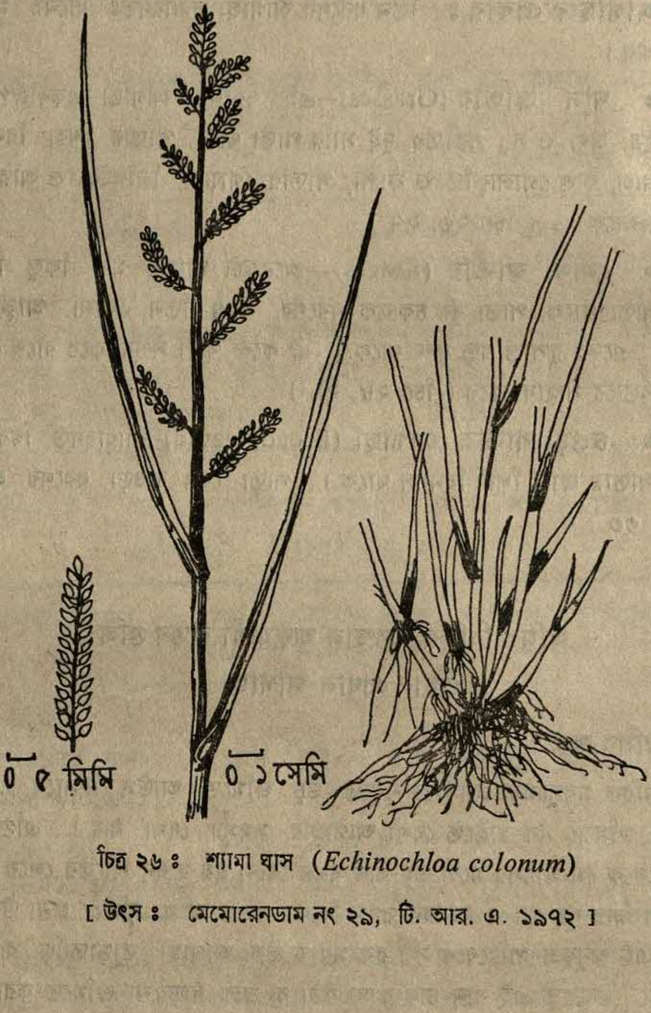
আগাছার প্রকার ঃ তিন ধরণের আগাছা সাধারণতঃ ধানের মাঠে দেখা যায়।

- **ঘাস জাতীয়** (Grasses)—এই ধরণের আগাছা একবীজপত্রীর মধ্যে হয়, লম্বা ও সরু প্রকৃতির, দুই সারি পাতা থাকে, পাতার শিরা বিন্যাস সমান্তরাল, কাণ্ড গোলাকৃতি ও ফাঁপা, পাতার গোড়ায় লিগিউল ও অরিকল উভয়ই থাকে। (চিত্র ২৬, ২৭)
- **মোথা জাতীয়** (Sedges)—অনেকটা ঘাসের মত কিন্তু তিন সারি পাতা থাকে, পাতা খুব চকচকে ধরণের, কাণ্ড তিন কোনা আকৃতির শক্ত। এদের রূপান্তরিত কন্দ থাকে। ঐ কন্দে খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে এবং বংশ বিস্তারে সাহায্য করে (চিত্র ২৮, ২৯)
- **চওড়া পাতার আগাছা** (Broad leaved)—সাধারণত দ্বিবীজ-পত্রী পাতায় জাল শিরা বিন্যাস থাকে। পাতা বেশ চওড়া ধরণের হয়। (চিত্র ৩০)।

জমির বিভিন্ন অবস্থান অনুযায়ী কতকগুলি প্রধান প্রধান আগাছা

উঁচু জমির জন্য ঃ

খরিফ মরসুমের একেবারে শুরুতে উঁচু জমিতে আউস হিসাবে বোনা ধানের জমিতে সব চাইতে বেশী আগাছার সমস্যা দেখা যায়। এপ্রিলের শেষ থেকে মে মাসের মধ্যে এই ধান যখন বোনা হয় তখন শীতের শেষে উষ্ণ আবহাওয়ার শুরু হয় ও বছরের প্রথম দিকের অল্প অল্প বৃষ্টির জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র এই অনুকূল পরিবেশে সব রকমের অজস্র আগাছা তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে। যেহেতু এই ধান চাষ কাদা করা বা জল দাঁড়ানো জমিতে করা হয় না এবং সেই সংগে ধান ও আগাছার বীজ একই সময় অংকুরিত হয় সেজন্য আগাছার সমস্যা খুব বেশী দেখা দেয়।



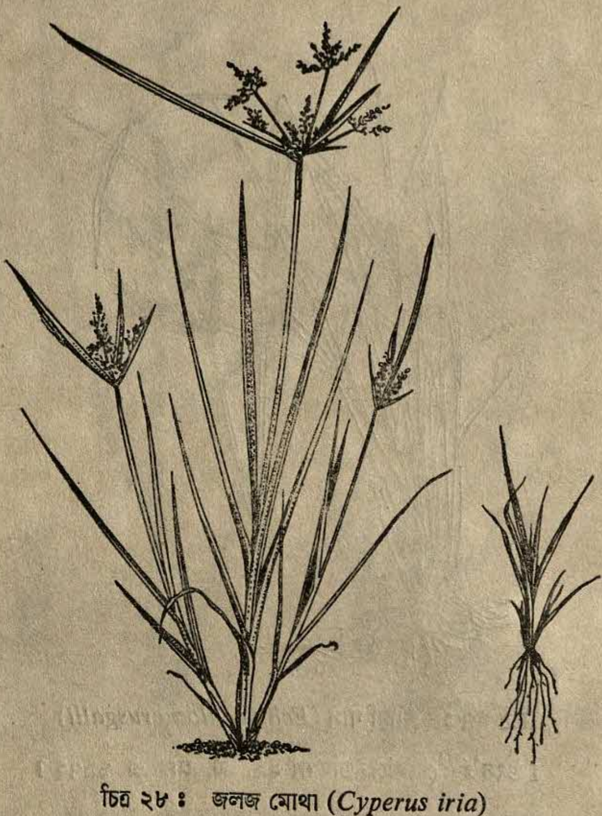
চিত্র ২৬ঃ শ্যামা ঘাস (*Echinochloa colonum*)

[উৎস ঃ মেমোরেনডাম নং ২৯, টি. আর. এ. ১৯৭২]



চিত্র ২৭ : শ্যামা ঘাস (*Echinochloa crusgalli*)

[উৎস : মেমোরেনডাম নং ২৯, টি. আর. এ. ১৯৭২]



চিত্র ২৮ : জলজ মোথা (*Cyperus iria*)

[উৎস : স্যাটারডে সেমিনার, আই. আর. আর. আই. ১৯৭০]



চিত্র ২৯ ঃ বিন্দি মোথা (*Fimbristylis miliacea*)

[উৎস ঃ মেমোরেনডাম নং ২৯, টি. আর. এ. ১৯৭২]



চিত্র ৩০ঃ মোনোকরিয়া (*Monochoria vaginalis*)
[উৎস ঃ মেমোরেনডাম নং ২৯, টি. আর. এ. ১৯৭২]

• **ঘাসজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে যেগুলি প্রধান**—শ্যামা (*Echinochloa colonum, E. crussgalli*), মাকড়জালি (*Dactyloctenium aegypticum*), কোদাই (*Eleusine indica*), শর/কাশ জাতীয় (*Saccharum* sp.), সিটারিয়া (*Setaria glauca*), ব্রাকিরিয়া (*Brachiaria* spp.), ইরাগ্রসটিস (*Eragrostis aspera, Eragrostis interrupta*), ডিজিটেরিয়া (*Digitaria longifolia*), দুর্বাঘাস (*Cynodon dactylon*)।

• **মোথাজাতীয়**—মোথা (*Cyperus rotundus, C. esculentus*), বিন্দি মোথা (*Fimbristylis miliacea*)।

• **চওড়া পাতাজাতীয়**—লাটামারি (*Digera arvensis*), টিকিওকড়া (*Melochia corchorifolia*), ভুঁইনিম (*Bonnya brachiata*), বাগানুলা (*Cyanotis axillaris*) চাঁচি (*Alternanthera* spp.), পাথর চাঁটা (*Trianthema spp.*) কেশুত (*Eclipta alba*)।

নীচু (আমন বা বোরো ধানের) জমিতে ঃ

● **ঘাসজাতীয় আগাছা**—শ্যামা, কারা (*Leersia hexandra*), প্যাসপেলাম (*Paspalum scrobiculatum*), প্যানিকাম (*Panicum* sp.)।

● **মোথাজাতীয়**—বিন্দিমোথা (*Frimbristylis miliacea*), জলজ মোথা (*Cyperus iria, C. difformis*), পটপটি (*Scirpus* sp.)।

● **বড় পাতাজাতীয়**—শুশনী (*Marsilea* spp.), দাদমারি (*Ammania baccifera*), কলমি (*Ipomea reptans*), ছাগলনাদি (*Spherenthus indica*), লুর্ডাবিজিয়া (*Ludwigia parviflora*), এরিয়োকোলন (*Eriocholan* spp.), কচুরিপানা (*Eichhornia crassipes*), ছোটপানা (*Pistia* spp.), মনোকোরিয়া (*Monochoria vaginalis*), চাঁচ (*Alternanthera* spp.)।

শেওলা জাতীয় আগাছার মধ্যে প্রধানতঃ ঝাঁঝি বা বুশ্না (*Chara* spp.) বেশী দেখা যায়।

উপরোক্ত তালিকা সম্পূর্ণ নয়। অজস্র সংখ্যক আগাছা আছে তবে তার মধ্যে যেগুলি বলা হল এগুলি প্রধান বলা চলে।

আগাছা দমনের পদ্ধতি

পরিচর্যা পদ্ধতির মাধ্যমে

● জমি তৈরী—বীজ বোনা বা চারা রোয়ার আগে খুব ভালভাবে বারবার লাঙ্গল এবং মই দিয়ে জমি তৈরী করতে হবে। এর ফলে আগাছার উপদ্রব কম হয়। বীজ কলানোর পর বা রোয়ার পর ফসল তাড়াতাড়ি বাড়ার পরিবেশ পায়।

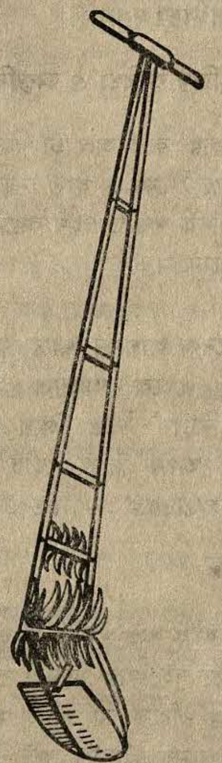
● সারিতে বোনা বা রোয়ার ফলে হাত নিড়ানি বা কোন যন্ত্র চালিয়ে আগাছা দমন সহজ হয়—ছিটিয়ে বোনার থেকে সারিতে বোনা বা রোয়া করতে একটু বেশী খরচ পড়ে ঠিকই তবে চক্রবিদা ইত্যাদি দুই সারির মধ্যে চালাতে অনেক সহজ হয়। কাদামাটিতে ঘুরানো আগাছানাশক যন্ত্র (চিত্র ৩১) ভালভাবে চালানো যায় এবং উঁচু জমিতে আউস ধানের মাঠে যদি জো ভাল

থাকে তাহলে চক্রবিদা চালানো যেতে পারে। এগুলি দিয়ে সারির মধ্যে আগাছা দমন যদিও বা সম্ভব কিন্তু দুটি গাছের মধ্যে আগাছা থেকে যায় এবং পরে ধানের সংগে বাড়তে থাকে।

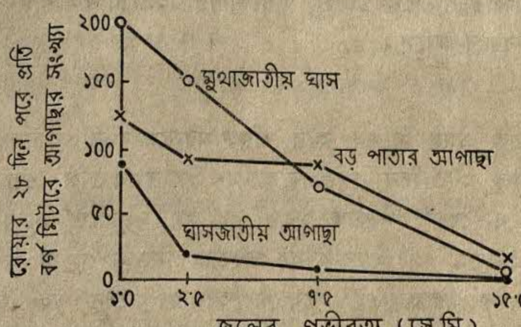
যেসব জায়গায় চক্রবিদা বা ঐ ধরণের কোন যন্ত্র নেই সেখানে হাত নিড়ান বা হাত দিয়ে আগাছা টেনে বের করে মাটিতে পুতে দিতে হয়। এ ধরণের কাজও সারি ফসলে ভালভাবে করা সম্ভব।

● ধানের জমিতে প্রয়োজন মত জল রাখা—ভালভাবে জলের বন্দোবস্ত করলে আগাছার বাড় অনেকাংশে কমানো সম্ভব। এই ধরণের পদ্ধতিতে আগাছা দমন সম্ভব হয় যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের বন্দোবস্ত অন্ততপক্ষে ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ ধরে থাকে। জলজ বা চওড়া পাতার গাছ এ পদ্ধতিতে অবশ্য দমন করা সম্ভব না। আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্রে একটি পরীক্ষায় (চিত্র ৩২) দেখিয়েছে যে যদি মাঠে ধানের দুধ ঘন হওয়া পর্যন্ত একটানা জল ধরে রাখা যায় (১-২.৫ সেণ্টিমিটার) তাহলে মোথা-জাতীয় আগাছা, চওড়া পাতা বা ঘাসজাতীয় আগাছার থেকে বেশী মরে। চারা রোয়ার ৪ দিন পর থেকে দুধ ঘন হওয়া পর্যন্ত একটানা ১৫ সেণ্টিমিটার জল ধরে রাখা থাকলে প্রায় সব রকম ঘাস এবং মোথা জাতীয় আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে জল ধীরে ধীরে করে বাড়াতে হবে। জলের পরিমাণ এমনভাবে বাড়াতে হবে যাতে আগাছা ডুবে থাকে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে ধানের চারা যেন ডুবে না যায়।

মাঠে জল ধরে রেখে আগাছা দমন করাতে একটা অসুবিধাও রয়েছে। সারা সময় ধরে মাঠে জল ধরে রাখা, বাঁধ তৈরী ইত্যাদির জন্য যথেষ্ট খরচ হয়। তাছাড়া বেশীর ভাগ ঘাস বা মোথা জাতীয় আগাছা গভীর জলে নষ্ট হয় ঠিকই তবে বেশী গভীর জলে ধান গাছেরও ক্ষতি হতে পারে। জল ধরে রাখার জন্য যে বাঁধ দেওয়া হয় তা সহজে ভাঙ্গা যায় না। সে সব বাঁধের ঘাসে রোগ পোকার জীবাণু আশ্রয় নেয়। তাই এই পদ্ধতিকে খুব কার্য্যকরী পদ্ধতি বলা যায় না।



চিত্র ৩১ঃ রোয়া ধানের জমি আগাছা নিড়ানোর জন্য রোটারী উইডার বা চাকা নিড়ানী।



চিত্র ৩২ঃ ধানের মাঠে জলের গভীরতা বাড়ার ফলে কোন ধরণের আগাছা কত পরিমাণে থাকতে পারে তা দেখানো হয়েছে।

[উৎস ঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই. ১৯৭০]

রাসায়নিক ঔষধ দিয়ে আগাছা দমন

রাসায়নিক পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা ঃ

রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার করে আগাছা দমন ধান চাষের ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক দিক উদ্‌ঘাটন করেছে। যেখানে হাত নিড়ানী আগাছা দমনের একটি ভাল পদ্ধতি সেখানে রাসায়নিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে গেলে কতটা সুবিধা বা অসুবিধা রয়েছে তা জানা প্রয়োজন।

● অনেক সময় অনেক আগাছা থাকে যা নাকি ফুল ধরার আগে প্রধান শস্যের (ধানের) থেকে আলাদা করে ওঠা সহজ হয়ে উঠে না। তাই হাত নিড়ান দিতে গিয়ে ঠিক ঠিক ভাবে আগাছা দমন নাও হতে পারে। অপর দিকে ছোট অবস্থাতেই নির্মূল করা প্রয়োজন কিন্তু রাসায়নিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত ঔষধের দ্বারা তা সম্ভব হতে পারে।

● বর্তমানে অনেক কৃষক শস্য পর্যায়ে ফসল চাষের ফলে একই সংগে বা একই বছরে বিভিন্ন ঋতুতে দুই থেকে তিনটি করে ফসল তুলে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাতে প্রাক খরিফে বা খরিফ মরসুমে কেউ কেউ পাটের জমিতে, কেউ কেউ আউস ধানের জমিতে, কেউ গ্রীষ্মকালীন সব্জিতে, কেউবা আবার খরিফ মরসুমের আমন ধানের বীজতলা ফেলার কাজে জনমজুর করে থাকেন। মজুরের চাহিদা এ সময়ে খুব হয়। শুধু তাই নয়, কৃষি-শ্রমিকের মজুরীও বেড়ে যায়। তখন কৃষক অন্য ব্যবস্থা হিসাবে রাসায়নিক পদ্ধতির কথা ভাবার অবস্থায় আসে।

● অনেক সময় বিশেষ করে খরিফ মরসুমে যখন একটানা ৭ দিন ধরে বৃষ্টির পর ২/৩ দিন পরিষ্কার আকাশ হয় তখন জমি এত পরিমাণ ভেজা থাকে যে বেশী সংখ্যক মজুর বা কম মজুরীতে মজুর পাওয়া গেলেও হাত-নিড়ান বা যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিড়ান দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। অপর দিকে এই সুযোগে আগাছা যেন খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে। এইরূপ অবস্থাতে কৃষক রাসায়নিক পদ্ধতির কথা ভাবতে পারে।

● পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে দক্ষিণ মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার বিভিন্ন অংশে ছোট জাতীয় জলজ আগাছা যেমন ঝাঁঝি বা বুঝা, নিটেলা, এরিয়োকোলন ইত্যাদি ধান গাছের পাশকাঠি ছাড়তে বা ভালভাবে বাড়তে বাধা দেয়, ফলনও কমে যায়। এগুলিকে হাত দিয়ে বা কোন যন্ত্রপাতির সাহায্যে পুরোভাবে দমন করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তখন এমত অবস্থায় রাসায়নিক পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়।

● হাত নিড়ানী বা যন্ত্র দিয়ে নিড়ান দেওয়ার ফলে আবার আগাছা জন্মাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু রাসায়নিক পদ্ধতিতে এমন অনেক ঔষধ আছে যা প্রয়োগ করলে গাছের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এমন কি শিকড়ও আক্রান্ত হয়। তখন এগুলির আবার জীবিত হওয়ার আশা থাকে না।

যেমন রাসায়নিক পদ্ধতিতে সুবিধা রয়েছে তেমনি কিছু অসুবিধাও থাকে।

● যে-কোন ঔষধ সব রকমের আগাছা মারতে পারবে না।

● ঔষধে অতি সামান্য হলেও শস্যের ক্ষতিও কিছুটা হয়।

● সাফল্যের সংগে আগাছা নাশক ঔষধ ব্যবহার করতে গেলে ঠিক ঠিক মত ব্যবহার করার বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান থাকা উচিত।

● স্প্রে করতে হলে স্প্রেয়ার ইত্যাদির জন্য প্রথমের দিকে খরচ কিছুটা বেশী পড়ে।

উপরের আলোচনাতে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে কোন একটি বিশেষ পদ্ধতি সব সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। কোন এক পদ্ধতিতে ভাল কাজ না হলে সমস্ত দিক বিবেচনা করে দুটি বা ততোধিক পদ্ধতি মিলিয়ে আগাছা দমনের কথা ভাবা উচিত। এই ধরনের প্রচেষ্টাকে এক কথায় সুসংহত আগাছা দমন পদ্ধতি বা Integrated Weed management বলা হয়।

আগাছা নাশক ঔষধ ব্যবহারের কয়েকটি দরকারী কথা

● আগাছা নাশক ঔষধ ঠিক সময়ে ব্যবহার করতে হবে—ঔষধ ব্যবহার করলে কতখানি কাজ দেবে তা অনেকখানি নির্ভর করে আগাছা বা শস্যের বৃদ্ধির কোন সময়ে দেওয়া হয়েছে তার উপর। সাধারণতঃ আগাছা ও শস্যের বৃদ্ধির তিনটি পর্যায়ে ঔষধ ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়।

● চারা রোয়া বা বীজ বোনার আগে ঔষধ প্রয়োগ (Pre-sowing or planting)—জমি তৈরীর শেষে কিন্তু চারা রোয়া বা বীজ বোনার ঠিক আগে কিছু কিছু ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

● বীজ বোনার পর কিন্তু অংকুরোদগমের আগে ঔষধ প্রয়োগ (Pre-emergence)—এক্ষেত্রে ঔষধ শস্যের বীজ বোনার পরে ব্যবহার করা হয় কিন্তু —শস্যের বা আগাছার অংকুরোদগমের আগে। এই পদ্ধতিতে আগাছা এক-বারে প্রথম অবস্থাতে নির্মূল করা হয়। যে সমস্ত শস্যের বীজ দেরীতে অংকুরোদগম করে কিন্তু আগাছার চারা তাড়াতাড়ি বড় হয় সে সব জায়গায় এ ধরনের পদ্ধতি খুব কাজ দেয়। এই পদ্ধতিতে ঔষধ দেওয়ার পর ঔষধ তাড়াতাড়ি আগাছার অংকুর নষ্ট করে ফেলে কিন্তু এখানে শস্যেরও কিছুটা ঔষধ সহ্য করার ক্ষমতা থাকা উচিত।

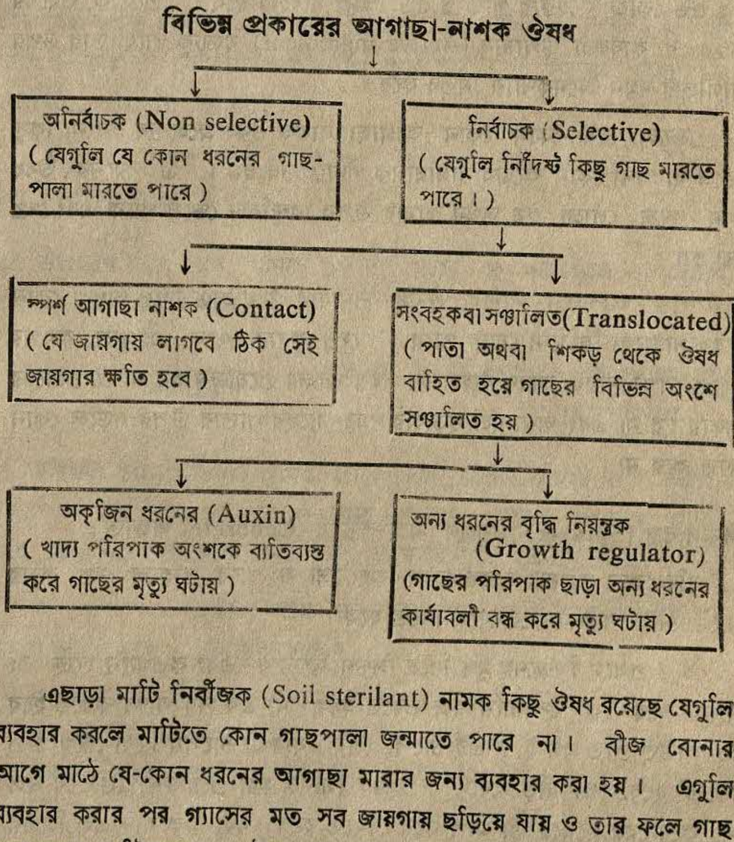
● আগাছা বা শস্যের অংকুরোদগমের পর ঔষধ প্রয়োগ (Post-emergence)—এই ধরনের ঔষধের মধ্যে বেছে বেছে আগাছা নষ্ট করার ক্ষমতা থাকে। কেবলমাত্র আগাছা মরবে কিন্তু শস্যের কোন ক্ষতি হবে না, এই ধরনের গুণ থাকবে।

● আগাছা নাশক ঔষধ ঠিক ঠিক ব্যবহার করতে হবে—

ঔষধ ঠিক ঠিক মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে কারণ মাত্রা কম হলে সন্তোষজনক ভাবে আগাছা মরবে না এবং বেশী মাত্রা শস্যের ক্ষতি করবে। কতটা জায়গায় ঔষধ দিতে হবে তার উপর নির্ভর করবে কতখানি ঔষধ লাগবে। ঠিক ঠিক মাত্রা হিসাব করতে কিছুটা সময় লাগলেও ধৈর্য্য ধরা উচিত। এর জন্য যে কোম্পানীর ঔষধ তার নির্দেশাবলী ঠিক ঠিক ভাবে পড়তে হবে এবং মেনে চলা উচিত।

● ঔষধ সুচারুভাবে ছিটাতে হবে—সমভাবে স্প্রে করার জন্য স্প্রেয়ার থেকে কিভাবে এবং কতটা জল বেরুচ্ছে এবং যে স্প্রে করবে তার হাঁটার গতি ঠিক ঠিক ভাবে নির্ণয় করতে হবে। এছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি ওয়াকিবহাল হতে হবে। যেমন যখন জোরে বাতাস বইবে তখন ঔষধ উড়ে পাশের ফসলে চলে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই জোর হাওয়ার সময় স্প্রে করতে হলে মাটি এবং স্প্রেয়ারের নজেলের দূরত্ব সমানভাবে সব সময় রাখতে হবে। যে স্প্রে করবে তার হাঁটার গতি সব সময় একই হারে থাকতে হবে, মাঝে মাঝে স্প্রেয়ার ঝাঁকিয়ে নিতে হবে যাতে নীচে কোন ঔষধ জমে না থাকে। স্প্রেয়ারের মধ্যের চাপ (pressure) যেন সমানভাবে থাকে।

● স্প্রে করার সময়—যখন খুব পরিষ্কার আবহাওয়া থাকবে তখন স্প্রে করা উচিত কারণ স্প্রে করার পর বৃষ্টি হলে ঔষধ ধুয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। সাধারণতঃ পরিষ্কার আবহাওয়াতে সকালের দিকে স্প্রে করতে পারলে ভাল।



এছাড়া মাটি নির্বীজক (Soil sterilant) নামক কিছু ঔষধ রয়েছে যেগুলি ব্যবহার করলে মাটিতে কোন গাছপালা জন্মাতে পারে না। বীজ বোনার আগে মাঠে যে-কোন ধরনের আগাছা মারার জন্য ব্যবহার করা হয়। এগুলি ব্যবহার করার পর গ্যাসের মত সব জায়গায় ছড়িয়ে যায় ও তার ফলে গাছ মরে যায়। মাটির মধ্যে এ ঔষধ কম সময়ের জন্য সক্রিয় থাকে। তাই ব্যবহার করার ৮ সপ্তাহের মধ্যে শস্যের বীজ বোনা সম্ভব হয়।

আগাছা নাশক ঔষধ কি ধরনের হয় ?

মূল অম্লের সমতুল (Acid equivalent)—যে সব আগাছা নাশক ঔষধ ব্যবহারের ফলে গাছের বৃদ্ধি কম বা বেশী হয় তাদের বেলায় এটি প্রযোজ্য। যেমন ২, ৪-ডি, এম. সি. পি. এ ইত্যাদি। মূল অম্লের সমতুল

জানা থাকলে নির্দিষ্ট ঔষধ কতখানি ব্যবহার করতে হবে তা হিসাব করে বের করা যায়। উদাহরণ থেকে এটি স্পষ্ট হবে। ধরা যাক ২, ৪-ডি লবন হেক্টার প্রতি ১.২৫ কেজি ব্যবহারের সুপারিশ রয়েছে। এখন যদি ঐ ২, ৪-ডি লবণের মূল অম্ল ৮০ শতাংশ থাকে তাহলে প্রকৃতপক্ষে (১.২৫÷৮০×১০০ =১.৫৬ কেজি) হেক্টার প্রতি ১.৫৬ কেজি ব্যবহার হবে। প্রত্যেক ঔষধের সক্রিয় ব কার্যকরী উপাদান (Active ingredient) যতটুকু থাকে তার উপর আগাছার দমন অনেকখানি নির্ভর করে।

তেলে দ্রব—কোন কোন আগাছা নাশক ঔষধ জলে দ্রব হয় না কিন্তু তেলে বা অন্য কোন অজৈব রাসায়নিক পদার্থে দ্রব হয়। এ ধরনের ঔষধ যখন জলে গোলা হয় তখন জলের উপর বিন্দুবিন্দু ভেসে থাকে এবং স্প্রে করা হয়।

দানাদার আগাছা নাশক ঔষধ—দানাদার ঔষধ হাত দিয়ে অথবা কোন যন্ত্রের সাহায্যে ছিটানো যেতে পারে। স্প্রে করার থেকে এইগুলি ব্যবহার করতে বেশী সুবিধা কারণ ব্যবহারের সময় জলের প্রয়োজন হয় না, স্প্রেয়ারের দরকার হয় না এবং দানাগুলি ছড়াবার সময় গাছের পাতার উপর পড়লে কোন ক্ষতি করে না।

সিঞ্চণ যন্ত্র (Sprayer) নিয়ন্ত্রণ সিদ্ধ করার (Calibrate) পদ্ধতি ঃ

যদি কোন স্প্রেয়ার সম্বন্ধে কোন কিছু বলা না থাকে তাহলে স্প্রে করার আগে তাকে পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে।

- প্রথমে সিঞ্চণের মুখ দিয়ে সিঞ্চণ কিভাবে এবং কতখানি হচ্ছে তা দেখতে হবে—(ক) স্প্রেয়ারে জল ভরতে হবে, (খ) এর পর পাম্প করতে হবে ৪০ পাউণ্ড প্রতি বর্গ ইঞ্চি এই চাপে, (গ) এবার ঐ চাপের মধ্যে রেখে স্প্রে করতে হবে, (ঘ) ঘড়ি দেখে স্প্রে এক মিনিট করা প্রয়োজন, (ঙ) যে জল স্প্রে করে বের হয়েছে তা মাপ করে দেখতে হবে। ধরা যাক যদি এক লিটার হয় তাহলে সিঞ্চনের গতি হবে প্রতি মিনিটে ১ লিটার বা প্রতি ঘণ্টায় ৬০ লিটার।

- এইবার স্প্রেয়ার নিয়ে স্প্রে করা কালীন সিঞ্চনের মুখ থেকে কতটা চওড়া হয়ে মাটিতে পড়ছে তা মাপতে হবে (Swath)। সাধারণতঃ ৪০ সেণ্টিমিটার-এর মত হয়।

- যে স্প্রে করবে তার হাঁটার গতি ঠিক করতে হবে। সাধারণভাবে

একজন প্রতি মিনিটে ২৫ মিটার বা প্রতি ঘণ্টায় ১.৫ কিলোমিটার ধানের জমিতে হাঁটতে পারে।

● এবার মোট কত জায়গায় (বর্গ মিটারে) ঔষধ পড়লো তা হিসাব করে বের করতে হবে। যদি প্রতি মিনিটে ২৫ মিটার করে হাঁটে এবং সেই সংগে চওড়ায় ৪০ সেণ্টিমিটার করে স্প্রে করে তাহলে ঐ সময়ের মধ্যে ১০ বর্গ মিটার জায়গায় স্প্রে হবে।

● এই ভাবে প্রতি হেক্টার স্প্রে করতে কত সময় লাগবে তা হিসাব করে বের করতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ—এক মিনিটে ১০ বর্গ মিটার স্প্রে করা গেলে এক হেক্টার জায়গা স্প্রে করতে লাগবে

$$\frac{\text{১০,০০০ বর্গ মি.} \times \text{১ মিনিট}}{\text{১০ বর্গ মিটার}} = \text{১০০০ মিনিট বা ১৬.৬ ঘণ্টা প্রতিটি মুখ থেকে (Nozzle)}$$

যদিওবা ১০০০ মিনিট সময় লাগে এক হেক্টার জায়গা স্প্রে করতে প্রকৃতপক্ষে ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ সময় নষ্ট হয় ঔষধ ও স্প্রেয়ার আনা, ঔষধ মেশানো, স্প্রেয়ার পরিষ্কার করা, বিশ্রামের সময় ইত্যাদি নিয়ে।

● এবার ১ হেক্টার জমি স্প্রে করার জন্য কতটা দ্রবণ লাগবে তা হিসাব করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ—

স্প্রেয়ারের মুখ থেকে দ্রবন বাহির হওয়ার গতি মিনিটে এক লিটার
এক হেক্টার স্প্রে করতে সময় লাগবে ১০০০ মিনিট
অতএব এক হেক্টারে মোট দ্রবণ লাগবে=মিনিটে ১ লিটার×১০০০ মি.
=১০০০ লিটার

যে সমস্ত স্প্রেয়ারের এই ধরনের হিসাব বা Calibration কোম্পানী থেকে করে দেওয়া থাকে সে ক্ষেত্রে এত কিছু করার দরকার থাকে না। তখন যে ব্যবহার করবে সে তার হাঁটার গতির সংগে স্প্রেয়ারের মুখ থেকে স্প্রে করার ক্ষমতার সংগে মিলিয়ে নির্দিষ্ট জায়গার জন্য কত দ্রবণ বা সময় লাগবে তা বাহির করবে।

স্প্রে করার সময় ও পরিশ্রম কমাবার জন্য স্প্রেয়ারের ১টির বদলে ২টি বা ৪টি মুখ (nozzle) ব্যবহার করতে পারা যায়। (চিত্র ৩৩, ৩৪, ৩৫)

আগাছা নাশক ঔষধ হিসেব করার কয়েকটি উদাহরণ

- নির্দিষ্ট জায়গার জন্য আগাছা নাশক ঔষধের পরিমাণ বার করতে হলে (ভেজা গুঁড়া / জলে গোলা গুঁড়া / দানাদার ঔষধ থেকে) এই সূত্র ব্যবহার করতে হবে।

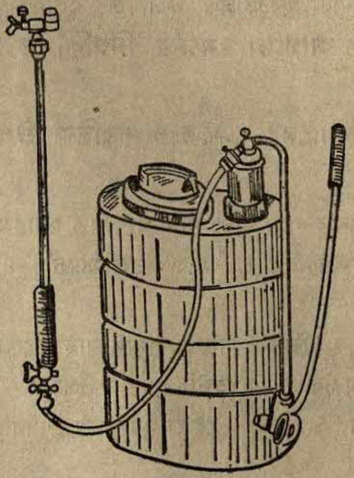
$$\text{হেক্টার প্রতি প্রয়োজনীয় ঔষধের পরিমাণ (কেজি)} = \frac{\text{হেক্টার প্রতি প্রয়োজনীয় সক্রিয় পদার্থের মাত্রা}}{\text{ঔষধের সক্রিয় পদার্থের শতকরা ভাগ}} \times ১০০ \times \text{জায়গা (হেঃ)}$$



চিত্র—৩৩ হস্ত চালিত বুম স্প্রেয়ারের (Boom Sprayer) সাহায্যে আগাছা নাশক ঔষধ ছিটানো হইতেছে



চিত্র—৩৪ এ্যাস্পি ব্যাকপ্যাক স্প্রেয়ারের সংগে স্প্রেবুম লাগান রয়েছে



চিত্র—৩৫ একটি ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার

উদাহরণ : ২৫০০ বর্গমিটারে, হেক্টার প্রতি ৩ কেজি ৫০ শতাংশ, জলে গোলা ঔষধ ছিটাতে হলে কতখানি ঔষধ লাগবে ?
হার=হেক্টার প্রতি ৩ কেজি ; জায়গা=২৫০০ বর্গ মিটার=০.২৫ হেক্টার ; সক্রিয় পদার্থের শতকরা ভাগ=৫০

$$\text{প্রয়োজনীয় ঔষধের ওজন} = \frac{১০০\times৩\times০.২৫}{৫০} = ১.৫ \text{ কেজি}$$

● নির্দিষ্ট জায়গার জন্য তরল ঔষধের ঘনত্ব বাহির করার জন্য নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার করতে হবে—

$$\frac{\text{হেক্টার প্রতি প্রয়োজনীয় সক্রিয় পদার্থের মাত্রা (গ্যালনে)}\times\text{জায়গা (হে.)}}{\text{উৎপন্ন দ্রব্যে সক্রিয় পদার্থ (গ্যালন / লিটারে)}}$$

উদাহরণ : ৫০০ বর্গমিটার জায়গায় এম.সি.পি.এ ই-সি ৪পাউণ্ড / গ্যাঃ ঔষধ দিয়ে স্প্রে করতে গেলে কত লিটার ঔষধ লাগবে। যার মাত্রা হচ্ছে হেক্টার প্রতি ০.৮ কেজি।

মাত্রা=০.৮ কেজি প্রতি হেক্টারে=হেক্টারে ৮০০ গ্রাম ; জায়গা=৫০০ বর্গ মিটার=০.০৫ হেক্টার ; সক্রিয় পদার্থ=গ্যালনে ৪ পাউণ্ড=৪০০ গ্রাম / লিটার

$$\text{প্রয়োজনীয় এম.সি.পি.এ.-এর ঘনত্ব} = \frac{৮০০\times০.০৫}{৪০০} = ০.১০ \text{ লিটার}$$

বিভিন্ন বিজ্ঞানীর পরীক্ষালব্ধ ফলাফল একত্রিত করলে ধানের ক্ষেতে রাসায়নিক পদ্ধতিতে আগাছা দমনের নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি খুবই কার্যকরী।

• বোনা আউস ধানের ক্ষেতে রাসায়নিক ঔষধ দিয়ে আগাছা দমন।

(ক) ধান বোনার পরে অথচ ধান অঙ্কুরিত হবার আগে যে সব আগাছা নাশক ঔষধ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে তরল ম্যাচেটি বা তরল টক-ই-২৫ খুব কার্যকরী।

হেক্টার প্রতি ২ লিটার সক্রিয় পদার্থ নাইট্রোফেন (Nitrofen) তরল (যার বাজারের নাম টক-ই-২৫ হেক্টার প্রতি ৮ লিটার) ৬০০ লিটার জলে গুলে বীজ বোনার ১ দিন পরে জমির সমস্ত জায়গায় স্প্রে যন্ত্রের সাহায্যে ছিটিয়ে দিতে হবে।

অথবা, হেক্টার প্রতি ১.৫ লিটার সক্রিয় পদার্থ বুটাক্লোর (Butachlor) (যার বাজারের নাম ম্যাচেটি (Machete E.C) তরল হেক্টার প্রতি তিন লিটার) একই পরিমাণ জলে একইভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

অথবা,

হেক্টার প্রতি ৩ লিটার সক্রিয় পদার্থ বেনথিওকারব (Benthiocarb-যার বাজারের নাম স্যাটার্ণ ৫০ শতাংশ সক্রিয় পদার্থ হেক্টোর প্রতি ৬ লিটার) ৬০০ লিটার জলে মিশিয়ে বীজ বোনার একদিন পরে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

ধানের চারা বেরোবার পর ও আগাছার বীজ অংকুরিত হয়ে গেলে যেসব আগাছা নাশক ঔষধ ব্যবহার করা হয় (post emergence) তার মধ্যে প্রপানিল (propanil—যার বাজারে প্রচলিত নাম ষ্ট্যাম-এফ-৩৪) সব চাইতে বেশী কার্য্যকরী।

হেক্টার প্রতি ৩ লিটার সক্রিয় পদার্থ প্রপানিল তরল (যার বাজারের নাম ষ্ট্যাম-এফ-৩৪ তরল হেক্টার প্রতি ৮.৫ লিটার) ৬০০ লিটার জলে গুলে ঘাস জাতীয় আগাছা যখন ৩ থেকে ৪ পাতার হয় (অর্থাৎ প্রায় বীজ বোনার ১৮ থেকে ২৫ দিন পর) তখন স্প্রে যন্ত্রের সাহায্যে ছিটিয়ে দিতে হয়।

অথবা,

যদি ক্ষেতে ঘাস ও চওড়া পাতার আগাছা উভয়েরই উপদ্রব হয় তাহলে প্রপানিল এবং ২, ৪-ডি ৬০০ লিটার জলে মিশিয়ে বীজ বোনার একমাস

পরে স্প্রে করতে হবে। এক্ষেত্রে ঔষধের মাত্রা হবে হেক্টার প্রতি প্রপানিল তরল ২ লিটার সক্রিয় পদার্থ (যার বাজারে প্রচলিত নাম ষ্ট্যাম-এফ-৩৪ হেক্টারে ৬ লিটার তরল) এবং ২, ৪-ডি সোডিয়াম লবণ ৮০০ গ্রাম 'অম্ল সমতুল' (যার বাজারের নাম ফারনক্সন ২, ৪-ডি ১ কেজি হেক্টার প্রতি)

- **নীচু জমিতে রোয়া ধানে বা সরাসরি কলানো বীজ ছড়ানো অবস্থাতে রাসায়নিক পদ্ধতিতে আগাছা দমন**

রোয়া ধানের ক্ষেতে সাধারণতঃ জল দাঁড়ানো থাকে বলে অনেক আগাছা যা আউশ ধানের জমিতে জন্মে তা এখানে থাকে না। সব সময় জল দাঁড়ানো থাকে বলে দানাদার জাতীয় আগাছা নাশক ঔষধ (Granular herbicide) ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়।

হেক্টার প্রতি ২০ থেকে ৩০ কেজি ৫ শতাংশ ম্যাচেটি দানাদার (১ থেকে ১.৫ কেজি সক্রিয় বুটাক্লোর)

অথবা, ২২ থেকে ৩০ কেজি ৭ শতাংশ টক দানাদার (১.৫ থেকে থেকে ২ কেজি সক্রিয় ৮ শতাংশ নাইট্রোজেন)

অথবা, হেক্টার প্রতি ১৫ কেজি ১০ শতাংশ স্যাটার্ণ দানাদার (১.৫ কেজি সক্রিয় বেনথিওকারব) ধান রোয়ার ৬ থেকে ৮ দিন পরে সমস্ত জমিতে হাতে করে সমানভাবে ছড়িয়ে দিলে সব আগাছা মরে যায়। এই পদ্ধতিতে কোন স্প্রেয়ার যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না এবং জমিতে স্প্রেয়ার যন্ত্রের জন্য জল টেনে নিয়ে যেতে হয় না। একটা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে দানাদার ওষুধ ব্যবহার করতে হলে আমন ধানের জমিতে অন্ততঃ ৫ সেন্টিমিটারের মত জল থাকা দরকার এবং ঐ জলের মধ্যে ঔষধ ছিটিয়ে দিতে হয়।

যদি দানাদার আগাছা নাশক ঔষধ না পাওয়া যায় তবে তার পরিবর্তে ৬ লিটার ৩৫ শতাংশ ষ্ট্যাম-এফ-৩৪ (২ লিটার সক্রিয় প্রপানিল) এর সাথে ১ কেজি ফারনোক্সোন বা টার্ফিসিড ২, ৪-ডি (৮০০ গ্রাম সক্রিয় ২, ৪-ডি) ৬০০ লিটার জলে এক সংগে ভালভাবে মিশিয়ে এক হেক্টার জমিতে ধান রোয়ার একমাস পরে জলজমি থেকে বের করে দিয়ে আগাছার উপর স্প্রে করতে হবে। ২-৩ দিন পরে আবার জল জমিতে ঢোকাতে হবে।

যদি ক্ষেতে বেশী-পরিমাণে মোথা জাতীয় আগাছা থাকে তবে ধান রোয়ার একমাস পরে ৩ লিটার বাসাগ্রান (Basagran) ঔষধ ৬০০ লিটার জলে গুলে ধানের জমি থেকে জল বের করে মোথাজাতীয় আগাছার উপর

ঔষধ স্প্রে করতে হবে। বাসাগ্রান ভালভাবে যে কোনো মোথা জাতীয় আগাছা নষ্ট করে।

শেওলা জাতীয় আগাছার উপদ্রব হলে হেক্টার প্রতি ১৫ কেজি তুঁতে অথবা ২ কেজি সক্রিয় টক দানাদার বেসটেন ছড়িয়ে দিতে হবে।

রাসায়নিক পদ্ধতিতে আগাছা দমনের অর্থনৈতিক হিসাব

বোনা আউস ধানের ক্ষেতে (একর প্রতি হিসাব)

স্ট্যাম-এফ-৩৪ ৪০ টাকা লিটার দরে ৩ লিটারের দাম হবে ১২০৲ টাকা

টক -ই-২৫ ৪০ টাকা লিটার দরে ৩ লিটারের দাম হবে ১২০৲ ট্যাকা

ম্যাচেটি ৫৫ টাকা লিটার দরে ১$\frac{১}{২}$ লিটারের দাম হবে ৮২.৫০ টাকা

কিষাণ দিয়ে হাত নিড়ানি ২ বার দিতে (দিনে ৮ টাকা হিসাবে)

১৬০৲ × ২ = ৩২০.০০ টাকা

রোয়া ধানের জমিতে (একর প্রতি হিসাব)

ম্যাচেটি দানাদার ঔষধ ৭ টাকা কেজি দরে ১৬ কেজির দাম=১১২৲

টক দানাদার ঔষধ ৮৲ টাকা কেজি দরে ১০ কেজির দাম=৮০৲

স্ট্যাম এফ-৩৪ ঔষধ ৪০৲ টাকা লিটার দরে ৩ লিটারের দাম=১২০৲

২, ৪-ডি ঔষধ ৩০৲ টাকা কেজি দরে ৪০০ গ্রামের দাম=১২৲

আর কিষাণ দিয়ে হাত নিড়ান ২ বার দিতে (৮৲ টাকা দিনে)=৩২০৲

* স্প্রেয়ার ভাড়া ও শ্রমিক ব্যয় নিয়ে রাসায়নিক পদ্ধতিতে আরো ১২৲ টাকা খরচ বেশী পড়বে।

উপসংহার ঃ

ধানের আশানুরূপ ফলন পেতে গেলে আগাছা দমনকে কোন অংশে অবহেলা করা যায় না। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে আগাছা দমন না করলে রোয়া ধানের ক্ষেত্রে শতকরা ১৫-২০ ভাগ, আউস ধানের ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ এবং কাদানো জমিতে অঙ্কুরিত বীজ ছিটালে প্রায় শতকরা ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ ফলন কমে যায়। পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ ও হাত নিড়ানী দেওয়া ছিল চিরাচরিত আগাছা দমনের প্রথা। নতুন ধানের সংগে রাসায়নিক পদ্ধতিতে ও আগাছা দমন এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করেছে। তবে এপদ্ধতি গ্রহণ করার আগে ব্যবহারকারীকে অনেক কিছু বিষয়ে ওয়াকিবহাল হতে হবে যেমন কি ধরণের আগাছা হয়েছে, তার বয়স কত, ধান গাছের বয়স কত, এ

সবের জন্য কোন ধরণের ঔষধ লাগবে, পারিবার্শ্বিক অবস্থা কি, আবহাওয়া কেমন, যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবস্থা আছে কিনা এবং পরিশেষে তা আয় দেবে কিনা ইত্যাদি। এ সবের বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা হয়েছে। প্রত্যেক পদ্ধতির মধ্যে কিছু কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে, কোন পদ্ধতিই সব দিক থেকে ভাল না। তাই সুসংহত আগাছা দমনের (integrated weed management) উপর বেশী জোর দেওয়ার প্রয়োজন।

অধ্যায় বার

ধানের কীটশত্রু ও তার প্রতিকার

(Insect of Rice and its Control)

অধ্যায় বার

ধানের কীট শত্রু ও তার প্রতিকার

ভূমিকা

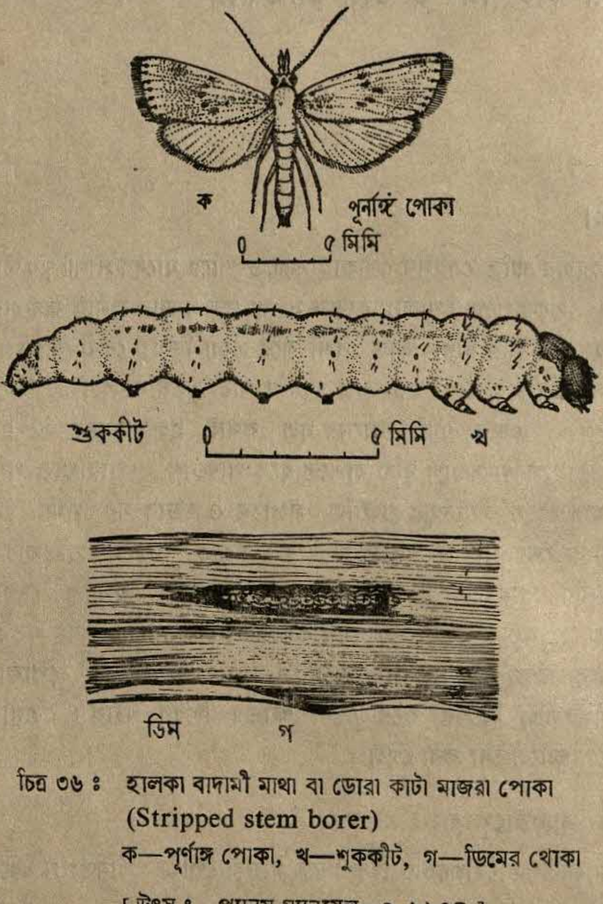
ফসলের ক্ষতি সেইসব পোকাই করতে পারে যাদের সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। প্রকৃতপক্ষে পোকামাকড়ের সংখ্যা দ্রুত বাড়ার জন্যই ফসলের ক্ষতি বেশী হয়। আর যারা ক্ষতি বেশী করে তারা ডিমও বেশী পাড়ে। সেসব ডিম থেকে যে কীড়া বের হয় তারা যেমনি খায় তেমনি ক্ষতিও করে বেশী পরিমাণে। এজন্য এগুলি দমনের মূল কথাই হল তাদের সংখ্যা সীমিত করা। তাই সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে পরিবেশ ও পরিস্থিতি পরিবর্তনের উপর যার সংগে কীট শত্রুর প্রজাতি, সংগঠন ও স্বভাব সব সময় বদলাচ্ছে। এই পরিবর্তনের ধারা ও পদ্ধতি অনুধাবন করতে পারলে প্রতিকার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা সম্ভব। হিসাবে দেখা গেছে (পাঠক '১৯৭০) যে পোকা দমন করতে পারলে ধানের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ ফলন রক্ষা করা সম্ভব। বর্তমানে ধানের ৭০টি কীট পোকার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ করে বেশী ক্ষতির কারণ ঘটায়। এগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

ধানের মাজরাপোকা :

আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মাজরা পোকা প্রধানতঃ ৪ ধরণের হয়

- হালকা বাদামী মাথা বা ডোরা কাটা মাজরা পোকা
  [Stripped stem borer ; Chilo suppressalis (walker)
  C. polychrysa (Meyrick), C. partellus (Swinhoe) ;
  C. auricili (Dudqeu) নামে কতকগুলি প্রজাতি আছে।

এই পোকার মথের রঙ হালকা বাদামী, প্রথম জোড়া ডানার নীচের দিকে ধার দিয়ে গাঢ় বাদামী ফোঁটা ফোঁটা দাগ থাকে, প্রায় ১১ মিলিমিটারের মত লম্বা হয়, শুক কীটের গায়ে ৪-৫টি লম্বা ডোরা দাগ থাকে, হালকা বাদামী কালো রঙের, ১৭ মিলিমিটারের মত লম্বা হয় (চিত্র ৩৬)।



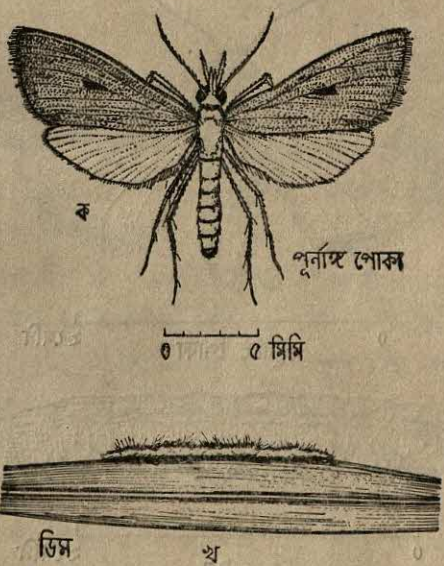
চিত্র ৩৬ : হালকা বাদামী মাথা বা ডোরা কাটা মাজরা পোকা
(Stripped stem borer)
ক—পূর্ণাঙ্গ পোকা, খ—শুককীট, গ—ডিমের থোকা

[উৎস : প্যানস ম্যানুয়েল—৩, ১৯৭৪]

মথেরা একসংগে অনেক ডিম পাড়ে সাধারণতঃ পাতার নীচের দিকে ও কাণ্ডবেষ্টক পত্রাবরণীর ভিতরে। ডিমগুলির রঙ হয় সাদা এবং শুকনো পাতার মত দেখতে লাগে, পাঁচ দিনের মধ্যে ডিম থেকে পোকা বেরিয়ে আসে। ডিম ফোটার পর যদি ক্ষিদে পায় তাহলে শুক কীটগুলি পাতার ধার ও কাণ্ডবেষ্টক পত্রাবরণীর সবুজ অংশ খেতে থাকে। পরে পাশকাঠি ফুটো করে ভিতরে ঢোকে। শুককীটগুলি প্রথমের দিকে একটু কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করে কিন্তু পরে এক পাশকাঠি থেকে অন্য পাশকাঠিতে আক্রমণ করে।

● **হলদে রঙের মাজরা পোকা** (Yellow stem borer ; *Scirpophaga incertulas* (walker) [= *Triporyza incertulas*, walker]

শুককীট লম্বাটে, প্রায় ১৭ মিলিমিটারের মত লম্বা, হালকা ঘিয়ে রঙের। পূর্ণাঙ্গ মথ প্রায় ১৫ মিলিমিটারের মত লম্বা হয়, লম্বাটে, রঙ খড়ের মত এবং কিছুটা সূচলো মাথা (চিত্র ৩৭)। স্ত্রী পোকার ডানার মাঝে স্পষ্ট কালো দাগ থাকে।



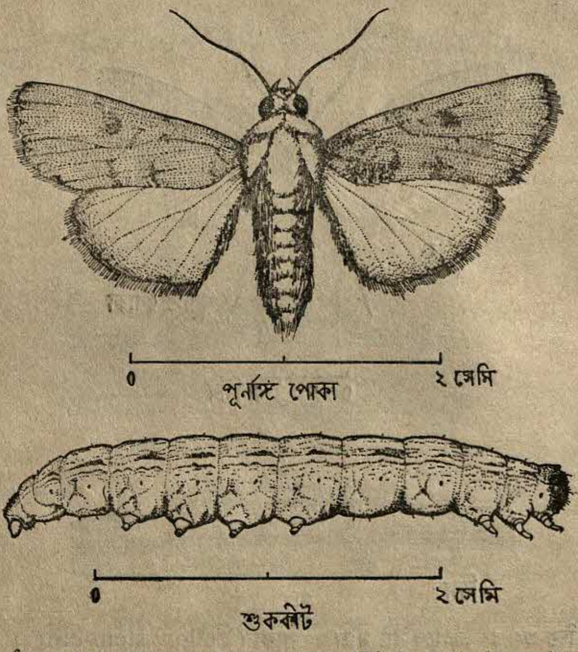
চিত্র ৩৭ : হলদে রঙ মাজরা পোকা (Yellow stem borer)
ক—পূর্ণাঙ্গ পোকা, খ—ডিমের থোকা

[উৎস : প্যানস ম্যানুয়েল নং—৩, ১৯৭৪]

মথ পাতার উপরে ডগার দিকে গোল গোল ডিম একসংগে অনেক পাড়ে। ডিমগুলি নরম ও লোম দিয়ে ঢাকা থাকে। প্রায় ৯ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে পোকা বের হয়। অবশ্য বিভিন্ন ঋতুর জন্য কিছুটা পার্থক্য হয়। আক্রমণের প্রথমের দিকে শুক আলাদা আলাদা ভাবে থাকে এবং এক পাশকাঠি থেকে অন্য পাশকাঠিতে যায় না। পুত্তলী গাছের গোড়ার দিকের পাশকাঠির মধ্যে থাকে।

● **লালচে রঙের মাজরা পোকা** (Pink stem borer ; *Sesamia inferens* (walker)

কীড়ার রঙ হয় লালচে বাদামী, ২৫ মিল্লিমিটারের মত লম্বা ও ৬ মিলিমিটারের মত চওড়া হয়। মাজরা পোকার বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে এগুলি সব থেকে বেশী ও মোটা হয়। পূর্ণাঙ্গ মথ প্রায় ১৮ কিলোমিটারের মত লম্বা ও ৮ মিলিমিটারের মত চওড়া হয় (চিত্র ৩৮), রঙ হয় গাঢ় মোটা বাদামী।



চিত্র ৩৮ : লালচে রঙ মাজরা পোকা (Pink stem borer)
ক—পূর্ণাঙ্গ পোকা, খ—শুককীট
[উৎস : প্যানস ম্যানুয়েল নং—৩, ১৯৭৪]

ডিম শম্বুকের মত দেখতে লাগে। ডিম সারি করে কাণ্ডবেষ্টক পত্রাবরনীর মধ্যে থাকে। এর মধ্য থেকে বের করা খুব সহজ হয় না।

শুক পাশকাঠি ফুটো করে খায়। পাশের পাশকাঠি খুব কম খায়। পুত্ত পাশকাঠির মধ্যে নালায় থাকে। এটি সাধারণতঃ গাছের গোড়ার দিকে হয়।

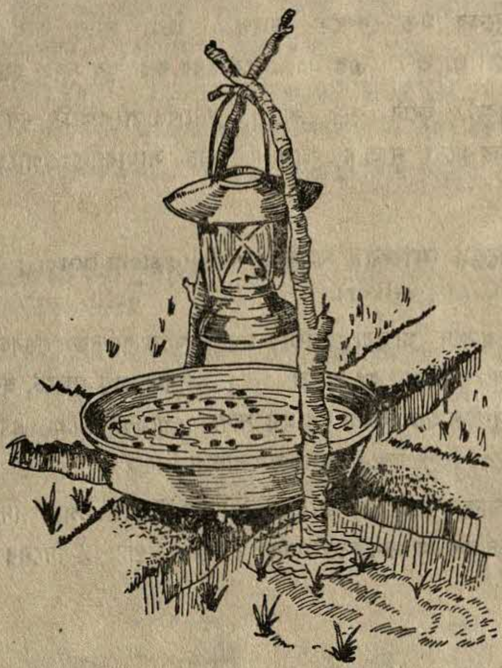
- **সাদা রঙের মাজরা কীট** (White stem borer ; *Tryporyza innotata* (walker)

শুককীট হলদে মাজরা পোকার মত দেখতে ব্যতিক্রম কেবল রঙ সাদা হয়। তবে সুঙ্গ জোড়ার রঙ কালো হয়। পূর্ণাঙ্গ মথ লম্বাটে, হলদে মাজরা পোকার মত দেখতে হয় কেবল রঙ হয় সাদা, পেটের কাছে একটা লালচে রঙের বিন্দু থাকে, কিন্তু পিঠে কোন কালোদাগ থাকে না।

মথ গোলাকার ডিম এক জায়গায় পাতার উপরে ডগার দিকে পাড়ে। ডিমের গাদা লোমশ আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। প্রায় ৯ দিনের মধ্যে ডিম পাড়ে।

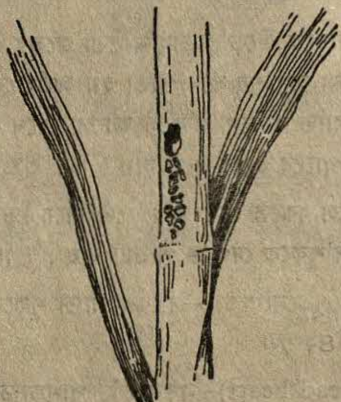
মাজরা পোকার দ্বারা আক্রান্ত গাছের লক্ষণ

- মাজরা পোকার ডিম সাধারণতঃ গোলাকার হয় এবং ডিমের থোকা সরু লোম দিয়ে ঢাকা থাকে অবশ্য কিছু কিছু ডিম পাতলা মাছের আঁশের মত আবরণও দিয়েও ঢাকা থাকে।
- মাজরা পোকা চারদিকে উড়ে বেড়ায় নয়তো জলের উপর ভেসে থাকে। এগুলিকে ধরার জন্য আলোর ফাঁদ পাতা হয় অর্থাৎ কোন জলের পাত্রের উপর কেরোসিন বাতি বসানো থাকলে আলো দেখে রাত্রে যখন পোকা ছুটে আসে তখন পাত্রের জলে পড়ে যায় (চিত্র ৩৯)।
- ডাঁটায় ফুটো থাকলে বুঝতে হবে শুক ফুটো দিয়ে ভিতরে চলে গেছে। ডাঁটা চিরে ফেললে শুককে দেখতে পাওয়া যায়। (চিত্র ৪০, ৪১)।
- মাঝের কচি পাতা শুকনো হওয়া—মাঝের পাতা শুকনো হয় ও টান দিলে উঠে আসে (চিত্র ৪২)।
- মরা পাশকাঠি (Dead heart)—নতুন কচি পাশকাঠির গোড়া পোকায় কেটে দিলে শুকনো হতে আরম্ভ করে (চিত্র ৪৩)



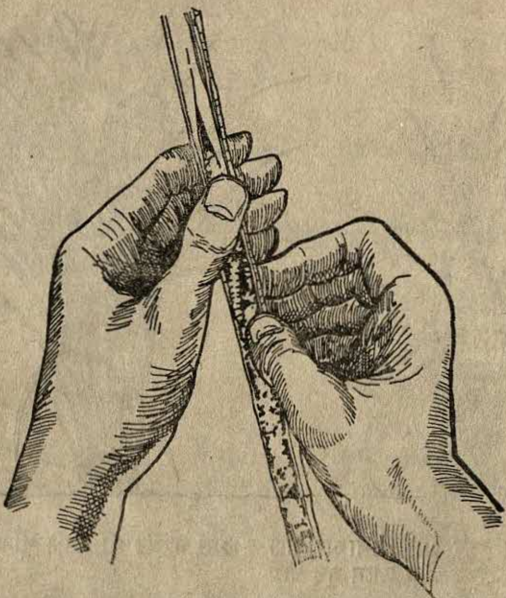
চিত্র ৩৯ঃ ধান জমির মধ্যে এই ধরণের আলোক ফাঁদ পাতা হলে পোকা কেরোসিন লণ্ঠনের আলোয় আকৃষ্ট হয় এবং পরে মরে গামলার জলে ভাসতে থাকে

[উৎস ঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর আর. আই, ১৯৭০]



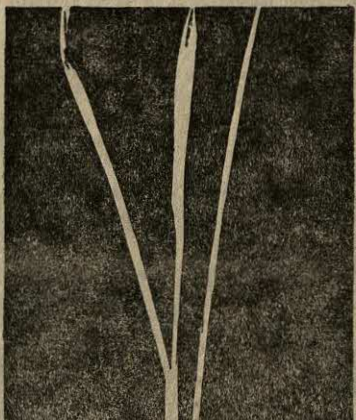
চিত্র ৪০ ঃ মাজরা পোকার আক্রমণ হলে গাছের কাণ্ডে এরূপ ফুটো দেখা যায়।

[উৎস ঃ রাইস প্রেডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই, ১৯৭০]



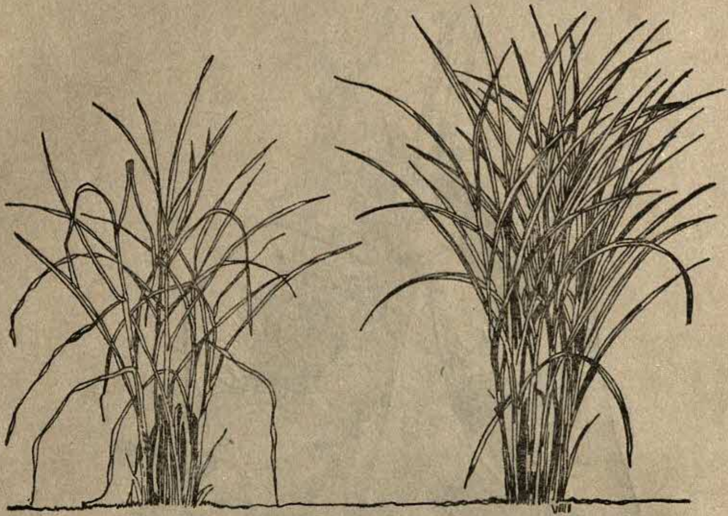
চিত্র ৪১ : মাজরা পোকা আক্রান্ত গাছের কাণ্ড লম্বালম্বিভাবে কেটে দেখলে এভাবে শূককীট ভেতরে দেখা যায়

[উৎস : রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই, ১৯৭০]



চিত্র ৪২ : মাজরা পোকার দ্বারা আক্রান্ত নরম পাতা এভাবে বেঁকে যেতে দেখা যায় ও ক্রমে শুকনো হয়

[উৎস : রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই, ১৯৭০]



চিত্র ৪৩ : বামে মাজরা পোকার দ্বারা আক্রান্ত গাছের পাশকাঠি শুকিয়ে গেছে এবং ডানে সুস্থ গাছ

[উৎস : রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই. ১৯৭০]



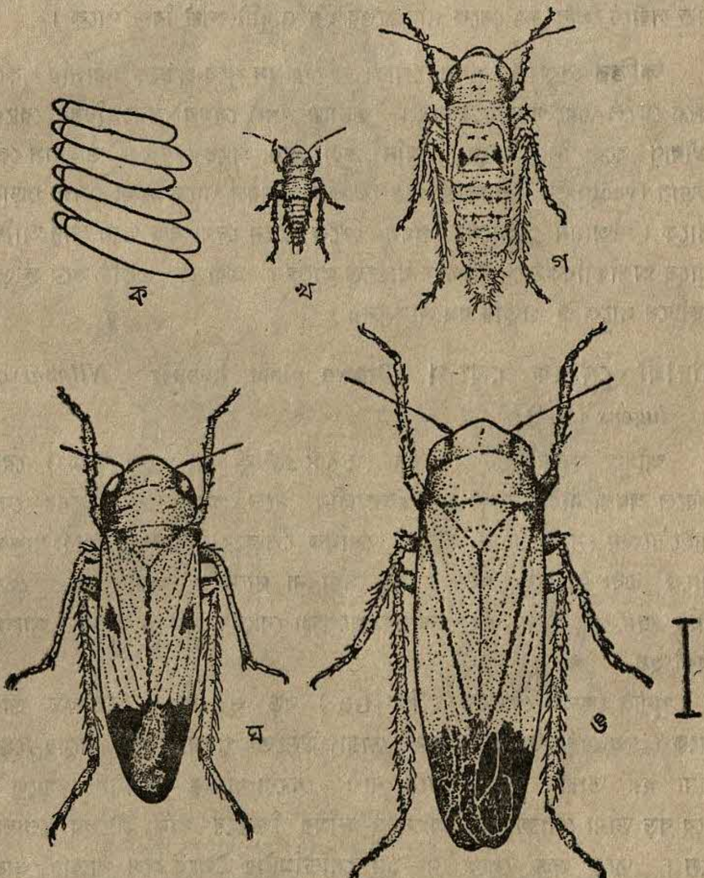
চিত্র ৪৪ : মাজরা পোকার দ্বারা আক্রান্ত গাছের সাদা শীষ

[উৎস : রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই. ১৯৭০]

● সাদা শীষ (white head)—ফুল আসার সময় অথবা থোড়ের সময় মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে কিছু শীষ শুকনো হতে আরম্ভ করে এবং শীষের ধান চিটে হয়। এগুলি দেখতে সাদা (চিত্র ৪৪)

শ্যামা পোকা (Green leaf hopper ; *Nephotettix virescens* (Distant) and *N. nigropictus* (stal)

শ্যামা পোকার মধ্যে এই ধরনের সবুজ পাতা রঙের পোকাই ভারতে বেশী (চিত্র ৪৫)।



চিত্র ৪৫ : শ্যামা পোকা (Green leaf hopper—*Nephotettix impicticeps*)
ক—ডিম, খ—প্রথমদশা, গ—পঞ্চম দশা, ঘ—পূর্ণাঙ্গ পুরুষ পোকা, ঙ—পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পোকা

[উৎস : রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই, ১৯৭০]

পূর্ণাঙ্গ পোকা বিশেষ করে পুরুষ পোকার রঙ সবুজ এবং পাখায় কালো রঙের বিন্দু রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ পোকার কোন আড়াআড়ি দাগ নেই। ছোট পোকা হালকা সবুজ বা ভিন্ন রঙেরও হতে পারে এবং লম্বায় প্রায় ৩.৭ মিলিমিটারের মত। পোকা দেখতে কীলকার মত হয় অর্থাৎ শরীরের সামনেটা চওড়া ও পিছনের দিক ক্রমে সরু, সামনের পাখার দুদিকে একটি করে কালো দাগ বা পাখার শেষেব দিকে কালো থাকে। অপরিমিত কীট ছোট হয় ও পাখা থাকে না ও রঙ হয় হালকা সবুজ। ডিম কলার মত লম্বাটে, সাদা রঙ থেকে গাঢ় রঙের হয় ও দুটি স্পষ্ট বিন্দু থাকে।

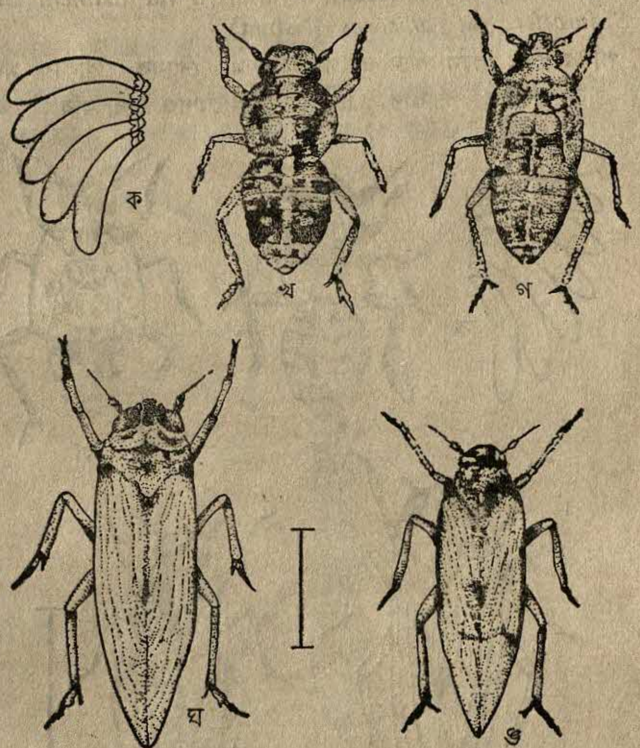
ক্ষতির প্রকৃতি—শ্যামা পোকা পাতার রস শুষে গাছকে সরাসরি শুকনো করে ফেলে এবং গাছ মরে যায়। এছাড়া মশা যেমন ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বয়ে নিয়ে যায় তেমনি এরা ধান গাছের টুংরো ভাইরাস রোগ ছড়ায় (vector)। আক্রান্ত গাছ থেকে সুস্থ সবল গাছে এসব রোগ ছড়াতে থাকে। আমন মরসুমের প্রথম থেকে ধানে দেখা যায় তবে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে অস্বাভাবিকভাবে সংখ্যায় বাড়তে থাকে। এরা এক একটি করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে ও পাতার রস শুষে নেয়।

বাদামী শোষক পোকা (**Brown plant hopper**; *Nilaparvata lugens* (**stål**)

অধিক ফলনশীল ধান ঘন (১৫×১৫ বা ১৫×১০ সেমি) রোয়া করলে অথবা নাইট্রোজেন সার এককালীন দিলে অথবা প্রয়োজনের বেশী নাইট্রোজেন সার দিলে বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং ব্যাপক শস্য হানির সম্ভাবনা থাকে। জলদি জাত থেকে নাবি জাতের ধানে এবং আমন অপেক্ষা বোরো ধানে এ পোকার আক্রমণ বেশী হয়।

পূর্ণাঙ্গ শোষক পোকার (চিত্র ৪৬) বড় ও ছোট উভয়রকম ডানা থাকে। যাদের বড় ডানা থাকে তারা উড়তে পারে কিন্তু যাদের ছোট ডানা হয় তারা উড়তে পারে না। বোরো ধানের ফুল আসার আগে বা পরে বড় ডানা পোকা উড়ে আসে ও জমির ভিতরে ধান গাছের গোছায় বসে। তবে জল থেকে ৭—১০ সেন্টিমিটার উপরে বসে পাতার খোলা বা গাছের কাণ্ড থেকে রস চুষে খায়। পরে স্ত্রী পোকা পাতার খোলায় বা পাতার মাঝের শিরার ভিতরে ডিম পাড়ে। এই ডিম থেকে প্রতি গোড়ায় ৩০/৪০টি কীড়া বের হয়। ১৮ থেকে ২০ দিন পরে ছোট

ডানা যুক্ত পূর্ণাঙ্গ পোকাতে পরিণত হয়। যেহেতু উড়তে পারে না, সেজন্য এদের স্ত্রী পোকা যে গাছে আক্রমণ করে সে গাছেই অনেক ডিম পাড়ে। এ ডিম থেকে পুনরায় ১২—১৫ দিন পরে ছোট ডানা যুক্ত পূর্ণাঙ্গ পোকা তৈরী হয়। এরাও উড়তে পারে না। তাই গাছের গোছায় পোকার সংখ্যা ২০০—৩০০টি বা তারও বেশী হলেও আক্রান্ত গোছায় ক্ষতির কোন লক্ষণ পায় না। এদের স্ত্রীপোকা আক্রান্ত গাছে অসংখ্য ডিম পাড়ে ও



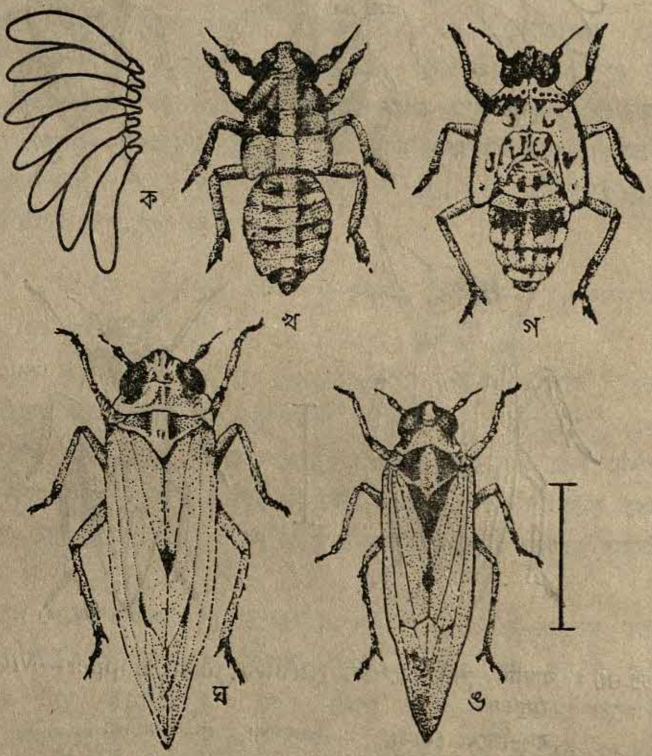
চিত্র ৪৬ঃ বাদামী শোষক পোকা (Brown plant hopper—*Nilaparvata lugens*)
ক—ডিমের থোকা, খ—প্রথমদশা, গ—পঞ্চমদশা
ঘ—পূর্ণাঙ্গ স্ত্রীপোকা ঙ—পূর্ণাঙ্গ পুরুষ পোকা
[উৎস ঃ রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই, ১৯৭০]

বংশবিস্তার করে। শীষ পেকে আসতে আরম্ভ করলে মাটি থেকে রস কম নিতে পারে। ফলে আক্রান্ত গাছগুলি ঝলসে যায় ও ঢলে পড়ে। যেহেতু

পূর্ণাঙ্গ পোকা বড় ডানা যুক্ত হয়, তারা আক্রান্ত গোছা শুকিয়ে গেলে চারিদিকের কাছাকাছি গোছাগুলি আক্রমণ করে। সেগুলি শুকিয়ে গেলে তার পাশের গোছা আক্রমণ করে। এইভাবে সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়ে। যদি শতকরা ৬০ ভাগ ধান পাকার পর এর আক্রমণ বোঝা যায় তবে কোন কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ না করে সংগে সংগে ধান কেটে দিলে বিশেষ ক্ষতি হবে না।

সাদা পিঠ ডাঁটা শোষক পোকা (Write back plant hopper ; *Sogatella furcifera* (Hon), *S. furcifera* var *distincta* (Distant), *S. furcifera* var *palliscens* (Distnat)

পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জায়গায় বাদামী শোষক পোকার মত সাদা পিঠ ডাঁটা শোষক পোকার (চিত্র ৪৭) আক্রমণও দেখা যায়। এর মধ্যে

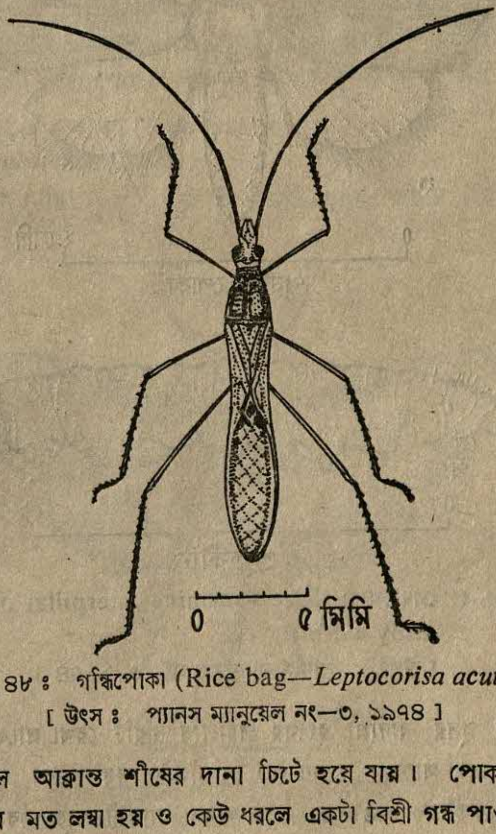


চিত্র ৪৭ : সাদা পিঠ ডাঁটা শোষক পোকা (white back plant hopper —*Sogatella furcifera*)
ক—ডিমের থোকা, খ—প্রথমদশা, গ—পঞ্চমদশা,
ঘ—পূর্ণাঙ্গ স্ত্রীপোকা, ঙ—পূর্ণাঙ্গ পুরুষ পোকা
[উৎস : রাইস প্রোডাকসন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই, ১৯৭০]

যেগুলি প্যানিসেন্স জাতীয় সেগুলি পাতার চাঁদোয়ার (canopy) নীচে ডাঁটায় আক্রমণ করে কিন্তু 'ডিসটিনকৃটা' জাতীয় পোকা পাতার উপরের দিকে দেখা যায়। আক্রান্ত গাছ স্থানে স্থানে ঝলসে যায় ও চাক চাকভাবে বসে যায়। সময় সময় উভয় ধরনের শোষক পোকা একই সংগে দেখা যায় কিন্তু তাদের তাপমাত্রা সহনশীলতার তারতম্য থাকায়, বেশী গরম জায়গায় কেবলমাত্র সাদা পিঠ ডাঁটা শোষক পোকাকেই দেখতে পাওয়া যায়।

গন্ধিপোকা (Rice bug ; *Leptocorisa acuta* (Thunberg)

ধানের গন্ধিপোকা (চিত্র ৪৮) একটি বিশেষ ক্ষতিকারক পোকা হিসাবে গণ্য করা হয়। এরা ধানের দানা যখন দুধ অবস্থায় থাকে তার দুধ শুষে



চিত্র ৪৮ : গন্ধিপোকা (Rice bag—*Leptocorisa acuta*)
[উৎস : প্যানস ম্যানুয়েল নং—৩, ১৯৭৪]

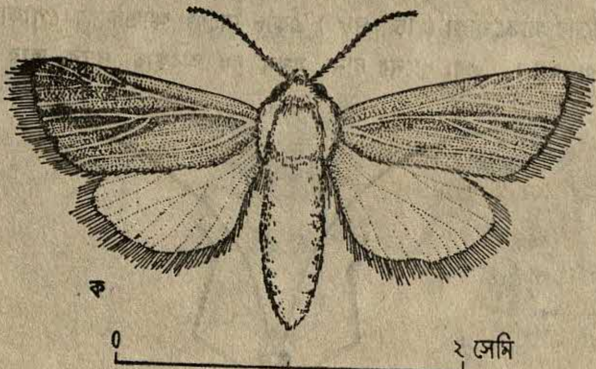
নেয়। ফলে আক্রান্ত শীষের দানা চিটে হয়ে যায়। পোকা প্রায় ১৫ সেন্টিমিটারের মত লম্বা হয় ও কেউ ধরলে একটা বিশ্রী গন্ধ পাওয়া যায়।

এগুলি বিশেষ করে দিনের আলো যখন কম থাকে অর্থাৎ খুব সকালে

বেশী ক্ষতি করে এবং দিনের আলো বাড়ার সংগে সংগে গাছের গোড়ায় লুকিয়ে পড়ে। পাতার উপর সারি করে গোলাকার ও বাদামী রঙের ডিম পাড়ে। জ্যৈষ্ঠের দিকে ঘাসে বংশ বাড়ায় ও পরে উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়ায় আউস ধানে আক্রমণ করে।

লেদা পোকা (Swarming caterpillar or army worm ; (*Spodoptera mauritia* (Boiduval)

পূর্ণাঙ্গ লেদা পোকা (চিত্র ৪৯) কফির মত হালকা বাদামী রংয়ের





চিত্র ৪৯ : লেদাপোকা (Rice swarming caterpillar or Rice army worm)
[উৎস : প্যান্স ম্যানুয়েল নং—৩, ১৯৭৪]

এবং সংগে ধূসর বাদামী রংয়ের লম্বালম্বি চারটি রেখা থাকে যার দুপাশে লাল আভা রেখা থাকে। প্রায় ৩০ মিলিমিটার লম্বা এবং ৬ মিলিমিটার চওড়া। শুককীটের রঙ হয় সবুজ অথবা বাদামী সবুজ এবং সংগে পাখার প্রতিটি ভাগে কালো দাগ থাকে।

পাতার উপর গাদা গাদা ডিম পাড়ে এবং তা আঁশের মত শল্ক পত্র দিয়ে ঢাকা থাকে।

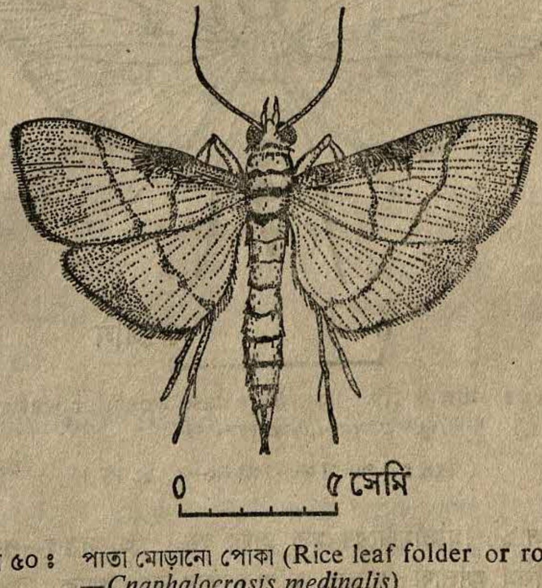
ধানের চারা অবস্থায় সাধারণতঃ রাত্রি বেলায় লেদা পোকা বা শুকের আক্রমণ হয়ে থাকে। প্রতি বছর এদের আক্রমণ হতে দেখা যায় না। তবে অনেকদিন খরার পর খুব বেশী বৃষ্টি বা বন্যা হলে এদের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। সে সময়ে হাজার হাজার শুক দল বেঁধে একসংগে জমির পর জমির চারা অনেকটা গরুতে খাওয়ার মত করে মুড়িয়ে খায়। অনেক সময় গাছের থোড় আসার আগের অবস্থাতে আক্রমণ করে।

শীষ কাটা লেদা পোকা (*Mythimna separata* (Walker)

ধান পেকে আসার সময় পাতা ও ধানের শীষ কেটে দিয়ে ভীষণ ক্ষতি করে। এরাও দল বেঁধে থাকে। একসংগে চলমান বহুসংখ্যক 'শুক' জমির পর জমির পাকা ধান ধ্বংস করে দেয়। এরাও রাত্রি বেলায় আক্রমণ করে। সাধারণ লেদা পোকার তুলনায় অনেক বেশী ক্ষতি করে।

পাতা মোড়ানো পোকা (Rice leaf roller or folder; (*Cnaphalocrosis medinalis* Guen)

পূর্ণাঙ্গ মথ (চিত্র ৫০) ছোট ও বাদামী ধূসর রংয়ের হয়। পাখায়



চিত্র ৫০ঃ পাতা মোড়ানো পোকা (Rice leaf folder or roller —*Cnaphalocrosis medinalis*)

[উৎসঃ প্যান্‌স্‌ ম্যানুয়েল নং—৩, ১৯৭৪]

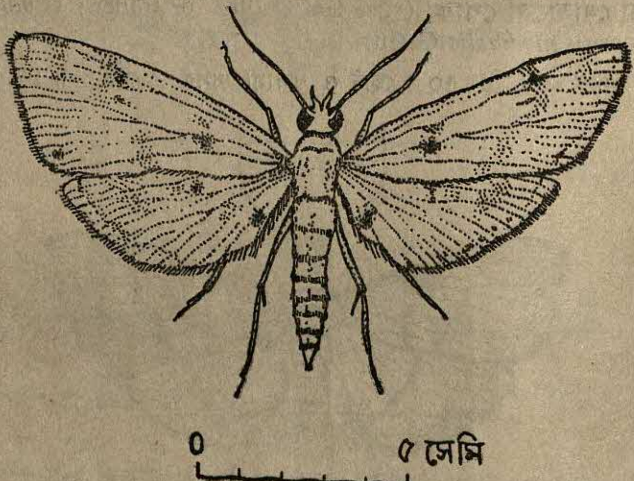
গাঢ় দাগ থাকে, প্রায় ৮ মিলিমিটারের মত লম্বা। শূককীট লম্বাটে, সবুজ রঙের হয় এবং পাতার মোড়ানো অংশে দেখা যায়। ডিম চ্যাপ্টা, কিছুটা ডিম্বাকার এবং হালকা হলদে রংয়ের ও একটি একটি করে পাতার উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে।

শূককীট পাতা মোড়ানো নালির মধ্যে থেকে পাতার তন্তুগুলি খেতে আরম্ভ করে।

সব সময়ই এদের দেখা যায় তবে শ্রাবণ ভাদ্র মাসে আক্রমণ বেশী হয়।

নলি বা চুঙ্গি পোকা (Rice case worm; *Nymphula depunctalis* (Guéneé)

পূর্ণাঙ্গ পোকা (চিত্র ৫১) রাত্রি বেলা বের হয় এবং আলো দেখলে ছুটে আসে। এগুলি ছোট, তুষারের মত সাদা রংয়ের এবং হালকা বাদামী ও হলদে রংয়ের ফোঁটা সামনের এবং পেছনের পাখাতে বর্তমান। পাখা

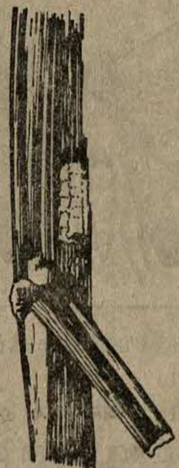


চিত্র ৫১ঃ নলি বা চুঙ্গি পোকা (Rice case worm or leaf roller —*Nymphula depunctalis*)

[উৎস ঃ প্যান্স ম্যানুয়েল নং—৩, ১৯৭৪]

মেলে ধরলে ১৫ মিলিমিটারের মত লম্বা হয়। ৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে। ডিম আলাদা আলাদা ভাবে পাতার উপর থাকে। শূককীট স্বচ্ছ সবুজ রংয়ের এবং হালকা বাদামী ও কমলা রংয়ের মাথা।

সেচ সেবিত এলাকায় এগুলি বিশেষভাবে দেখা যায়। ধানের পাতা ছোট ছোট করে কেটে নল বা চোঙ্গ তৈরী করে তার ভিতরে থাকে। নলি পোকার শুক নল এবং তার ভিতর খানিকটা জল নিয়ে গাছে চড়ে পাতার সবুজ অংশ খেতে (চিত্র ৫২) থাকে। নলের ভিতরের জল শুকিয়ে



চিত্র ৫২ঃ চুঙ্গি পোকার দ্বারা আক্রান্ত ধান গাছের পাতা

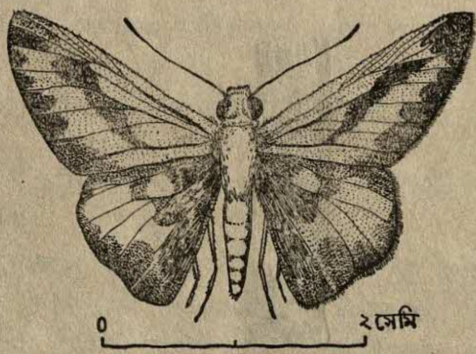
উৎস ঃ [প্যানস ম্যানুয়েল নং—৩, ১৯৭৪]

এলে গাছ থেকে ঝুপ ঝুপ করে জলে পড়তে থাকে। নল বা চোঙ্গগুলি অনেকটা ভেলার কাজও করে। এসব কীট জল থেকে অম্লজান বা অক্সিজেন নেয়। জলা জমিতেই এদের আক্রমণ বেশী হয়। জমির জল প্রয়োজন বোধে পাম্পের সাহায্যে বার করে দিয়ে সহজেই এদের দমন করা যায়। এছাড়া জমির জলে সামান্য কেরোসিন ঢেলে দিয়েও এদের দমন করা যায়।

রাইস স্কীপার (Rice Skipper ; *Parnara guttata and Peliopidas mathias*)

সাধারণ স্কীপার (চিত্র ৫৩) সাধারণতঃ সবুজ বাদামী রংয়ের হয়, বড় মাথা, বাঁকানো সুঙ্গ, ডিম ফিকে হলুদ এবং শুক ও পুত্তলী ফিকে সবুজ রংয়ের।

শুককীট দু ধরনের ধান গাছের ক্ষতি করে থাকে প্রথমতঃ গাছের পাতা সরাসরি খায়। প্রথমে পাতার ধার থেকে খেতে খেতে ভেতরের দিকে আসে ও পরে মধ্যশিরার সমান্তরালে খেতে থাকে যা অন্যান্য পোকার



চিত্র ৫৩ঃ রাইস স্কীপার (Rice skipper)

ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখা যায় না। অন্যভাবে এই পোকা গাছের পাতার দুটি ধার নিয়ে নল বা চুঙ্গি তৈরী করে। চারা রোয়ার প্রথমের দিকে বেশী ক্ষতি দেখা যায় এবং তা ফুল আসা পর্য্যন্ত চলতে থাকে। যখন গাছে বেশী আক্রমণ হয় তখন গাছ রোগাটে হয় এবং পরে ঐ অবস্থা থেকে বাঁচতে পারে না।

ধানের ফড়িং (Rice grass hopper; *Hieroglyplus lanian* (Fabricius)

শুকনো অবস্থাতে বাঁধে ঠিক মাটির নীচে ও ভেজা অবস্থাতে গাছের কাণ্ডে জলের ৪ থেকে ৫ সেণ্টিমিটার উপরে এগুলি ডিম পাড়ে।

শুককীট গাছের ছোট অবস্থাতে এবং পূর্ণাঙ্গকীট (চিত্র ৫৪) সরাসরি পাতার ধার বা শীষের গোড়া ইত্যাদি খেয়ে ক্ষতি করে। এর ফলে শীষ শুখিয়ে যায়।

পামরী পোকা (Rice hispa; *Dicladispa armigera*) (Olivier)

পূর্ণাঙ্গ পোকা (চিত্র ৫৫) ছোট, চকচকে, নীল ও কালো, প্রায় ৫.৫ মিলিমিটার লম্বা, গায়ে কাঁটা থাকে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ডিম পাতার ডগায়

দেখা যায়। গাঢ় রংয়ের রস দিয়ে ঢাকা থাকে। শুককীট ফিকে হলদে এবং পুত্তলী বাদামী রংয়ের হয়।



চিত্র ৫৪ : ধানের ফড়িং পোকা (Grass hopper)

অর্থনৈতিক দিক বিচার করলে এই ধরনের পোকার দ্বারা ক্ষতি বেশী হয়ে থাকে। শুককীট ও পূর্ণাঙ্গ পোকা উভয়ই ছোট ধানের চারাকে আক্রমণ করে। পাতার উপরের সবুজ অংশ লম্বালম্বি সমান্তরাল রেখায় ঘুরে ঘুরে খেয়ে নেয়। এদের আক্রমণে তাই পাতার উপর সাদা সাদা সমান্তরাল রেখা দেখতে পাওয়া যায়। এদের শুক পাতার দুই ত্বকের ভিতরের সবুজ



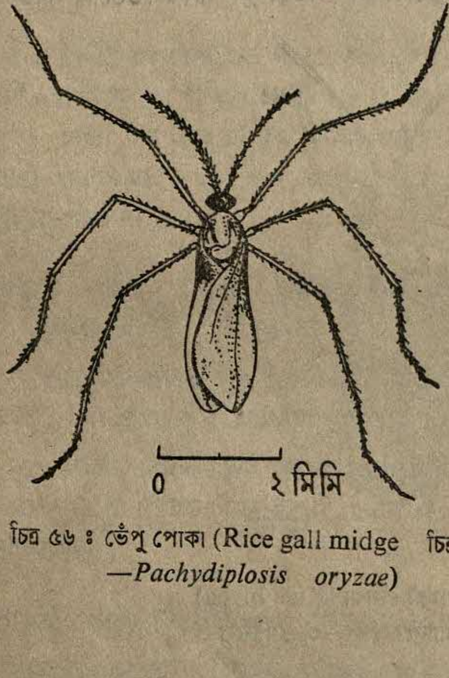
চিত্র ৫৫ : পামরী পোকা (Rice hispa)
[উৎস : প্যান্স ম্যানুয়েল নং—৩, ১৭৯৪]

কোষগুলি খেয়ে নেয়। এতে আক্রান্ত পাতা সাদাটে হয়ে যায় এবং খড়ের মত দেখায়। আমন ধানে বেশী আক্রমণ করে।

ভেঁপু পোকা (Gall midge ; *Orseolia oryzal*, Wood-Mason)

পূর্ণাঙ্গ পুরুষ (চিত্র ৫৬) প্রায় ৩ মিলিমিটারের মত লম্বা হয়, হলদেটে বাদামী রং, সুঙ্গে লোম থাকে, প্রায় শরীরের মত লম্বা হয়, পা বাদামী রংয়ের লোমে ঢাকা। স্ত্রীপোকা সামান্য লম্বাটে, উজ্জ্বল লালচে বাদামী রংয়ের, সুঙ্গ শরীরের প্রায় অর্ধেক সমান লম্বা, ডিমের রং বিভিন্ন ধরণের হয়।

আক্রমণের ফলে পাতার বৃন্তে বা খোলাটি পেঁয়াজের কলির মত হয়ে যায়। পাশকাঠি ছাড়ার সময় থেকে ফুল আসার আগে পর্যন্ত পেঁয়াজকলি পাতা (চিত্র ৫৭) ধানে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। ক্ষতিও করে বেশ। যদি এই ধরণের পাতা চেরাই করা যায় তাহলে এই পোকার শুককীট ও পুত্তলী দেখতে পাওয়া যায়। শিরাবাহী (Systemic) ঔষধ প্রয়োগে এদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সহজ হয়। ভাদ্রমাস নাগাদ আমন ধানে বেশী আক্রমণ দেখা যায়।



চিত্র ৫৬ : ভেঁপু পোকা (Rice gall midge —*Pachydiplosis oryzae*)



চিত্র ৫৭ : ভেঁপু পোকার আক্রমণের ফলে এরূপ পেঁয়াজকলি পাতা (Onion Shoot) দেখা যায়।

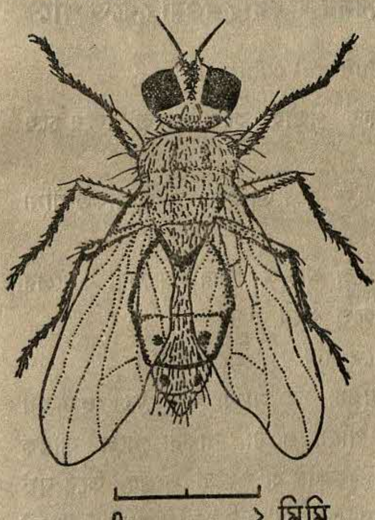
[উৎস : প্যান্‌স ম্যানুয়েল নং ৩, ১৯৭৪]

দয়ে পোকা (Mealy bug ; *Brevennia rchi* (Lindinger))

দয়ে পোকা দেখতে ছোট এবং উড়তে পারে না। শরীর লালচে সাদা, খুব নরম এবং তুলার মত সাদা আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকে। একসঙ্গে অনেক বেশী পোকা পাতার খোলার ভিতর থাকে তাই বাইরে থেকে দেখা যায় না। ধান গাছের ডাঁটা এবং পাতার খোলা থেকে এরা রস চুষে খায়। ফলে গাছের বাড় কমে যায়, পাতা হলদে হয় এবং চাক চাক ভাবে জমির ধান বসে যায়। আউস বা আমন উভয় সময়ে আক্রমণ করে। আলের ঘাসে যেখানে জল জমে না সেই জায়গায় এরা থাকে এবং ধীরে ধীরে ধানে আক্রমণ করে। পাখা থাকে না বলে পিঁপড়ে বা অন্য কোন পোকা বয়ে নিয়ে যায়।

ধানের মাছি পোকা (whorl maggot ; *Hydrellia spp.*)

আজকাল এই ধরণের পোকার (চিত্র ৫৮) আক্রমণ দেখা যায় বিশেষ করে নীচু জলা জমিতে। গাছের মাঝের পাতা সাধারণতঃ খেয়ে থাকে।



চিত্র ৫৮ : মাছি পোকা (Rice seedling fly or Stem mining maggot—*Atherigona oryzae*)

[উৎস : প্যান্স ম্যানুয়েল নং ৩, ১৯৭৪]

গাছের বাড় বন্ধ হয়ে যায়। একে চেনা যাবে যদি পাতার ১টি বা ২টি করে গর্ত নির্দিষ্ট দূরত্বে দেখা যায় এবং পাতার ধার ও ডগা সাদাটে হয়।

ধানে সুসংহত উপায়ে পোকা-মাকড়ের প্রতিকার
(Integrated pest management in rice)

শত্রুকীটের আক্রমণের হাত থেকে শস্য রক্ষা করতে হলে প্রথম কাজ হবে

কীটশত্রু সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, সজাগ ও সতর্ক থাকা। আঞ্চলিক বা স্থানীয় এলাকায় কোন শত্রুকীট কখন কিভাবে ক্ষতি করে বা আক্রমণের সূচনা করে সেবিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে। এছাড়া শত্রুকীটের প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকলে তবে আক্রমণ প্রতিরোধ বা প্রতিকার সম্ভব হয়। যেমন উত্তরবঙ্গে আউশ ধান গন্ধিপোকার দ্বারা বেশী আক্রান্ত হয়, বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে লেদা বা শীষ কাটা লেদা পোকার আক্রমণ প্রায়ই হয়ে থাকে। হুগলী জেলায় বাদামী শোষক পোকা বোরো খন্দে ধানের ক্ষতি বেশী করে।

শত্রুকীটের হাত থেকে ধানকে বাঁচাতে হলে বিভিন্ন উপায় ও কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে বা তাদের সম্মিলিত কৌশলে কীটশত্রুর আক্রমণ সংযত করা যেতে পারে।

রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার না করে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

- **শস্য পরিচর্যার মাধ্যমে দমন (Cultural control)**
- আগের ফসল উঠে যাওয়ার পর ক্ষেত গভীর করে লাঙ্গল দিয়ে চষে দিতে হবে।
- আগের ফসলের গোড়া পুড়িয়ে ফেলতে হবে তা হলে পোকামাকড় বাঁসা বাঁধতে পারবে না।
- উত্তম পরিচর্যার মাধ্যমে চাষাবাদ হলে অনেক সময় আগের ফসলের পোকামাকড় পরের ফসলে ক্ষতি করতে পারে না।
- আগাছা মাঠের মধ্যে জমিয়ে না রেখে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- যেখানে খুব কম মজুরীতে শ্রমিক পাওয়া যায় অথবা যদি ক্ষেত্র ছোট হয় বা কীটনাশক ঔষধ বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে না পাওয়া গেলে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোন কোন কীট পতঙ্গের শূককীট বা পুত্তলী সংগ্রহ করে নষ্ট করা সম্ভব। যেমন মাজরা পোকার শূককীট ও পুত্তলী অথবা পামরী বা গন্ধিপোকা হাত জাল দিয়ে ধরে মারা যায়।
- চুঙ্গিপোকার আক্রমণ কমানো যায় যদি জমিতে জল পরিমিত থাকে। শূককীট বা চুঁঙ্গ জমিতে দেখা দিলে জমির জল বার করে এদের প্রসার রোধ করা যায়।
- লেদা বা শীষ কাটা লেদা পোকার আক্রমণ অনেকটা রোধ করা যেতে পারে যদি আক্রান্ত জমির আলে হাতখানেক চওড়া করে ইঞ্জিনের পোড়া

তেল ছড়িয়ে দেওয়া হয় অথবা বি. এইচ. সি. ১০% গুঁড়ো অনুরূপভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

- বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ কম করা যেতে পারে যদি ধান রোয়ার সময় সারি থেকে সারি ও চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫×২০ সেমি করা হয় এবং দুই মিটার একভাবে রোয়ার পর একটি/দুটি সারি বাদ দেওয়া হয়। তারপর আবার দুমিটার চওড়ায় রোয়া করতে হবে। এই যে দুমিটার অন্তর অন্তর সারি বাদ থাকছে তাতে ক্ষেতে যেমন আলোবাতাস চলাচলের সুবিধা হবে তেমনি কীটনাশক ঔষধ ব্যবহারেও যথাযথ ভাবে সম্ভব হবে।
- নাইট্রোজেন ঘটিত সার অধিকমাত্রায় প্রয়োগ করলে ধান গাছে মাজরা ও ও ভেঁপু পোকার আক্রমণ বাড়ে। তাই সুষমহারে সুপারিশমত অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।
- **কীট শত্রু সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ (Surveillance)**—অনেক সময় কোন কীটের আক্রমণের ফলে আর্থিক ক্ষতির সীমা অতিক্রম করে না সেক্ষেত্রে তাকে কীটশত্রু হিসাবে গণ্য করা যায় না বা তার জন্য কোন দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। কিন্তু আর্থিক ক্ষতির সীমা ছাড়িয়ে গেলে কীট-নাশক ঔষধ প্রয়োগ করার সুপারিশ করা হয়। ধানে কীটশত্রুর সংখ্যা অনেক। তাই ধানচাষে শত্রুকীটের সংখ্যা বাড়ছে কিনা সেদিকে নিয়মিত লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এ জন্য প্রতি গ্রামে একটি কিংবা দুটি আলোক ফাঁদ (Light trap) বসাতে হবে এবং সপ্তাহে দুবার করে এসে হিসাব করতে হবে কীট পোকা। বিশেষ করে মাজরা পোকা ইত্যাদির কার্যকরী সংখ্যা বাড়ছে কিনা। কোন জাতীয় কীটপোকা কতদিনে কতখানি বিস্তার লাভ করলে রাসায়নিক কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করা হবে তা নিয়ে বলা হয়েছে।

পামরী পোকা—রোয়ার ৩০ দিনের মধ্যে প্রতি ঝাড়ে ৪/৫টি পূর্ণাঙ্গ পোকা অথবা পাতার ভিতর ৪/৫ কীড়া থাকলে। এছাড়া রোয়ার ৬০ দিনের মধ্যে যদি ১৫টি পূর্ণাঙ্গ পোকা দেখা দেয় তাহলে

ধানের মাছি—রোয়ার ৩০ দিনের মধ্যে এক বর্গমিটারে ২৫টি আক্রান্ত পাশ-কাঠি থাকলে

সবুজ শ্যামা পোকা—যে সব এলাকায় টুংরো রোগের উপদ্রব হয় সেসব

এলাকায় ধান রোয়ার ৩০ দিনের মধ্যে প্রতি গাছে ২/৩টি পূর্ণাঙ্গ বা অপরিমিত শ্যামা পোকা দেখতে পেলে, অথবা, নিজের বা পাশের জমিতে টুংরো রোগের লক্ষণ দেখা দিলে। যেখানে সাধারণতঃ টুংরো রোগ হয় না সেখানে রোয়ার ৩০ দিনের মধ্যে প্রতি ঝাড়ে ২০ থেকে ৩০টি পূর্ণাঙ্গ ও অপরিণত শ্যামা পোকা দেখতে পেলে।

বাদামী শোষক পোকা—রোয়ার পর পাশকাঠি ছাড়ার প্রথম পর্যায়ে প্রতি গোছে ৩ থেকে ৪টি অথবা রোয়ার ৬০ দিন পরে অর্থাৎ পাশকাঠি ছাড়ার শেষ পর্যায় থেকে ফুল আসা পর্যন্ত সময়ে প্রতি গোছে ২০টি করে পোকা দেখা দিলে।

ভেঁপু পোকা—আক্রমণ প্রবণ এলাকায় অথবা চারা রোয়ার ৪৫ দিন পর পর্যন্ত প্রতি বর্গমিটারে ২/৩টি পেঁয়াজকলি পাতা (Silver shoot) দেখা দিলে।

মাজরা পোকা—ধান রোয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে এবং নাবি জাতের ধান হলে ৬০ দিনের মধ্যে শতকরা ১০টি মাঝপাতা শুকিয়ে গেলে। অথবা ধানে থোড় হওয়া পর্যন্ত, প্রতি বর্গমিটারে (প্রায় ৩০ থেকে ৩৬টি গোছের মধ্যে) ২টি পূর্ণাঙ্গ মাজরা পোকা বা মাজরা পোকার ডিমের গাদা দেখলে।

দয়ে পোকা—ফুল আসা পর্যন্ত আক্রান্ত এলাকা এক বর্গমিটার হলেই। ঔষধ কেবলমাত্র আক্রান্ত এলাকায় দিতে হবে।

পাতামোড়ানো পোকা—থোড় আসা পর্যন্ত প্রতি ঝাড়ে ৩/৫টি মোড়ানো পাতা দেখতে পেলে।

গন্ধি পোকা—ধানে দুধ অবস্থায় প্রতি বর্গমিটারে ১০-১২টি পূর্ণাঙ্গ ও অপরিণত কীট দেখতে পেলে।

লেদা পোকা ও শীষ কাটা লেদা পোকা—ধান জমি বা তার আশেপাশে দলবদ্ধ কীড়ার চলাফেরা দেখতে পেলে।

- **জৈবিক উপায়ে পোকামাকড় দমন (Biological control)**

যে সমস্ত পরজীবি পোকামাকড় আমাদের দেশে রয়েছে সেগুলির যদি বৃদ্ধিসাধনের চেষ্টা করা যায় অথবা অন্য জায়গা থেকে আমদানী করা যায় তাহলে এ পদ্ধতিতে কীটদমন সম্ভব হবে। তবে এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হলে অনেক অসুবিধাও রয়েছে। একটি উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ধানের

মাজরা পোকার জন্য পরজীবি পোকা যা ব্যবহার করা হয় তাহলো *Sturmiopsis inferns* মাছি।

● পোকামাকড় আক্রমণ সহনশীল বা প্রতিরোধশীল ধানের জাত উদ্‌ভাবন ঃ বিভিন্ন পোকা সহনশীল জাত উদ্‌ভাবন হয়েছে, যেমন—

পামরী পোকা—আই-ই-টি ২৮১৫, ৬৩১৪

মাজরা পোকার জন্য—আই.ই.টি.—৩০৯৩, ২৮৪৫, ২৮১৩, ৩১২৭, ২৮১৫, ২৮১২, আই-আর ২০, আই-আর ৩৬, রত্না, আর পি ৪-১৪।

ভেঁপু পোকার জন্য—আর. পি. ডব্লু ৬-১৭, ৬-১৩ ; আর-পি—৯-৪ ; আর. পি.—৩৫২ ; কাকাটিয়া, আই-ই-টি ২৮৮৫, শক্তি, মাসুরী।

বাদামী শোষক পোকার জন্য—আই. ই. টি—২৮১৫ ও ১৪৪৪, জ্যোতি ; ত্রিবেণী, সি. আর ৯৪ ; এম. আর—১৫৫৩, আই-আর ৩০, ৩৬, পলমল ৫৭৯, আই. ই. টি ৬৩১৪, ৭৫৭৫, ৬৩১৫, ৫৬৮৮, এম্. টি. ইউ ৪৮৭০, ৫২৯৩, ভারতী।

● রাসায়নিক পদ্ধতিতে পোকামাকড় দমন

আগে যে পদ্ধতিগুলি আলোচনা করা হয়েছে তারজন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে। সংগে সংগে ফলাফল পেতে হলে রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে সম্ভব। নিয়মিত কীট পতঙ্গের বাড়া কমার সংখ্যা দেখে রাখতে হবে এবং সে হিসাবে যেখানে প্রয়োজন সেখানে রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে পোকামাকড় দমন করার আগে নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

● যে এলাকার পোকামাকড় দমন করতে হবে সেখানে কি কি ধরণের ঔষধ পাওয়া যায় এবং তাথেকে নির্বাচন করতে হবে কোন ঔষধ ব্যবহার করা হবে।

● যে পোকার আক্রমণ হয়েছে সে পোকা মারার জন্য ঔষধ নির্বাচন করতে হবে।

● যে ঔষধ নির্বাচন করা হবে তা কতদিন স্থায়ী হবে তাও বিবেচনা করতে হবে।

● ঔষধ পোকামাকড় ছাড়া অন্য কোন জীবজন্তু বিশেষ করে মাছ ও হাঁস ইত্যাদির কতখানি ক্ষতি করে তার ধারণা থাকা উচিত। এদের ক্ষতি যতটা কম হয় ততই মঙ্গল।

- ঔষধ নির্বাচন করার আগে ভেবে দেখা দরকার ঐ ঔষধটি আগের শস্যগুলিতে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা। যদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার কার্যকারিতা কমে গেছে কিনা। সম্ভব হলে পরিবর্তন করা উচিত। তা না হলে ঐ ঔষধের প্রতিরোধক্ষমতা কমে যাবে।

- এই পদ্ধতি আরোপ করার আগে ভাবতে হবে সত্যিকারে অর্থনৈতিক দিক থেকে কোন লাভ হবে কি না।

- এইবার বিবেচনা করতে হবে দানাদার ঔষধ না তরল ঔষধ ব্যবহার করা হবে। কারণ দানাদার ঔষধ ব্যবহার করলে স্প্রেয়ার ইত্যাদির খরচ কমবে।

পোকামাকড়ের প্রকার অনুযায়ী রাসায়নিক ঔষধের সুপারিশ

যদি জমি উঁচু হয় ও জলের চাপ কম থাকে তাহলে রোয়ার ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে মাজরা পোকা, শ্যামা পোকা ও ভেঁপু পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য দানাদার ঔষধ ব্যবহার করা যায়। গাছে দানাদার ঔষধ ব্যবহার না করে জলে গোলা কীটনাশক ঔষধও স্প্রে করা যায়।

নিম্নলিখিত (সারণি—১৪) যে কোন একটি দানাদার ঔষধ ভাল করে ছিটাতে হবে।

সারণি—১৪

দানাদার ঔষধের নাম	একর প্রতি মাত্রা	হেক্টার প্রতি মাত্রা
ফোরেট ১০ জি (থাইমেট ১০ জি)	৫ কেজি	১২.৫ কেজি
কার্বোফুরান ৩ জি (ফিউরাডান ৩ জি)	৭ কেজি	১৭.৫ „
কুইনাল ফস ৫ জি (একালাক্স ৫ জি)	৮ কেজি	২০.০ „
এণ্ডোসালফান ৪ জি (থায়োডান ৪ জি)	১০ কেজি	২৫.০ „

দানাদার ঔষধ ছড়ানোর সময় জমিতে ২ থেকে ৫ সেন্টিমিটার জল থাকা চাই এবং ৫-৭ দিন ধরে রাখতে পারলে ভাল। ভেঁপু পোকার আক্রমণ হয় এমন জমিতে রোয়ার ১৫-২০ দিনের মধ্যে দানাদার ঔষধ থাইমেট বা একালাক্স ব্যবহার করতে হবে।

যেখানে দানাদার ঔষধ ব্যবহার করা সম্ভব নয় সেখানে এবং যখন গাছের বয়স বেশি তখন নিম্নলিখিত (সারনি ১৫) কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করা ভাল।

সারনি—১৫

ঔষধের নাম	প্রতি লিটার জলে ঔষধের পরিমাণ	একর প্রতি ঔষধের পরিমাণ (৩০০ লিটার জলে)	হেক্টার প্রতি ঔষধের পরিমাণ ৭৫০ লিটার জলে
ফসফোমিডন ১০০ (ডিমেক্রন ১০০)	½ মিলিলিটার	১৫০ মিলিলিটার	৩৭৫ মি.লি.
মিথাইল প্যারাথিয়ন ৫০ ই.সি (মেটাসিড ৫০%)	১ ”	৩০০ ”	৭৫০ ”
কুইনালফস ২৫ ই.সি (একালাক্স ২৫%)	১½ ”	৪৫০ ”	১১২৫ ”
লিনডেন ২০ ই.সি (লিনডেন ২০ ই.সি. বা মিলটাফ ২০ ই.সি)	২ ”	৬০০ ”	১৫০০ ”

সাধারণতঃ প্রতি একর জমিতে হাত চালানো স্প্রেয়ারে ভালভাবে ঔষধ ছিটানোর জন্য প্রায় ৩০০ লিটার ঔষধ গোলা জল লাগে। তবে গাছের বাড় কম হলে জল ও ঔষধ কম লাগবে।

পামরী পোকা, চুঙ্গি পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, গন্ধি পোকা, লেদা পোকা, শীষ কাটা লেদা পোকা ইত্যাদির আক্রমণ দেখা গেলে বি.এইচ.সি ১০% গুঁড়ো হেক্টার পিছু ২৫-৩০ কেজি হারে ভালভাবে ছড়াতে হবে অথবা বি.এইচ.সি. ৫০% জলে গোলা গুঁড়ো প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম হিসাবে (প্রতি হেক্টারে ৩.৭৫ কেজি) স্প্রে করতে হবে।

লেদা পোকা ও শীষ কাটা লেদা পোকা দমনের জন্য বিকালের দিকে ঔষধ দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এদের দমনের জন্য বি.এইচ.সি. ছাড়াও নুভান ১০০% প্রতি লিটার জলে আধ লিটার হারে ব্যবহার করা যায়।

বাদামী শোষক পোকা বা শ্যামা পোকা বা ঐ জাতীয় পোকার আক্রমণ কোন কোন অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে। এর দমনের জন্য নিম্নলিখিত (সারনি ১৬)

যে কোন একটি ঔষধ স্প্রে করতে হবে। এই শোষক পোকা গাছের গোড়ার দিকে থাকে। সুতরাং পাতার উপর ঔষধ না ছিটিয়ে গোড়ার দিকে বিশেষ করে বিকালের দিকে স্প্রে করতে হবে।

সারনি—১৬

ঔষধের নাম	প্রতি লিটার জলে ঔষধের পরিমাণ	একর প্রতি ঔষধের পরিমাণ (৩০০ লিটার জলে)	হেক্টার প্রতি ঔষধের পরিমাণ ৭৫০ লিটার জলে
ফসফোমিডন ১০০ (ডিমেক্রন ১০০)	½ মিলিলিটার	১৫০ মিলিলিটার	৩৭৫ মি.লি.
ম্যালাথিয়ন ৫০% অথবা সাইথিয়ন	২ "	৬০০ "	৭৫০ "
মোনোক্রটোফস (নুভাক্রন ১০০)	১ "	৩০০ "	১১২৫ "
কার্বারিল (সেভিন ৫০)	২½ গ্রাম	৭৫০ গ্রাম	১৫০০ "

ধানে ফুল আসার পর কেবল সেভিন ৫০% জলে গুলে ছিটানো উচিত। পরে দানা পুষ্ট হওয়ার সময় যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বি.এইচ.সি ১০% গুঁড়ো হেক্টার প্রতি ২৫-৩০ কেজি হারে ছড়াতে হবে।

ইঁদুরের দ্বারা ক্ষতি ও ইঁদুর দমন

ইঁদুরের দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ ঃ রোগ অথবা পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করার ব্যাপারে কৃষক আজকাল অনেকটা সজাগ। কিন্তু ইঁদুরের হাত থেকে ফসল রক্ষা করার আগ্রহ বা চেষ্টা তার তুলনায় অনেক কম। তার প্রধান কারণ ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে সঠিক ধারণার অভাব। একটি ইঁদুর দিনে প্রায় ১০ গ্রাম মতো খাবার খায় এবং যতটা খায় তার প্রায় ৮ থেকে ১০ গুণ নষ্ট করে। মোটামুটি হিসাব অনুযায়ী ভারতে ইঁদুরের সংখ্যা ৪৮০০ লক্ষ। সুতরাং বছরে ১৭.৫২ লক্ষ টন (৪৮০০ লক্ষ ইঁদুর×১০ গ্রাম ×৩৬৫=১৭৫২০ লক্ষ কেজি বা ১৭.৫২ লক্ষ টন) খাদ্যশস্য ইঁদুর শুধু খেয়েই নষ্ট করছে। গড়ে প্রতি কেজি খাদ্য শস্যের দাম ২ টাকা ধরলে এই পরিমাণ খাদ্য শস্যের মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৩৫০৪ কোটি টাকা। এছাড়া ইঁদুর থেকে মানুষের পক্ষে মারাত্মক নানান রোগও ছড়ায়।

ইঁদুরের বংশবিস্তার ঃ পর্যাপ্ত খাবার পেলে একটি স্ত্রী ইঁদুর বছরে পাঁচবার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবার গড়ে নয়টি করে বাচ্চা দেয়। এই বাচ্চা-গুলো আবার দু-মাস পরেই বাচ্চা দিতে শুরু করে।

ইঁদুরের প্রজাতি ঃ

মাঠের ইঁদুর ঃ এরা গর্ত করে মাটির নীচে বাস করে। দেখতে বেশ বড় এবং মোটাসোটা। মাথা ও শরীর মিলিয়ে লম্বায় প্রায় সাড়ে ছয় থেকে নয় ইঞ্চি। লেজও প্রায় ততটা লম্বা। মুখ ভোঁতা। কান গোল ও মোটা। গায়ের লোম খাটো ও মোটা। রঙ গাঢ় বাদামী থেকে কালচে। নখ শক্ত এবং এরা গর্ত খুঁড়তে ওস্তাদ। এক একটি আস্তানায় ২ থেকে ৫টি পর্যন্ত আঁকাবাঁকা গলি ও ২-১২টি পর্যন্ত মুখ থাকে। গর্তের কানাগলির শেষ মাথায় খাবার সংগ্রহ করে রাখে অথবা বাচ্চা দেয়। এরা বছরে ছয় বার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবার ৬-১৫টি বাচ্চা দেয়।

কালচে ইঁদুর ঃ এরা শহরে, গ্রামে গঞ্জে মানুষের কাছাকাছি বাস করে। মাথা ও শরীর মিলিয়ে লম্বায় ৫-৭ ইঞ্চি, লেজ লম্বায় ৭-১০ ইঞ্চি। মাথা সরু ও ছুঁচলো। কান বেশ বড়। গায়ের রঙ গাঢ় বাদামী থেকে কালচে।

এরা মাটি থেকে কিছুটা উপরে থাকে এবং যে কোন জায়গা বেড়ে উঠতে পারে। বছরে ৪-৬ বার বাচ্চা দেয়। প্রতিবারে ৬-৮টি বাচ্চা হয়।

নেংটি ইঁদুর ঃ মাথা ও শরীর মিলিয়ে লম্বায় ১½-৩ ইঞ্চি হয়। লেজ লম্বায় ৩-৪ ইঞ্চি। মুখ সরু, নাক ছুচলো, কান দুটি গোল, পাতলা এবং শরীরের লোম খাটো ও কোমল। রঙ ধূসর থেকে বাদামী। বছরে ৮-১২ বার বাচ্চা দেয়। প্রতি বারে ৫-১০টি বাচ্চা হয়।

ইঁদুর দমনের উপায় ঃ

মাঠের ইঁদুর ঃ প্রতি ১০০ গ্রাম আটা, ময়দা, রুটি, চাল, গম, ছোলা, ভুট্টা ইত্যাদি খাবারের সংগে প্রথমে কিছুটা তেল মিশিয়ে পরে কাঠের বা বাঁশের হাতার সাহায্যে ২ গ্রাম পরিমাণ জিঙ্ক ফসফাইড মিশিয়ে বিষের বড়ি বা টোপ তৈরী করতে হবে। টোপ সন্ধ্যার দিকে ইঁদুরের গর্তের সামনে দিতে হবে। টোপ দেওয়ার আগে কয়েকদিন জিঙ্ক ফসফাইড না মিশিয়ে টোপ ঐসব জায়গায় রেখে ইঁদুরকে খেতে দিতে হবে। হেক্টার প্রতি মোটামুটি ৪০ গ্রাম ঔষধ লাগবে।

এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড—এই ঔষধ বাজারে সেলফস বা ফসফিউস নামে বড়ি হিসাবে পাওয়া যায়। ইঁদুরের গর্তের একটি মুখ খোলা রেখে ধারে কাছের আর সব গর্তের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। একটি বাঁশের বা টিনের চোঙ দিয়ে এই বিষের বড়ি গর্তের যতটা সম্ভব ভিতরে ফেলে দিয়ে গর্তের মুখ ইঁট, পাথর বা কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করতে হবে। বড়ি থেকে বিষাক্ত গ্যাস বার হলে ইঁদুর মারা পড়বে। ইঁদুরের প্রতিটি আস্তানায় দেড় গ্রাম মত বিষ বড়ি লাগবে এবং হেক্টের প্রতি ৪৫ গ্রাম বিষ বড়ি প্রয়োজন হবে। ভেজা জমিতে এই ওষুধ ব্যবহার করা চলবে না।

গুদামের বা বাড়ীর ইঁদুর ঃ বাজারে ওয়ারফারিন, রোডাফারিন, রেটাকিন নামে বিভিন্ন ঔষধ পাওয়া যায়। ইঁদুরের পছন্দমত খাবারের সংগে একটু খাবার তেল বা গুড় বা চিনি মিশিয়ে নিতে হবে। উনিশ ভাগ খাবারের সংগে একভাগ বিষ মেশাতে হবে। এই টোপ ইঁদুর চলাচলের রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় রাখতে হবে। জায়গা বদল না করে ৫-৬ দিন বিষ টোপ দিতে হবে। বাড়তি বিষ টোপ সকালে তুলে নিতে হবে। এক্ষেত্রে বিষ টোপ দেওয়ার আগে বিষ ছাড়া টোপ দেওয়ার দরকার নেই।

উপসংহার ঃ

ভাল ফলন পেতে হলে কীট শত্রুর হাত থেকে ফসল বাঁচানো অপরিহার্য। হিসাবে দেখা গেছে কীট শত্রুর দ্বারা প্রায় ১০ শতাংশের মত ফসল নষ্ট হয়। ধানে এই শত্রুর সংখ্যা প্রায় শতাধিক হলেও এতগুলি সমহারে ক্ষতিকারক না। যেগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিসাধন করে তারমধ্যে মাজরা, পামরী, ভেঁপু, লেদা, শোষক, শ্যামা, গন্ধি, পাতা মোড়ানো, দয়ে পোকা প্রভৃতি প্রধান। কিন্তু এদের দমন করার জন্যে সরাসরি রাসায়নিক পদ্ধতি অবলম্বন না করে এদের স্বভাব, প্রকৃতি ইত্যাদি ভালভাবে পর্যালোচনার পরও যদি সম্ভব হয় কোন শস্য পরিচর্যার মাধ্যমে তার আক্রমণ প্রতিহত করাটা বাঞ্ছনীয়। তাই সুসংহত প্রতিকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। ক্ষতি যখন অর্থনৈতিক সীমা লঙ্ঘন করছে তখন রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার করতে গেলে সর্বদা ব্যবহার সম্পর্কে সতর্কতা মেনে চলতে হবে তা না হলে ব্যবহারকারী বিপদের মুখে পড়তে পারে। এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

অধ্যায় তের

ধানের রোগ ও তার প্রতিকার

(Diseases of Rice and their Control)

অধ্যায় তের

ধানের রোগ ও তার প্রতিকার

গাছের রোগ কি ও তা কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে ?

সাধারণভাবে গাছের রোগ বলতে আমরা বুঝি যখন কোন গাছ বা তার কোন অংশ স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না। এগুলি ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস প্রভৃতির দ্বারা অথবা শারীর বৃত্তীয় কারনে যেমন বেশী বা কম তাপ-মাত্রা, আর্দ্রতার তারতম্য, বাতাস চলাচলের অভাব, পুষ্টির অসমতা, অম্ল অথবা ক্ষার মাটি ইত্যাদির জন্য হতে পারে। রোগের জীবাণু মরা গাছপালা বা জীবজন্তু থেকে খাবার পায় অথবা জ্যান্ত গাছপালা বা জীবজন্তুকে আক্রমণ করে (পরজীবি) তাদের খাবার পেয়ে থাকে। এর ফলে গাছের কলা কোষ-গুলি নষ্ট হয়। ফলে হয় পুরো গাছটা নয়তো তার কিছু অংশের ক্ষতি হয় এবং পরে মারা পড়ে। এছাড়া অনেক সময় গাছের স্বাভাবিক বিপাকীয় কাজ কর্মের মধ্যে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে জীবাণু বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে।

বাতাস, জল, বীজ, রোগগ্রস্থ গাছ, বীচন বা জোড় কলম ইত্যাদি রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। এছাড়া শোষক পোকার দ্বারা কুটে (virus) রোগ ছড়ায়। বেশীর ভাগ ছত্রাক ও জীবাণু গাছের কলাকোষের ক্ষতি করে ও ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করে। ভাইরাস পুরোমাত্রায় গাছের ভিতরে কাজ করে। কাজেই গাছ-পালার রোগ দমন করতে হলে বিশেষ করে রোগ যাতে আক্রমণ না করতে পারে তার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। গাছের ভিতরের ছত্রাক ও জীবাণুকে নষ্ট করা অথবা ভাইরাসকে কাজ করতে না দেওয়া খুব কঠিন। তাই রোগ হয়েছে এমন ধান গাছকে সহজে সুস্থ করা সম্ভব হয় না। সেজন্য

রোগ দমনের ক্ষেত্রে রোগ লাগার আগেই প্রতিরোধ বা প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে হবে। এই ব্যবস্থা চাষের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে ধরতে হবে।

অধিক ফলনশীল ধানে বিশেষ কয়েকটি রোগ দেখা যায় যেগুলি অনেক সময় মারাত্মক হতে পারে ও ফলন কমে যায়। অধিক ফলনশীন ধানগাছ ঘনভাবে লাগানো হয়। লম্বায় কম হওয়ার জন্য গাছগুলি ঘন হয়ে বেড়ে ওঠে। পাতা বেশী সরস ও অনেক দিন ধরে সতেজ বা সবুজ থাকে। এসব কারণে এই জাতের ধানের উপর রোগ ও পোকার আক্রমণ বেশী হয়। এছাড়া, আজকাল একই জমিতে না হোক, একই মাঠে বছরে কয়েকবার ধান লাগানো হয়। এর ফলে রোগ যে সবের জন্য হয় সেগুলি অথবা ভাইরাস ইত্যাদি বয়ে আনে এমন পোকা মাঠের মধ্যে বছরের বেশীরভাগ সময়েই থাকে। সাধারণভাবে চারা রোয়া হয়ে গেলে বিয়ান ছাড়ার পর থেকেই গাছের রোগ পোকার দিকে নজর দেওয়া হয়। কিন্তু অধিক ফলনশীল ধানের চারা অবস্থায় বা রোয়ার পর থেকেই বেশী যত্ন নেওয়া দরকার। প্রথম থেকে ঠিকমত রোগ প্রতিরোধ করতে পারলে, পরে রোগ দেখা দিলেও ক্ষতির বা লোকসানের মাত্রা কম হয়।

বিশেষ কয়েকটি ধানের রোগ এক-নজরে চেনার উপায়

যে সব রোগ সাধারনতঃ পাতার ফলকে আক্রমণ করে

পাতার রোগাক্রান্ত জায়গা দেখতে স্পষ্ট বিন্দুর মত লাগে

(১) চারা বা বড় গাছের পাতায় বড় বড় দাগ থাকে দেখতে মাকুর মত হয়, পাতার কিনারা গাঢ় বাদামী রংয়ের হয়। ··· ঝলসা রোগ (চিত্র ৫৯)

(২) চারা বা বড় গাছের পাতায় ছোট, ডিমের মত, হালকা বাদামী রঙের এবং পাতার কিনারে লালচে বাদামী রঙের ছোট বিন্দু দেখা যায়। ··· বাদামী দাগ রোগ (চিত্র ৬০)

(৩) বেশী বয়সের গাছের পাতায় ছোট, সরু, হালকা বাদামী রঙের ও পাতার ধারে গাঢ় রঙের বিন্দু দেখা যায় ··· সরু বাদামী দাগ রোগ (চিত্র ৬১)

(৪) বেশী বয়সের গাছের পাতায় সূক্ষ্ম, কালো বিন্দুর মত দাগ দেখা যায় ··· পাতার ভূষা রোগ (চিত্র ৬২)

পাতায় রোগাক্রান্ত জায়গা স্পষ্ট বিন্দুর মত দেখায় না

(১) পাতায় এবড়ো-খেবড়োভাবে হলদে সাদা রংয়ের ঝলসানো দাগ দেখা যায়। পাতার ডগা প্রথমে শুকনো হতে আরম্ভ করে। পরে কানা ধরে নীচে নেমে আসে, কোন কোন সময় পাতা পাকিয়ে যায়। ...	ব্যাকটেরিয়া জনিত ধসা রোগ (চিত্র ৬৬)
(২) পাতার দুই শিরার মাঝে লম্বালম্বি ভিজা সরু দাগ দেখা যায়। এই দাগ ক্রমশঃ বড় ও ফ্যাকাশে হয়ে লম্বা ডোরার মত দেখায়। ডোরার শেষে বাদামী রঙের হয়। এক একটি পাতায় পাশাপাশি এরকম বেশ কয়েকটা ডোরা হতে পারে। ...	ডোরা দাগ রোগ (চিত্র ৬৫)

যে সব রোগ সাধারনতঃ কাণ্ড এবং কাণ্ড বেষ্টক আবরনীতে হয়

(১) কাণ্ডের রং বদল হয় এবং আক্রান্ত কাণ্ড শীষের ঠিক নীচে থেকে ভেঙ্গে যায় ...	ঝলসা রোগ (চিত্র ৫৯)
(২) কাণ্ড আবরণী বাদামী রংয়ের হয় এবং পচে যায়, ফাঁপা কাণ্ডে বা পাতার তন্তুতে সূক্ষ্ম কালো কালো দাগ দেখা যায় ...	কাণ্ড পচা রোগ (চিত্র ৬৭)
(৩) পাতায় যে অংশ ডাঁটার চারদিকে জড়িয়ে থাকে তার উপর প্রথমে মেটে সবুজ রংয়ের দাগ হয়। পরে ঐ দাগ আরও বড় হয়ে একটার সংগে আর একটা মিশে যায় এবং হালকা বাদামী রংয়ের হয়। এই দাগ গাছের খোলা থেকে পাতাতেও উঠতে পারে। এই রোগ হলে অনেক সময় শীষ বের হতে পারে না বা বেরুলেও অর্ধেক বের হয় অথবা বেরুনো শীষের ধান চিটা হয়। ...	খোলা পচা রোগ (চিত্র ৬৩)
(৪) পাতা এবং পাতার যে অংশ ডাঁটাকে জড়িয়ে থাকে তা শুকনো হয়, শীষের ডাঁটাগুলির রং বদল হয়, জলের উপরে যতটুকু পাতার কাণ্ড আবরণী থাকে সেটি সাদা অথবা লালচে রংয়ের হয়। স্বাভাবিক গাছের থেকে রোগাক্রান্ত গাছ লম্বা বেশী হয়। ...	গোড়া পচা রোগ

যে সব রোগ চারাতে ছড়ায়

(১) বীজতলায় চারা এক এক জায়গায় মরে যায়, চারার গোড়া পচে যায়, সাদা অথবা বাদামী রংয়ের হয়। ...	খোলা পচা রোগ (চিত্র ৬৩)

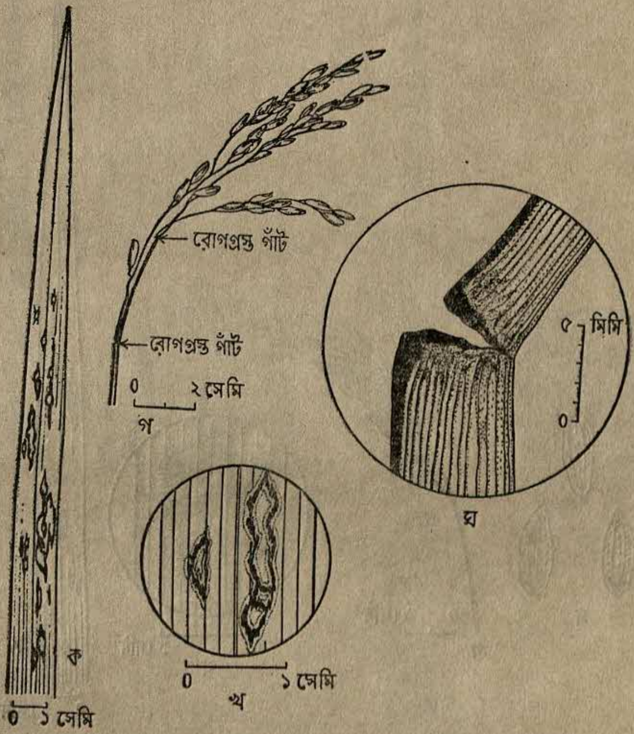
(২) বীজতলার চারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। ফ্যাকাশে হলদেটে সবুজ রংয়ের হয়। চারা সরু ও অস্বাভাবিক ভাবে লম্বাটে হয়। ···	গোড়া পচা রোগ

যে সব রোগ দানাতে হয়

(১) দানা পুরোটা পুষ্ট হয় না, সাদাটে রংয়ের হয় এবং ভেঙ্গে যায় ···	ঝলসা রোগ (চিত্র ৫৯)
(২) দানার উপরের দিক গাঢ় বাদামী অথবা ডিমের মত কাল দাগ দেখা যায়। অনেক সময় পুরো দানাটি কালো রংয়ের হয়। ···	বাদামী দাগ রোগ (চিত্র ৬০)
(৩) পুরো চালটা অথবা কিছুটা অংশ কালো গুঁড়ো দিয়ে ভর্তি হয়ে যায়। ···	ভূষো রোগ (চিত্র ৬২)
(৪) পুরো দানাটি বড় বড় সবুজ বা কমলা রংয়ের গুটিতে ভরে যায়। ···	গুটি রোগ (চিত্র ৬৪)

যে সব রোগের ফলে গাছ বেঁটে হয় এবং স্বাভাবিক রং বদলে যায়

গাছ সামান্য অথবা বেশীভাবে বেঁটে হয়, পাতার রং বদলে নানান ধরনের হয়, এগুলির সংগে ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়ার কোন সম্পর্ক থাকে না। ···	ভাইরাস রোগ (চিত্র ৬৯)
(১) পাশকাঠির সংখ্যা কিছুটা কমে যায়, পাতার রং হলদেটে কমলা হয় ও তাতে মরচে দাগ দেখা যায়। ···	টুংরো রোগ
(২) পাশকাঠির সংখ্যা খুব বেড়ে যায়, রং হলদেটে হয়। পাতা নুয়ে পড়ে। ···	হলদে বেঁটে
(৩) পাশকাঠির সংখ্যা খুব বেশী হয়, পাতা সরু ও খাড়া হয়ে থাকে। মরচে রংয়ের দাগ থাকে ···	ঘাসীকুট রোগ
(৪) চারা বাদামী রংয়ের হয় এবং পরে নেতিয়ে পড়ে মরে যায়, শীষ পাতার মধ্যেই থাকে এবং স্প্রিংয়ের মত হয়ে বাড়তে থাকে। আক্রমণ বেশী হলে রং বদলিয়ে গাঢ় বাদামী হয় এবং এঁকে বেঁকে উঠতে থাকে ···	শীষ কোঁচকানো রোগ (চিত্র ৬৮)

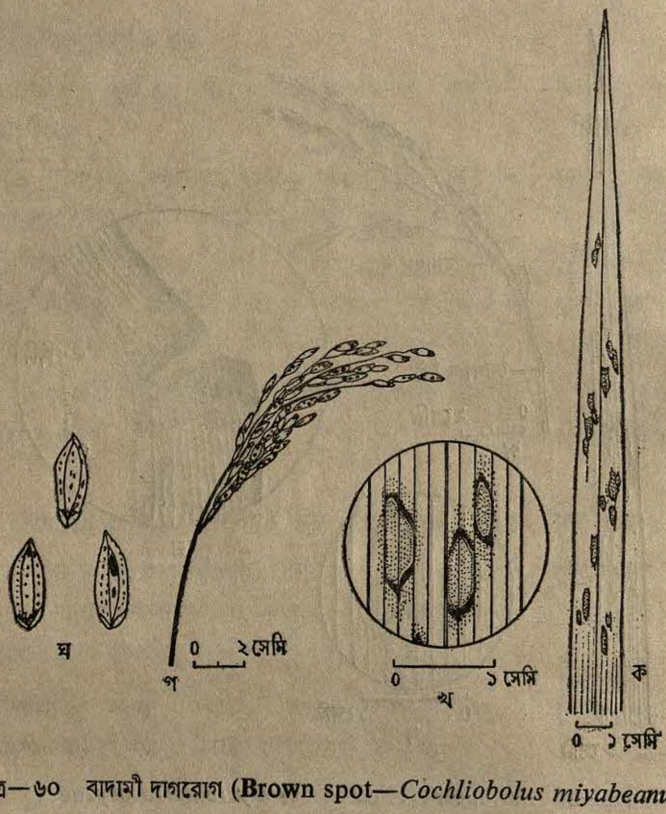


চিত্র—৫৯ ঝলসা রোগ (Rice blast—*Pyricularia oryzae*

ক—রোগাক্রান্ত পাতা, খ—বড় আকারে আক্রান্ত পাতার ক্ষত,

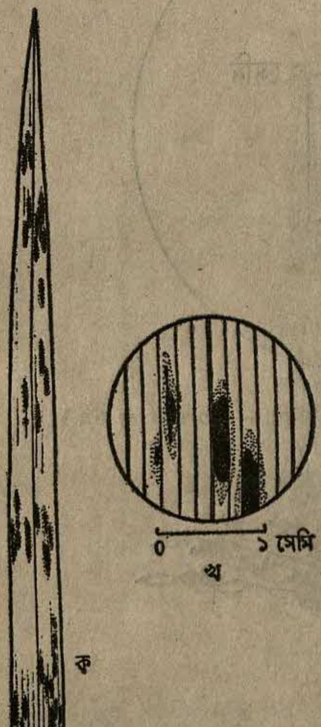
খ—রোগাক্রান্ত শীষ, ঘ—বড় আকারে আক্রান্ত শীষের ভাঙ্গা গোড়া

[উৎস : প্যানস ম্যানুয়েল নং-৩, ১৯৭৪]

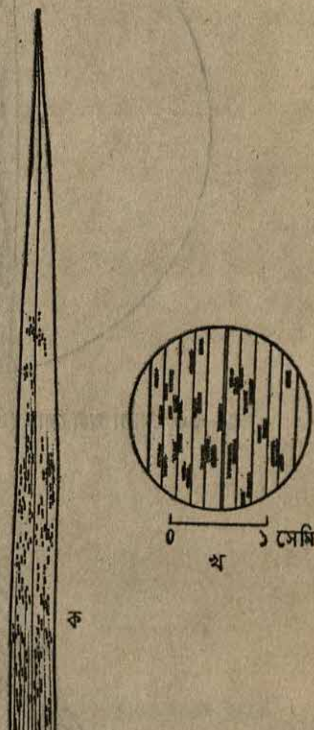


চিত্র—৬০ বাদামী দাগরোগ (**Brown spot**—*Cochliobolus miyabeanus*)
ক—আক্রান্ত পাতার দাগ, খ—বড় আকারে আক্রান্ত পাতার দাগ,
গ—রোগাক্রান্ত শীষ, ঘ—ধানে দাগ

[উৎস ঃ প্যান্**স** ম্যানুয়েল নং-৩, ১৯৭৪]

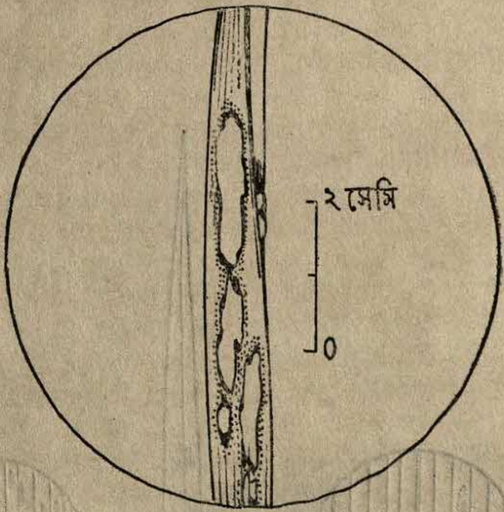


চিত্র—৬১ সরু বাদামী দাগ রোগ (Narrow Brown Leaf Spot *Cercospora oryzae*)
ক—আক্রান্ত পাতায় দাগ, খ—আক্রান্ত দাগ বড় করে দেখানো হয়েছে।



চিত্র—৬২ পাতার ভূষা রোগ (Leaf Smut—*Entyloma oryzae*
ক—আক্রান্ত পাতা, খ—পাতার দাগ বড় করে দেখানো হয়েছে

[উৎস ঃ প্যান্স ম্যানুয়েল নং-৩, ১৯৭৪]



চিত্র—৬৩ খোলা পচা রোগ (Sheath blight—*Corticium Sp.*)



চিত্র—৬৪ গুটি রোগ (**False smut—*Ustilaginoidea virens***)

[উৎস : প্যানস ম্যানুয়েল নং-৩, ১৯৭৪]



চিত্র ৬৫ চিত্র ৬৬

চিত্র—৬৫ ব্যাকটেরিয়া জনিত ডোরা দাগ কাটা রোগ (**Bacterial Leaf** streak—*Xanthomonas translucens*)

চিত্র—৬৬ ব্যাকটেরিয়া জনিত ধসা রোগ (Bacterial leaf blight —*Xanthomonas oryzae*)



চিত্র ৬৭



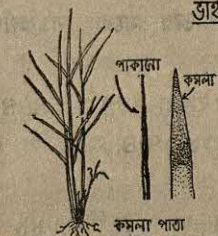
চিত্র ৬৮

চিত্র—৬৭ ডাঁটা পচা রোগ (Stem rot—*Helminthosporium sigmoideum*)

চিত্র—৬৮ শীষ কোঁকড়ানো রোগ (Ufra disease)

[উৎস—রাইস প্রোডাকসন টেকনোলজি ম্যানুয়েল, ১৯৮২]

ভাইরাস আক্রান্ত গাছের বৈশিষ্ট্য

	বসে যাওয়া বা কুটে হওয়া	পাশকাঠির সংখ্যা	পাতা	যে সব পোকার দ্বারা রোগ বাহিত হয়
 পাকানো, কমলা, কমলা পাতা	একেবারে হয় না	কমে যায়	কমলা রঙের এবং পাকানো	আঁকাবাঁকা শোষকপোকা
 টুংরো রোগ, হলদে	মাঝারি ধরনের হয়	স্বাভাবিক	হলুদ রঙের	শ্যামাপোকা
 হলদে বেঁটে	অত্যধিক রকমের হয়	অত্যধিক রকমের বেশী	হলদে, সবুজ নরম	শ্যামা পোকা
 ঘাসী কুটে রোগ	অত্যধিক রকমের হয়	অত্যধিক রকমের বেশী	হালকা, সবুজ সরু, শক্ত এবং মরচে দাগ থাকে	বাদামী শোষক পোকা

চিত্র—৬৯ ধানের ভাইরাস রোগের বৈশিষ্ট্য

[উৎস : রাইস প্রোডাক্সন ম্যানুয়েল, আই. আর. আর. আই. ১৯৭০]

রোগ দমনের বিভিন্ন পদ্ধতি

সাধারণভাবে তিন রকম উপায়ে রোগ দমন করা যেতে পারে যেমন (ক) রোগ সহনশীল ধানের জাত ব্যবহার করে, (খ) পরিচর্যা পদ্ধতির মাধ্যমে, (গ) রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার করে।

(ক) **রোগ সহনশীল** যে সব জাত রয়েছে তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান।

ঝলসা রোগের জন্য—আই. ই. টি. ২২৯৫, ২৪৭৩, ১৪৪৪, ৮৪৯, ৩২৫৭, বানী, আর. পি. ৩১-১৭-৪, আর. পি. ৭৯-৯ ; আই. আর. ৩২ ও ৩৬

ব্যাকটেরিয়া জনিত ধসা রোগের জন্য—আই. ই. টি-২৮৮৫, ৩২৬২, ৪১৪০, ৪১৪১ ; আর. পি. ৬৩৩-৫১৯-১-৩-৪, আর.পি. ৬৩৩-৪৩১-১-৬-১ ; আই. আর. ২০, ২২, ২৬, ২৮, ৩০;

টুংরো রোগের জন্য—আই-ই-টি-২৫০৮, ২৮১৫ ও ২৮৯৫ আর. পি. ৫০২-৩৬, আই. আর-২০, ৩৬, সি-এন ৫৪০।

(খ) **পরিচর্যা পদ্ধতির মাধ্যমে** (Cultural practice)

(১) মাটির অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে। উদাহরণ স্বরূপ যেমন—পটাশের অভাব দেখা দিলে বাদামী দাগ রোগ দেখা দিতে পারে। তেমনি বেশী নাইট্রোজেন থাকলে পোড়া দাগ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(২) জলের সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারা—যেমন বেশী গভীর জলে (১০ সেন্টি-মিটারের বেশী) ডাঁটাপচা বা ধসা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৩) জমিতে আগাছা দমন—যতটা সম্ভব মাঠে আগাছা না থাকাই ভাল। কারণ মাঠে আগাছা থাকলে রোগের জীবাণু ঐ আগাছার মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

(৪) বীজতলায় চারার পরিচর্যার প্রয়োজন—যেমন শুকনো বীজতলায় ঝলসা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। তাই নিয়ম মাফিক পোকামাকড় ও রোগ দমন করার ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।

(৫) বীজ বোনার আগে রাসায়নিক ঔষধ দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। সাধারণতঃ থাইরাম, সেরেসান বা এগ্রোসান জি. এন. প্রতি কেজি বীজের জন্য ২ থেকে ২.৫ গ্রাম করে মিশিয়ে শোধন করতে হবে।

(৬) মাঠে পোকা-মাকড় দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। কারন অনেক পোকা-মাকড় কিছু কিছু রোগ বয়ে আনে, ভাইরাস রোগ পোকা-মাকড় বাহিত হয়। তাই নিয়মিত পোকা-মাকড় দমনের ব্যবস্থা করলে রোগও দমন করা সম্ভব হবে।

(৭) যে সব রোগাক্রান্ত গাছপালা থাকবে তার গোড়া পুড়িয়ে ফেলতে হবে, তা নাহলে পাশের ফসল পুনরায় আক্রান্ত হতে পারে।

(৮) শস্য পর্যায়ে নতুন ফসল চাষাবাদের পরিকল্পনা রাখতে হবে। তার ফলে প্রত্যেক বারে নতুন নতুন শস্য এলে রোগের প্রকোপও কমতে পারে।

(গ) রাসায়নিক পদ্ধতিতে রোগ দমন

সব রকম পরিচর্যাগত ব্যবস্থা নিলে রোগের প্রকোপ খুব একটা চোখে পড়ে না। তবে রোগ দেখা দিলে সংগে সংগে প্রতিকার ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগের দরকার। তবে রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার করার আগে দুটি বিষয় বিশেষ করে বিবেচনা করতে হবে তাহলো (১) **ঔষধের দাম** অর্থাৎ এমন ঔষধ ব্যবহারের কথা ভাববো না যা আমাদের দেশে পাওয়া যাবে না বা অনেক দাম পড়বে। সেই সংগে এও ভাবতে হবে ঔষধ ব্যবহার করলে আদৌ লাভ হবে কিনা এবং (২) ঔষধ ব্যবহারের সময় আবহাওয়ার অবস্থা—যদি বৃষ্টি বা বাদলা দিন হয় তাহলে স্প্রে করলে খুব ভাল ফল পাব না, ঔষধ ধূয়ে যাবে। অন্যদিকে রোগ পোকা খুব তাড়াতাড়ি বাড়বে। তাই কোন্ পরিবেশে কোন্ ঔষধ খুব কাজ দেবে তা ভাল করে বিচার বিবেচনা করতে হবে। প্রতিটি রোগের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

ব্যাকটেরিয়া জনিত ধসা রোগ (Bacterial blight; যে ব্যাকটেরিয়ার জন্য হয় তার নাম (*Xanthomonas oryzae*)

ধান গাছের থোড় ও ফুল আসার সময় এই রোগের আক্রমণ বেশী হয়। এছাড়া আর্দ্র আবহাওয়া ও জমিতে বেশী নাইট্রোজেন সার এক সংগে প্রয়োগ করলে এই রোগ বাড়ে।

এই রোগের জীবাণু আক্রান্ত বীজে কম দিন থাকে। ধান জমির আগাছায় বা আগাছার শিকড়ের চারপাশে ধসা রোগের জীবাণু থাকতে পারে।

পাতার ধারে জলবের হওয়ার জন্য যে ফুটো থাকে তা দিয়ে অথবা গাছের বিশেষতঃ শিকড়ের কোন কাটা বা ছেঁড়া অংশ দিয়ে এই রোগের বীজাণু গাছের শরীরে ঢোকে। ধান গাছে ঢোকার পর এরা শিরার মধ্যে আশ্রয় নেয়। পরে ঐখানে জীবাণুগুলি ক্রমশঃ সংখ্যায় বাড়তে থাকে। এক সময় শিরাটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পাতার বিভিন্ন দিকে জল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পাতার ডগার দিক থেকে হলদে হতে থাকে ও পরে শুকিয়ে যায়। এরপর এই জীবাণুগুলি পাতার কানার ছিদ্র দিয়ে জলের সংগে বেরিয়ে এসে নীচে ধান জমির জলে পড়ে। সেখান থেকে এই জীবাণুগুলি মাঠের পর মাঠ ছড়িয়ে যায়। ভেজা হাওয়াতে ও বৃষ্টির ঝাপটার সংগে একপাতা থেকে অন্য পাতায় ও ক্রমে অন্য গাছে ছড়ায়।

ধসা রোগ দমন

এই রোগের জীবাণু পাতার শিরার মধ্যে থাকায় প্রতিকার করা সহজ হয় না। সেজন্য আগে থেকেই প্রতিরোধ ব্যবস্থার দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়।

(ক) পরিচর্যা ব্যবস্থায় যা বলা হয়েছে তা পুরো মাত্রায় জানতে হবে।

(খ) এছাড়া বীজ বোনার আগে প্রয়োজনে লিটার প্রতি ৫০ মিলিগ্রাম (এক গ্রাম ঔষধে ২০ লিটার জল) স্ট্রেপটোসাইক্লিন বা ৪০০ মিলিগ্রাম অ্যাগ্রিমাইসিন ১০০ জলে গুলে বীজকে ৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে শোধন করতে হবে। চারা রোয়ার আগে ঐ একই ঔষধে দিনের বেলায় চারার শিকড় ৩-৪ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখতে হবে।

(ঘ) নাইট্রোজেনের সংগে পটাশ ও ফসফরাস সার দিতে হবে। চাপান হিসাবে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন বলা হয় তা ভাগে ভাগে দেওয়া উচিত।

(ঘ) ধসা রোগ সহনশীল জাত ব্যবহার করতে হবে।

(২) বাদামী দাগ রোগ (Brown spot ; জীবাণুর নাম *Helminthosporium oryzae*)

আক্রমণের সময়ঃ জমিতে খুব কম নাইট্রোজেন ঘটিত সার দিলে এই রোগ বাড়ে। জমিতে পটাশ সারের অভাব থাকলে বা জমি বেশী অম্ল হলে এই রোগ হতে পারে, জমিতে রস কম থাকলে অথবা গরম ভেজা আবহাওয়া দেখা দিলে এই রোগ বাড়ে। আউস, আমন এবং বোরো খন্দে এই রোগ দেখা গেলেও, আউস ও আমন খন্দে এই রোগের প্রকোপ বেশী হয়। এই রোগের জীবাণু আক্রান্ত ধানের বীজে ও মাঠের শ্যামা ঘাসে বেঁচে থাকে। এই রোগ ধান জমিতে বাতাসের সাহায্যে ছড়ায়।

দমনের উপায় ঃ (ক) পরিচর্যা পদ্ধতিতে যা বলা হয়েছে সেগুলি প্রয়োগ করতে হবে, (খ) রোগ ছড়ানো বন্ধ করতে হলে প্রতি একরে ৬০০ গ্রাম ডাইথেন-জেড-৭৮, ডাইথেন-এস-৪৫ বা ক্যাপটেন ৮২%, এর যে কোন একটি ঔষধ তিনশ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। (গ) সুষম-সার প্রয়োগ করতে হবে, (ঘ) রোগ সহনশীলজাত ব্যবহার করতে হবে।

(৩) **ঝলসা রোগ ঃ** (Blast ; জীবাণুর নাম *Pyricularia oryzae*)

ঠাণ্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এই রোগ বেশী হয়। পশ্চিম বাংলার কালিম্পং এ এই রোগ বেশী দেখা যায়। অন্য সব এলাকায় আমন ধানে এবং বোরো খন্দের প্রথম দিকে এই রোগের আক্রমণ হতে পারে।

এই রোগের জীবাণু বাতাসের সাহায্যে ছড়ায়। বেশী নাইট্রোজেন সার দিলে, চারা ঘন থাকলে বা আগাছা পরিষ্কার করতে দেরী হলে এই রোগ বাড়ার সম্ভাবনা থাকে।

এই রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে (ক) পরিচর্যা পদ্ধতিতে যা বলা হয়েছে তা মেনে চলতে হবে। তাছাড়া (খ) রোগের লক্ষণ দেখা দিলে আক্রান্ত ফসলে প্রতি লিটার জলে ১ মিলিমিটার হিনোসান বা ২.৫ মিলিমিটার কুমান-এল বা ১ গ্রাম ব্যাভিষ্টিন অথবা ২ গ্রাম জাইরাইড জলে গুলে ছিটাতে হবে। এছাড়া (গ) রোগ সহনশীল জাতীর চাষ করতে হবে।

(৪) **ডোরা দাগ রোগ** (Bacterial leaf streak ; বীজাণুর নাম *Xanthomonas translucens*)

আর্দ্র আবহাওয়াতে সাধারণতঃ এই রোগ বেশী হয়। শুকনো আবহাওয়াতে ধানের ডোরা দাগ রোগ খুবই কম দেখা যায়।

গাছের বয়স বাড়লে এ রোগের প্রকোপ নিজে থেকে কিছুটা কমে। চারা অবস্থায় তা পাশকাঠি বের হওয়ার সময় এ রোগ হলে সাধারণতঃ গাছের বাড় কমে যায়।

ধানের বীজে এ রোগের জীবাণু থাকে। মাঠে এই রোগ বাতাস বা জলের সাহায্যে এক গাছ থেকে অন্য গাছে ছড়ায়।

এই রোগ **দমনের জন্য** (ক) পরিচর্যা পদ্ধতিতে যা যা বলা হয়েছে তা করতে হবে, (খ) বয়স বাড়ার সংগে সংগে অনেক সময় এ রোগ সেরে যায়। তবে যদি না কমার পরিবর্তে সারা মাঠ লাল হয়ে যায় তাহলে প্রতি ৫ লিটার জলে ১ গ্রাম স্ট্রেপটোসাইক্লিন অথবা ৫ গ্রাম এগ্রিমাইসিন—১০০ জলে গুলে ছিটাতে হবে।

(৫) **খোলা পচা রোগ** (Sheath blight ; জীবাণুর নাম *Thanatephorm cucumerin*)

আমন খন্দে সাধারণতঃ এ রোগ হয়। ধান খুব ঘন করে রোয়া করলে এবং জমিতে নাইট্রোজেন সার বেশী দিলে এই রোগ বাড়ে। বিয়ান ছাড়ার শেষের দিকে—এই রোগ বাড়ে। আমন খন্দে রোদের অভাব হওয়ায় এই রোগ বাড়তে সাহায্য করে।

এই রোগ দমনের জন্য (ক) পরিচর্যা পদ্ধতিতে যা কিছু বলা হয়েছে তা ঠিক ঠিক মত মানতে হবে। (খ) এছাড়া আক্রান্ত ফসলকে একটু বেশী সময় ধরে প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম ব্যাভিষ্টিন বা ১ মিলিলিটার হিনোসান, বা ৩ মিলিলিটার কুমান-এল অথবা ২ গ্রাম জাইরাইড দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। বেশী সময় ধরে না ভেজালে ঔষধ ঠিক রোগ জীবাণুর কাছে পৌঁছবে না। স্প্রে নজলটা ধানের দুই সারির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে চেষ্টা করা যেতে পারে।

(৬) **ডাঁটা পচা রোগ** (Stem rot ; জীবাণুর নাম *Leptosphaeria salvinii*)

সাধারণতঃ ধানে ফুল আসার সময় বা তার পরে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আমন খন্দে এই রোগের সম্ভাবনা বেশী থাকে।

আক্রান্ত ডাঁটার পচা অংশটি মাঝামাঝি চিরে ফেললে অসংখ্য কালো কালো খুব ছোট দানা দেখা যায়। এই দানাগুলি থেকেই এ রোগ ছড়ায়। এগুলি ধান গাছের ডাঁটার পচা অংশের সংগে মাটিতে অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে।

দমনের জন্য (ক) পরিচর্যা পদ্ধতিতে যা কিছু বলা হয়েছে তা ঠিকঠিক মত মেনে চলতে হবে। এছাড়া (খ) একর প্রতি ১০০ গ্রাম জলে গোলা সেরেসান, ১০০ লিটার জলে মিশিয়ে ধানের চারা এবং গোড়ার মাটি ভাল করে ভিজিয়ে দিতে হবে।

(৭) **গুটি রোগ** (False smut ; জীবাণুর নাম *Ustilaginoidea virens*) ঃ

এ রোগের প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে (ক) পরিচর্যা পদ্ধতিতে যা নির্দেশ আছে তা মানতে হবে। বেশী নাইট্রোজেন ঘটিত সার বিশেষ করে ফুল আসার সময় প্রয়োগ করা ঠিক হবে না। (খ) তাম্রঘটিত ঔষধ ফুল

আসার ২-১ দিন আগে মাঠে ছিটিয়ে দিলে অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।

(৮) **অন্যান্য যেসব রোগ হয়** তার মধ্যে গোড়া পচা (Foot rot), অনিয়ত ডাঁটা পোচা রোগ (Irregular stem rot), সরু দাগ (Narrow brown leaf spot), বড় দাগ (Stack burn disease), উড্‌বাটা রোগ (Udbatta disease) ইত্যাদি রয়েছে। এসব রোগের প্রতিকার ব্যবস্থা হিসাবে কেবলমাত্র পরিচর্যা পদ্ধতিতে যা বলা হয়েছে তা মেনে চলতে হবে।

(৯) **টুংরো রোগ** (Rice Tungro Virus disease)

এক এক জায়গা জুড়ে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। পাশের জমির আক্রান্ত ফসল, আগাছা অথবা আক্রান্ত ফসল কেটে নেওয়ার পর যে গোড়া থাকে তা থেকেও এ রোগ আসতে পারে। পাতার ডগার দিকে হালকা হলুদের ছোপ দেখা যায়। পরে পাতাগুলির ডগা উজ্জল কমলা রংয়ের হয়। সমস্ত গাছটা বসে যায়, পাশকাঠির সংখ্যাও কম হয়। শীষ একদম হয়ই না বা হলেও অনেক চিটা থাকে। কমলা রংয়ের পাতাগুলিতে পরে ডগার দিকে ছোট ছোট মরচে রংয়ের দাগ দেখা যায় ও পাতাগুলি পাকিয়ে যায়। মাঠে রোগটি এক গাছ থেকে অন্য গাছে শ্যামা পোকা মারফৎ ছড়ায়। সারা মাঠে রোগাক্রান্ত গাছগুলি এখানে ওখানে চক্‌চক্‌ হয়ে দেখা দেয়।

রোগ প্রতিরোধের জন্য—

- রোগ সহনশীল জাতের চাষ করতে হবে,
- আক্রান্ত গাছগুলি পুঁতে ফেলতে হবে এবং সংগে সংগে যে পোকা রোগের জীবাণু বয়ে এনেছে তাকে মারার জন্য দানাদার ঔষধ জমিতে ছিটাতে হবে। একর প্রতি থিমেট বা ফোরেট হলে ৫ কেজি, ফুরাডন ৭ কেজি, সেভিডল বা ডায়াজিনন ১০ কেজি ছিটিয়ে দিতে হবে। তবে ঔষধ প্রয়োগের আগে মাঠে অন্ততঃ ২—২·৫ ইঞ্চি যেন জল থাকে তা খেয়াল রাখতে হবে। অন্যান্য ধরণের ভাইরাস রোগও এইভাবে কিছুটা প্রতিকার করা সম্ভব হয়।

(১০) **শীষ কোঁকড়ানো রোগ** (Ufra disease ; নিমাটোডের নাম *Ditylenchus anrustus*)

এই রোগটি একধরণের নিমাটোড দ্বারা হয়। এগুলিকে প্রতিরোধ করার জন্য মাঠের সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি সম্মত ব্যবস্থা পালন করতে হবে। যেমন

পরিষ্কার বীজ ব্যবহার, যে জায়গায় এ রোগ হয়েছে সেখানকার জল সেচ হিসাবে ব্যবহার না করা, মাঠের জঞ্জাল পুড়িয়ে ফেলা ইত্যাদি। এরপর ১০০ পি-পি-এম ডায়াজিনন মাটিতে প্রয়োগ করলে নিমাটোড নষ্ট করা যায়।

ঔষধ স্প্রে করার সাবধানতা

- ফুল আসার সময় স্প্রে করা উচিত হবে না। তেমনি সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টার মধ্যে গুঁড়ো ঔষধ ছিটানো ঠিক হবে না কারণ দানা পুষ্টির ব্যাঘাত হবে।
- শরীরের কোথাও যেন ঔষধ না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ এগুলি খুব বিষাক্ত ঔষধ। ব্যবহারের পর ঔষধ শুকনো ও ঠাণ্ডা জায়গায় রাখতে হবে।
- বাতাস যেদিকে বইছে সেদিকে স্প্রে করতে হবে এবং জোর বাতাসে স্প্রে করা ঠিক হবে না।
- স্প্রে করার পর সব জিনিষ ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে।
- গো-মহিষাদি যাতে জল না খায়, অন্ততপক্ষে ১০ দিন, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

খাদ্যোপাদানের অভাব বা আধিক্যজনিত রোগ
বা
শারীর বৃত্তীয় রোগ

ধান গাছে কোন কোন সময় বিভিন্ন ধরণের অঘটন দেখা যায় যা কোন জীবাণুর দ্বারা হয় না। এগুলি শারীর বৃত্তীয় কারণে হয়ে থাকে। বিভিন্ন পরিবেশে মাটি ও গাছকে ঘিরে ঘটে থাকে। এই ধরণের রোগের প্রধান কারণগুলি নিম্নরূপ

- খাদ্যোপাদানের অভাব হলে।
- কিছু কিছু খাদ্যোপাদান বেশী হলে বিশেষ করে লোহ, ম্যাঙ্গানিজ, বোরণ, এ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি।

- মাটিতে জল জমে থাকলে কিছু কিছু খাদ্যোপাদান বেশী গ্রহণীয় অবস্থায় আসে, তার জন্যও হতে পারে। যেমন সালফাইড, জৈবিক অম্ল, কার্বন-ডাই-অক্সাইড।
- খুব বেশী লবণ থাকার জন্য ক্ষতি হয়।

যখন জমি খুব বেশী দিনের জন্য জল জমে থাকে অথবা একই জমিতে একের পর এক ধানের চাষ হতে থাকলে অথবা যদি নতুন জমিতে ধান চাষ হয় তাহলে এ ধরণের অঘটন বা অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা যায়। সাধারণভাবে এগুলিকে রোগ হিসাবে ধরা হয়।

খাদ্যোপাদানের অভাব বা আধিক্যজনিত লক্ষণাবলী যা গাছে দেখা যায় এবং তার প্রতিকারের পদ্ধতি ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে ৯ অধ্যায়ে (১১৯-১২৫ পৃষ্ঠায়) আলোচনা করা হল।

অধ্যায় চোদ্দ

ধান কাটা, ঝাড়ানো ও পরিষ্কার করা ; শুকনো করা ও ধান ভাঙ্গানো ; বীজ সংরক্ষণ ও উপজাত দ্রব্য

Harvesting, Threshing and Cleaning ; Drying and Milling ; Seed Storage and By-Product of rice

অধ্যায় চোদ্দ

ধান কাটা, ঝাড়ানো ও পরিষ্কার করা ; শুকনো করা ও ভাঙ্গানো ; বীজ সংরক্ষণ ও উপজাত দ্রব্য

কখন ধান কাটতে হবে ?

ধান পাকার পর বেশী দিন মাঠে থাকলে লাভ থেকে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। বাতাস জোর হলে গাছ শুয়ে পড়ে ফলে ধান ঝরে যায়, ইঁদুর, পাখী বা অন্যান্য কীট পোকা মাকড়ের দ্বারাও ক্ষতি হয়। তাছাড়া দানার গুণগত মানও কিছুটা খারাপ হতে আরম্ভ করে।

ঠিক সময়ে ধান কাটলে শস্যের গুণগত মান ঠিক ঠিক বজায় থাকে। ক্রেতার পছন্দমত হয় বলে বাজার দরও বেশী পাবার সম্ভাবনা থাকে। ধান থেকে যে চাল হয় তার পরিমাণ বেশী হয় ও পরিস্কার ও স্বচ্ছ হয়। ফসল কাটার সময় আবহাওয়া খারাপ হলে ফসলের খুব ক্ষতি হয়। বর্তমানে অধিক ফলনশীল ধানের চাষাবাদ অনেক জায়গায় হয়ে থাকে এবং এ সব ধানের বীজের সুপ্তকাল কম। তার ফলে পাকার পর মাঠে বীজ ঝরে গেলে বা কাটার পর ঠিক মত শুকনো না হলে এবং তা যদি কোনভাবে বৃষ্টি ইত্যাদির দ্বারা ভিজে যায় তাহলে বীজের অঙ্কুরোদগম হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে।

প্রত্যেক জাতের ধানের নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বোনার কতদিন পরে পাকবে তা মোটামুটি ঠিক থাকে। ধান কাটার সময় হলে প্রায় দিন লক্ষ্য রাখতে হবে। যখন শীষের উপরের দিকের শতকরা ৮০ ভাগ দানা শক্ত হতে আরম্ভ করেছে এবং রঙ সবুজ থেকে হলুদ হয় তখন ধরে নেওয়া যায় যে পাকার সময় হয়েছে। মাঠে জল দাঁড়িয়ে থাকলে মোটামুটিভাবে ধান কাটার ৭-১০ দিন আগে বের করে দিতে হবে। এর ফলে গাছে বীজ

তাড়াতাড়ি পাকবে। এ ছাড়া ধান কাটার পর মাঠে ধানের আঁটি ইত্যাদি রাখতে সুবিধা হয়।

পাতা ও গাছের রঙ পালটে গেলে ফসল পাকার সময় হয়েছে বলে ধরা উচিত হবে না। কারণ আজকালকার দিনে জলদি ও বেশী নাইট্রোজেন সার সহণশীল জাতের সব দানা যখন পাকার সময় হয়ে আসে তখনও কিছু সবুজ থাকে।

পরীক্ষায় দেখা গেছে ফুলে পরাগসংযোগ ও নিষিক্তকরণের ২০ দিন পরে বীজের অঙ্কুরোদগম হওয়ার ক্ষমতা দেখা যায় এবং ২৫ থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে চালের পরিমাণ (Milling percentage) বাড়ে। এ ছাড়া বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মতে (গোস্বামী ও ঘোষ, ১৯৬৯) জলদি জাতের ধানে (১২০ দিন জীবনকাল) ফুল আসার ২৫ থেকে ৩৩ দিন পরে ও মাঝারি বা নাবি জাতের ধানে (১২৫ দিন জীবনকাল ধরলে) ৩৩ থেকে ৩৯ দিন পরে ধান কাটার সময় হয়েছে বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ ফুল আসা থেকে প্রথম দিন ধরা হয়। এ সময়ের আগে বা পরে হলে ভাঙ্গা চালের সংখ্যা বাড়ে।

বিজ্ঞানীদের মতে দানায় আর্দ্রতার পরিমাণ যখন ২০ থেকে ২৪ শতাংশ থাকে তখন কাটতে পারলে সব থেকে বেশী ধান ও চাল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দানা বেশী আর্দ্র থাকলে যদিও বা বেশী ধান বা চাল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তথাপি কৃষক কিছুটা দেরী করে কাটে। দানায় আর্দ্রতার পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে আনাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এই দেরী করে কাটার অন্যান্য কারণ সম্ভবতঃ নিম্নরূপ ঃ

- মাঠে যন্ত্রপাতি নিয়ে তাড়াতাড়ি করে ধান কাটা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।
- সমুদ্র উপকূল এলাকায় ঘূর্ণীঝড় বা ঝড়ো আবহাওয়ার জন্য গাছ শুয়ে পড়লে ধান সময়ে কাটা সহজ হয় না।
- অনেক সময় বর্ষাকালে ধান কাটার পর আঁটি কোথাও রাখার সুবিধা থাকে না।
- বেশী ভেজা ধান ঝাড়ানোর জন্য উপযুক্ত ঝাড়াইযন্ত্র বা পদ্ধতি কৃষকের হাতে নেই।

- খরিফ মরসুমে ঝাড়াই এর পর ধান শুকনো করার মত রোদ ঠিক ঠিক মত পাওয়া যায় না।
- ধান কাটার পর পরিবহণের অসুবিধা থাকে।
- ধান শুকনো করার জন্য যন্ত্রপাতি কৃষকের হাতে নেই।

কিভাবে ধান কাটা হয় ?

আমাদের দেশে ধান গাছ সাধারণতঃ কাস্তে দিয়ে লোকে হাতে করে কাটে। যেখানে জমি শুকনো এবং শক্ত থাকে সেখানে গাছের গোড়া সামান্য রেখে কেটে ফেলা হয় (চিত্র ৭০)। কিন্তু সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় যেখানে জমিতে জল কিছুটা বেশী থাকে সেখানে গাছের গোড়া কিছুটা বেশী রেখে বাদবাকি অংশ শীষের সংগে কাটা হয়।



চিত্র ৭০ ঃ ধান কাটার পদ্ধতি

আবহাওয়া ভাল থাকলে দুএকদিন গাছকে মাঠেই শুকনো করা হয়।

যদি সংগে সংগে ধান ঝাড়ানো না যায় তাহলে আঁটি বেঁধে (চিত্র ৭১) কোন শুকনো জায়গায় গাদা করে রেখে দেওয়া হয়। আঁটি বেঁধে রাখলে কিছুটা বাতাস চলাচলের সুযোগ থাকে। ফলে গাদা খুব বেশী গরম হয় না। যদি কোন আঁটির মধ্যে ভেজাভাব থাকে তাহলে গাদা খুব বেশী গরম হয় ও ধানের অঙ্কুরোদগম শক্তির কিছুটা ক্ষতি হয়।



চিত্র ৭১ ঃ ধানের আঁটি বাঁধার পদ্ধতি

ধান ঝাড়ানো ও পরিস্কার করা

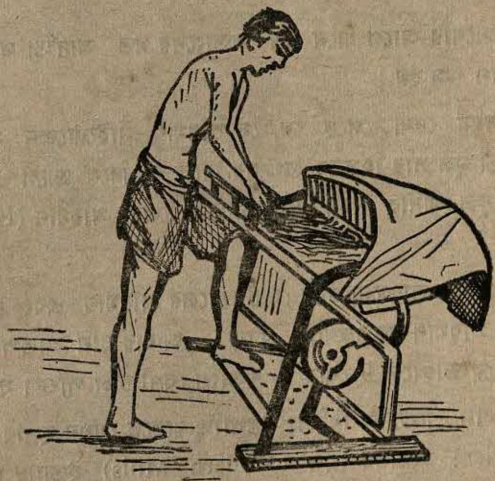
কম পরিমাণ ধান থাকলে অনেক সময় পায়ে অথবা বলদ দিয়ে মাড়িয়ে আলাদা করা হয়। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাঁশের পাটাতনের উপর বা শক্ত জায়গার উপর পিটিয়ে ঝাড়ানো হয়। যে সব কৃষকের সঙ্গতি রয়েছে বা বিভিন্ন সরকারী বা বেসরকারী খামারে পায়ে চালানো বা বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত 'থ্রেসার' যন্ত্রের (চিত্র ৭২) সাহায্যেও ঝাড়াতে দেখা যায়।

ধান ঝাড়ানোর পর যেসব আলগা খড় কুটি ধানের সংগে মিশে থাকে তা হাত দিয়ে আলাদা করা হয়। এরপর ঐ ধানকে কুলোর বাতাস দিয়ে অথবা সরাসরি বাহিরের বাতাসে উঁড়িয়ে চিটে ও পুষ্ট ধান আলাদা করা হয়। বাতাস যখন জোরে বইতে থাকে তখন প্রায় একমানুষ উপর (১.৫ মিটার) থেকে ধান উঁড়িয়ে দিলে চিটে ধান উড়ে গিয়ে কিছুটা দূরে পড়বে এবং পুষ্ট বা ভারী ধান সোজাভাবে কাছে পড়বে। এইভাবে ধান পরিস্কার করা হয়।

ধান শুকনো করা ও ভাঙ্গানো

ধান কাটা এবং ঝাড়ানোর পর ধান পুরোমাত্রায় শুকনো হয় না, প্রায় ২০ শতাংশের মত আর্দ্রতা থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস চলার ফলে বীজের শুকনো ওজন কমতে থাকে। এছাড়া তাপমাত্রা বেশী হলে বা বীজের জৈবিক ক্রিয়ার ফলে

বীজ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। তাই বীজকে গুদামজাত করার জন্য কিছুটা শুকনো করার প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে বেশীর ভাগ জায়গায় বীজকে মাটির তৈরী বা সিমেন্ট বাঁধানো জায়গায় রোদে শুকনো করা হয়। ফলে বীজের গুণগত মানের কিছুটা ক্ষতি হয়। যেমনটি দেখা যায় ধান



চিত্র ৭২ : পায়ে চালানো থ্রেসার যন্ত্র (Pedal thresher)

ভাঙ্গানো বা চাল তৈরী করার পর ভাঙ্গা চালের পরিমাণ কিছুটা বেশী হয়েছে। ধান রোদে শুকনো করা হলে চালে সামান্য ফাটল দেখা যায়। কিন্তু যদি ছায়াতে শুকনো করা হয় তাহলে ভাঙ্গা চালের পরিমাণ অনেকটা কমে। ছায়াতে ধান ধীরে ধীরে শুকনো হয়। ধানের বাহিরের খোসা ভিজলে বা বেশী তাপমাত্রায় উপরের অংশ বেড়ে যায় কিন্তু মাঝের অংশ সে তুলনায় বাড়া কমা করতে পারে না। যার জন্য চালে ফাটল দেখা যায়। তবে রোদে ধান দিয়ে ঘন ঘন উল্টে দিলে এ সমস্যা থাকে না।

গুদামজাত করার জন্য বীজের আর্দ্রতার পরিমাণ ৮-১০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে আনতে পারলে রোগ পোকার হাত থেকে ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভব।

ধান মিলে (Mill) ভাঙ্গাতে গেলে যে সব মিলে যে ধরনের চাহিদা রয়েছে সে হিসাবে (যেমন কোন কোন মিলে বীজের আর্দ্রতা ১১ শতাংশ আবার কোথাও কোথাও ১৬ শতাংশ বীজের আর্দ্রতা) বজায় রাখার দরকার হয়।

চালে যে ফাটল দেখা যায় তার বেশীর ভাগ কারণ—

- ফাটল আগে থেকে থাকে
- নয়তো দানা গান্ধি পোকা ইত্যাদির দ্বারা আক্রান্ত থাকে
- নয়তো কিছুটা ধান চিটে থাকে।

তবে ধান ভাঙ্গানোর আগে ধানে ১৫ শতাংশের মত আদ্র্তা থাকলে ভাঙ্গা চালের পরিমাণ কম হয়।

অনেক সময় দেখা গেছে যে, যে পরিমাণ নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করার কথা তা মূল সার হিসাবে প্রথমের দিকে না দিয়ে ভাগে ভাগে দিলে বিশেষ করে ফুল আসার সময় দিলে গোটা চালের পরিমাণ (Head rice) বাড়ে।

ধান সিদ্ধ করে ভাঙ্গানো হলে মোট চালের পরিমাণ এবং সেই সংগে গোটা চালের পরিমাণ অনেকখানি বাড়ে। আবার ধান আতপ ভাঙ্গানোর থেকে সিদ্ধ করে ভাঙ্গালে ৮ থেকে ৯ শতাংশ বেশী চাল পাওয়া যায়।

ভারতে ধান ভাঙ্গানোর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি রয়েছে যেমন হলার (Huller), সেলার (Sheller), আধুনিক মিল (Modern Mills) ইত্যাদি। কোনটা থেকে কতখানি চাল পাওয়া যাবে তা নির্ভর করবে কোন ধরনের চাল তৈরী করতে হবে।

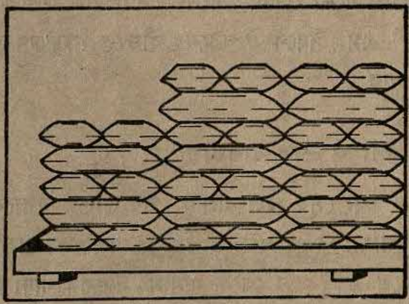
নির্দিষ্ট জাতের উপর নির্ভর করবে কত ধান থেকে কতখানি চাল পাবো। এ ছাড়া বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা একে অনেকখানি প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—

- কোন সময়ে ধান কাটা হবে
- কি ভাবে শুকনো করা হবে
- গুদামজাত কিভাবে হয়েছে
- কোন ধরনের মিলে ভাঙ্গানো হবে
- কত আর্দ্রতায় ভাঙ্গানো হবে ইত্যাদি

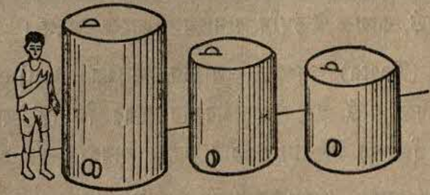
বীজ সংরক্ষণ

বীজ গুদামজাত করার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন কারণ ঐ বীজ পুনরায় চাষের কাজে লাগবে। অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল করতে হবে। সাধারণভাবে বীজকে শুকনো করার পর ৮-১০ শতাংশ আর্দ্রতায় গুদামজাত করা হয়।

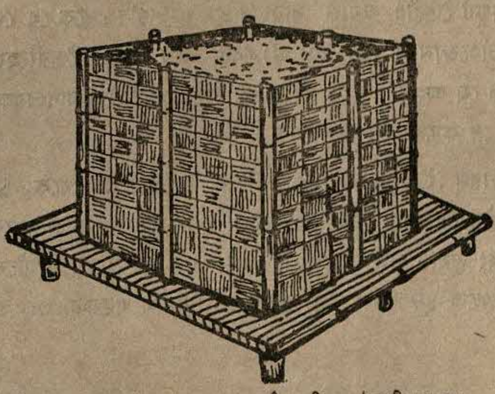
বীজ রাখার জন্য পাটের তৈরী থলে (বস্তা) (চিত্র ৭৩) বা মোটা টিন দিয়ে তৈরী 'বীন' (চিত্র ৭৪) বা ড্রাম ব্যবহার হয়। বীজের পরিমাণ যদি কম হয় তাহলে আগের বীজাধারগুলি ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই।



চিত্র ৭৩ : শুকনো করার পর ধান এভাবে বস্তায় করে সাজিয়ে রাখা হয়



চিত্র ৭৪ : টিনের তৈরী বীনে বীজ রাখা যায়



চিত্র ৭৫ : ধান রাখার জন্য বাঁশ দিয়ে তৈরী মাচান

কিন্তু বীজের পরিমাণ বেশী হলে চেরাই করা বাঁশের মাচানের (চিত্র ৭৫) উপর রাখতে হয়।

বীজের জলীয় অংশ খুব বেশী ভাবে কমে এলে বীজের উৎপাদিকা শক্তি কমে আসে। সেক্ষেত্রে ৪ থেকে ৬ মাসের গুদামজাত বীজকে ৬ ঘণ্টা ধরে জলে ডুবিয়ে রাখার পর পুনরায় শুকনো করলে আগের শক্তি ফিরে আসতে দেখা গেছে। এ ছাড়া মনো ও ডাই বেসিক সোডিয়াম ফসফেট বা সোডিয়াম ক্লোরাইডের ($১০^{-৪}$ এম) দ্রবণে ঐ ধরনের বীজকে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখলেও সমান ফল পাওয়া যায়।

ধানের উপজাত দ্রব্য ও তার ব্যবহার

ধান থেকে চাল এবং সেই চাল রান্নার পর ভাত হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। এ ছাড়া আমাদের দেশে মুড়ি, চিড়ে, দেশী মদ প্রভৃতিও ধান থেকে তৈরী হয়। বিদেশে একই ধান থেকে নানান ধরনের খাদ্য যেমন পপ্‌ট্‌ বা পাফ্‌ড্‌ রাইস, কৌটোয় রাখা ভাত ইত্যাদি করে থাকে।

ধানের খড় গোখাদ্য, ঘরের ছাদ ও উপরের ছাউনি, মাদুর, টুপি, দড়ি, শব্দ শোষণের বোর্ড, কাগজ ইত্যাদি বানানোর কাজে লাগে।

ধানের খোসা (Testa) পশুখাদ্য, মাটির উর্বরক (soil conditioner), জ্বালানি, কাগজ, শক্ত বোর্ড, ইট, সার,, মুরগীর ঘরের 'লিটার', ঘষে তুলে ফেলা যায় এরূপ ধরনের জিনিষ ইত্যাদি তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়।

ধানের তুঁষ (ভূষা) থেকে তেল হয়। ঐ তেল সাবান তৈরীর কাজে লাগে এবং ভালভাবে শোধণ করা হলে রান্নার কাজেও লাগতে পারে। গোখাদ্য ও বিস্কুট তৈরীর জন্যও ব্যবহার হয়। তুঁষ থেকে যে তেল হয় সে তেল থেকে 'ওরিজোনাল' (oryzanal) বের করে ঔষধ তৈরী হয়। তেল বের করার পর যে অংশটি পড়ে থাকে তা দিয়ে যন্ত্রপাতি ব্যবহারকালীন যাতে না ক্ষয়ে যায় সে কাজে লাগানো হয়।

ধানের জারম্ (Germ) বা ভ্রূণ ওজনে চালের ১ থেকে ১.৫ শতাংশ হয়। চাল তৈরীর সময় প্রায় ৪০ থেকে ৮০ শতাংশ চাল থেকে ঐ ভ্রূণটি খসে পড়ে এবং ভূষার সংগে (bran) মিশে। এই ভ্রূণে প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ১৬ থেকে ১৮ ভাগ এবং তেলের পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ থাকে।

অধ্যায় পনের

চালের গুণাবলী ও পুষ্টিগত মান

(Quality and Nutritive value of rice)

অধ্যায় পনের

চালের গুণাবলী ও পুষ্টিগত মান

(Quality and Nutritive Value of rice)

চালের গুণাবলী বলতে কি বোঝায় ?

চালের গুণাবলী বলতে সাধারণতঃ তিনটি জিনিষকে বোঝায় যেমন দানা দেখতে কিরূপ, রান্না করলে কিরূপ হয় এবং পুষ্টিমান বিচারে কিরূপ ?

অধিক ফলনশীল জাত আসার প্রথমের দিকে তাদের দানার প্রকৃতি বা গুণাগণ সম্বন্ধে খুব একটা বিচার বিবেচনা করার সুযোগ ছিল না। তাইচুং নেটিভ-১, আই-আর-৮ প্রভৃতি অধিক ফলনশীল জাতের দানা কিছুটা চওড়া ও শক্ত হয় আর রান্নার সময় তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। এছাড়া কিছু বেশী সময় ধরে সিদ্ধ করলে চটচটে ভাব হয়ে যায়। এমন কিছু কিছু অধিক ফলনশীল জাত রয়েছে যেগুলি আগের দেশী জাতের সুগন্ধি চালের মত (বাসমতী) লম্বা ও সরু হয়। রান্নার গুণাগুণেও অনেকটা একই রকম হয়। এজন্য সুযোগ এসেছে এখন কিছুটা চালের গুণাগুণ বিচার করে পছন্দ অনুযায়ী বেছে নেওয়ার। ১৭ নম্বর সারণিতে কতকগুলি অধিক ফলনশীল ও লম্বা জাতের ধানের দানার প্রকার, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, রান্নার গুণাগুণ ইত্যাদি দেখানো হল। এ থেকে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে।

রান্নার গুণাগুণ

রান্নার গুণাগুণ একটা তুলনামূলক কথা। এ গুণাগুণের বিচার একদেশ থেকে আর এক দেশের মধ্যে আলাদা হয়। এসব নির্ভর করে কার কিরূপ খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে কারণ প্রত্যেকের নিজস্ব একটা পছন্দ থাকে, কিভাবে এটি তৈরী হয়েছে এবং তাকে কিরূপভাবে গ্রহণ করেছে তার উপর। তাই

সারণি ১৭

কতকগুলি অধিক ফলনশীল ও লম্বাজাতের ধানের জাতের গুণগত বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন জাতি	পেটের সাদাদাগ (abdominal white)	খোসা ছাড়ানো চাল (Hulling %)	পেষাণো ধান (Milling %)	৩/৪ চাল বা গোটা চাল (Head rice %)	শর্করা-আয়োডিন নীল মূল্য	৭৭° সেণ্টিগ্রেডে জল গ্রহণের ক্ষমতা (একক)	ঘনত্ব বাড়ার অনুপাত	লম্বা বাড়ার অনুপাত	প্রোটিনের শতকরা হিসাব	রান্নার গুণাগুণ
অধিক ফলনশীল জাত										
বালা	আছে	৭৬·৪	৭০·৫	৬০·৫	৩৯·০	৩০৫	৩·৪	১·৬০	১০·২	ভাল
কাবেরী	নেই	৭৮·২	৭২·৫	৫৩·০	৪৩·০	৪১০	৪·১	১·৬২	৮·৯	খুব ভাল
হমসা	আছে (মাঝেমাঝে)	৭৪·৬	৬৮·৩	৬০·৬	৬০·০	৩১০	৩·৬	১·৬০	৯·৩	”
আই. আর. ৮	আছে	৭৭·৮	৭০·৫	২৩·৫	৪০·০	৪৪০	৪·১	১·৫৩	৭·৫	”
জগন্নাথ	নেই	৭৮·৫	৭০·৬	৫৫·৮	৪৮·০	৩৬০	৩·৮	১·৫৯	৬·৫	ভাল
যমুনা	আছে (মাঝেমাঝে)	৭৬·৮	৭০·৪	৫৭·০	৬০·০	৩৯০	৪·০	১·৬২	৯·৩	খুব ভাল
জয়া	আছে	৭৬·২	৭১·৮	২৩·০	৪০·০	৪১০	৪·০	১·৫৬	৮·৩	”
কাঞ্চী	নেই	৭৭·৭	৭১·৮	৬২·৫	৪৮·৫	৪২৫	৪·১	১·৬৭	৯·৩	”
কৃষ্ণা	নেই	৭৬·৫	৭০·৫	৬৯·২	৩৭·০	৩৬১	৩·৯	১·৭১	৭·০	ভাল
পদ্মা	আছে (মাঝেমাঝে)	৭৮·৮	৭৩·১	৫৬·১	৪২·০	৩৯৫	৪·০	১·৭২	৮·৩	খুব ভাল
পঙ্কজ	আছে (মাঝেমাঝে)	৭৮·৮	৭২·২	৬০·৪	৩০·০	৩৯৮	৩·৯	১·৭৪	৭·১	”
রত্না	নেই	৭৮·০	৭২·৪	৪৯·২	৪৫·০	৩৯৫	৩·৭	১·৭০	৯·১	ভাল
সবরমতী	নেই	৭৭·১	৭২·০	৫৯·০	৫১·০	৩৯৫	৪·১	২·০০	৮·৪	খুব ভাল সুগন্ধি
বিজয়া	নেই	৭৬·২	৭০·০	৬৩·৬	৩০·৫	২০৫	৪·১	১·৫৬	৭·৯	ভাল
টি. এন-১	আছে	৭৮·৪	৭২·৫	৫৫·০	৩১·০	৪৯৫	৪·৩	১·৭২	৯·৪	খুব ভাল
লম্বাজাত										
টি-১৪১	নেই	৭৫·১	৭১·০	৫৯·৫	৩৯·০	৩২৫	৩·৯	১·৬৫	৭·১	ভাল
এম. টি. ইউ ১	নেই	৭৬·৫	৭১·৫	৫৮·৫	৪৭·৫	২৭৫	৩·৪	১·৫২	৭·৪	”
টি. কে. এম ৬	নেই	৭৪·৫	৭০·০	৬০·১	৫৬·০	২৬০	৩·৭	১·৫১	৯·৪	”
এস. এল ও ১৩	নেই	৭৬·৪	৭১·৫	৫৮·০	৫০·০	৩৭০	৩·৯	১·৬১	৯·১	”
কো-২৯	নেই	৭৫·৫	৭০·৩	৫০·৫	৫০·০	৩৯০	৪·১	১·৬০	১০·৬	খুব ভাল
বাসমতী ৩৭০	নেই	৭৫·১	৭০·১	৬১·৮	৫০·০	৩৯৫	৪·৪	২·৩০	৯·৬	ভাল সুগন্ধি

উৎস : এস. গোবিন্দস্বামী এবং এ. কে. ঘোষ (১৯৭২) ইণ্ডিয়ান জার্নাল. এগ্রিক. সায়েন্স ৪২ (১১) : ৯৯৩-৯৯৮ ।

সারণি—১৮

কতকগুলি অধিক ফলনশীল ধানে এ্যামিনো এ্যাসিডের পরিমাণ

[এ্যামিনো এ্যাসিড (গ্রাঃ) / ১৬ গ্রাম নাইট্রোজেনে এটিকে ১০০ শতাংশ পেয়ে থাকে ধরে নেওয়া হচ্ছে]

এ্যামিনো এ্যাসিড	বিভিন্ন ধানের জাত					
	বাসমতী	সবরমতী	হমসা	পদ্মা	জয়া	আইআর ৮
মোট প্রোটিন%	১০·৫০	১০·৮০	১০·৭০	৮·৬০	৮·০০	৮·০০
এ্যাসপার্টিক এ্যাসিড	৭·৮৪	৯·৭৪	৯·১৮	১০·৩৮	১০·৮৩	৮·১৩
থ্রিয়োনাইন	৩·৮২	৪·১৬	৩·৭১	৪·৪১	৪·৩৬	৪·০৫
সেরিন	৬·৪০	৮·০১	৭·৯০	৬·৪১	৬·৬১	৭·০৮
গ্লুটামিক এ্যাসিড	২৫·৫৪	২০·৪৮	২৩·০৯	২২·২৩	২০·৫০	২২·০৬
গ্লাইসিন	৫·১০	৮·৪৬	৭·৩৩	৬·৭৮	৬·৮৬	৬·২৪
এলানিন	৪·০৭	৮·৮৭	৮·১১	৬·৯৬	৭·০৬	৬·০৪
ভ্যালিন	৬·৩৪	৪·০৯	৪·৮২	৬·৯৯	৬·২৮	৬·১৪
সিস্টিন	২·০৪	২·৫৭	২·১৯	২·৮৩	২·৬১	২·০৪
মিথিওনাইন	১·৩৩	২·৯৫	১·৯৬	২·৩২	২·৪৮	২·৪০
আইসোলিউসিন	৪·৭২	৫·০২	৪·২৮	৫·০২	৫·৪৯	৪·৪৮
লিউসিন	৯·৯৩	৭·২৬	৯·১০	৮·৩৬	৮·৯০	৭·৪০
টাইরোসিন	৪·১৯	৪·৬৪	৪·৬৯	৩·৭৬	৩·৯৮	২·৪২
ফিনাইল এ্যালানিন	৩·৬৫	৬·৯৪	৫·১১	৫·৭৩	৪·০৪	৫·০২
লাইসিন	৩·৮৯	৪·০০	৩·৭২	৪·৩০	৪·২১	৩·০১
হিসটিডিন	২·৬৯	২·০২	২·২০	২·০২	২·৮৭	২·০৯
আরজিনিন	৭·৬৮	৫·৭৭	৬·৫৩	৮·১৮	৮·১১	৬·৮২
ট্রিপটোফ্যান	০·৯৯	১·০৭	১·১২	১·০৫	০·৮২	০·৯২
সত্যিকারের গ্রহণ যোগ্য%	৯৭·০০	১০০·০০	৯৬·৪০	৯০·৫০	৯২·২০	৮৯·০০

উৎস : এম. এস. স্বামীনাথন, ই. এ. সিদ্দিকি এবং এ. কে. ফাউল (১৯৭১) ইণ্ডিয়ান ফার্মিং, ২১ (৭) : ১৩-১৭, (অক্টোবর সংখ্যা)

ধানের বিভিন্ন জাতের যোগ্যতা নির্ভর করছে যারা খায় তাদের খাওয়ার বাচ-বিচারের উপর। তারা সেই হিসাবে জাতিগত গুণাগুণের শ্রেণী বিভাগ করেছে। রান্না করা চাল একটি অন্যটির সংগে সংগে কতটা জুড়ে থাকছে ও কতটা সিদ্ধ হচ্ছে তা নির্ভর করে সাধারণতঃ এ্যামাইলোজ (amylose) ও এ্যামাইলোপের্কটিন (amylopectin) নামক চালের দুই শর্করা জাতীয় পদার্থের উপর। যদি কোন জাতের ধানে এ্যামাইলোজের (amylose) পরিমাণ ২০ শতাংশের কম হয় তাহলে সিদ্ধ করলে খুব চটচটে হয়। ভারতে যেসব জাত এখন রয়েছে তাদের এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২০ থেকে ৩২ শতাংশের মত থাকে।

এ্যামাইলোজের মাত্রা ছাড়া চালে জিলেটিলাইজেসন (জমে যাওয়া) তাপমাত্রার (অর্থাৎ যে তাপমাত্রায় চালের শর্করা জাতীয় দানা জলে পড়লে ফুলে উঠে) উপর রান্নার গুণাগুণ নির্ভর করে। ৬৯° সেণ্টিগ্রেড থেকে ৭৫° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে দানার আয়তন বাড়ে বা কমে, এছাড়া জল গ্রহণ ক্ষমতা, দানার আয়তন বাড়া কমা, ভাত ভেঙ্গে যাওয়ার মাত্রা, রান্না করার পর কত সময় ভালভাবে রাখা যায় ইত্যাদি রান্নার গুণাগুণের মধ্যে বিচার্য্য।

ধান ভাঙ্গানোর পর গোটা চালের (Head rice) পরিমাণ কত হবে তা ১৭নং সারণিতে দেখানো হয়েছে এবং এই পরিমাণ কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা ধান ভাঙ্গানো সম্বন্ধে যেখানে বলা হয়েছে সেখানে আলোচিত হয়েছে।

চালের পুষ্টিগত মান

যদিও বা চালে প্রোটিন ও ভিটামিনের পরিমাণ বেশ কিছু রয়েছে তথাপি একে শর্করা জাতীয় খাদ্য হিসাবে বলা হয়। চালে প্রোটিনের মাত্রা সাধারণতঃ ৫ থেকে ৬ শতাংশ থাকে যা অন্যান্য যে কোন দানা শস্যের থেকে বেশ কম। কিন্তু এ্যামিনো এসিড ও প্রোটিনের জৈবিক মূল্যের (হজম যোগ্যতা ও কাজে লাগার দিকে) দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে অন্যান্য দানা শস্যের তুলনায় বেশী। এই এ্যামিনো এসিড ও প্রোটিনের একসংগে জৈবিক মূল্য হিসাব করলে দেখা যায় ধানে ৯৬·৫ শতাংশ কিন্তু তা বেড়ে চালের ক্ষেত্রে ৯৮ শতাংশ হয়। স্নেহ জাতীয় পদার্থের পরিমাণ কমই থাকে বলতে হবে (২ থেকে ২½ শতাংশ)। কিন্তু তা চাল তৈরির সময় বেশীর ভাগ নষ্ট হয়ে যায়। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস যথেষ্ট কম থাকে। ক্যালসিয়াম / ফসফরাস অনুপাত মোটেই সুবিধার নয়,

১ : ১০ অনুপাতে থাকে। কিন্তু ১ : ২ অনুপাতে থাকতে পারলে ভাল। গমের মত খোসা ছাড়ানো চালে সাধারণতঃ 'বি' জাতীয় ভিটামিন থাকে। আবার গমের তুলনায়, এটিতে থিয়ামিন কম থাকে।

চালে কোন্ কোন্ উপাদান ও কত কত পরিমাণে থাকবে তা যদিও বা বিভিন্ন জাতীর উপর নির্ভর করে তথাপি কোন প্রকার মাটিতে হয়েছে, কি কি সার ও কত মাত্রায় ব্যবহার হয়েছে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। ১৮নং সারণিতে কতকগুলি অধিক ফলনশীল জাতের চালের পুষ্টিগত মান দেখানো হলো। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে লম্বা ইণ্ডিকা জাতের ধানের সংগে অধিক ফলনশীল ধানের মধ্যে পুষ্টিগত মানের বিচারে খুব একটা পার্থক্য নেই।

যদিও বা চালেরপ্রোটিন পুষ্টিগত মানের দিক দিয়ে অন্যান্য দানা শস্যের তুলনায় খুব উচ্চমানের তথাপি দেখা যায় চাল যেসব দেশের লোকে বেশী খায় তারা প্রোটিনের অভাবজনিত অপুষ্টিতে ভুগছে। সম্ভবতঃ প্রোটিন কম মাত্রায় (৬-৯ শতাংশ) থাকার জন্যও হতে পারে এবং সেই সঙ্গে ধান ভাঙ্গানো ও চাল পরীক্ষা করার সময় অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায় বলেও হতে পারে। ক্রুড প্রোটিন, প্রোটিনে এ্যামিনো এসিডের পরিমাণ এবং শাঁশে কিভাবে ছড়িয়ে আছে তার উপরও নির্ভর করছে চালের পুষ্টিগত মান। চালে যদি প্রোটিনের পরিমাণ বাড়ে তাহলে চালের পুষ্টিগত মানও বাড়বে এবং সেই সংগে যারা চাল খায় তাদেরও পুষ্টি সাধন বেশী হবে এই আশা করা যায়। ১৭নং সারণি থেকে দেখা যাবে কতকগুলি অধিক ফলনশীল জাত বিশেষ করে বালা, কানচী, হমসা ইত্যাদির চালে বেশী পরিমাণে ও ভাল মানের প্রোটিন থাকে।

যদি নাইট্রোজেন সার তিনটি ভাগে দেওয়া যায়, বিশেষ করে ফুল আসার সময় তাহলে দানায় প্রোটিন বাড়ানো সম্ভব হয়।

অধ্যায় ষোল

ধান চাষের অর্থ নৈতিক হিসাব
(Economics of Rice Cultivation)

ধান চাষের অর্থনৈতিক হিসাব এক জায়গা থেকে অন্য জায়গার মধ্যে এমন কি একই জায়গায় এক উৎপাদকের থেকে আর এক উৎপাদকের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কারণ বিভিন্ন উৎপাদকের মধ্যে সংগতির তারতম্য দেখা যায়। এ ছাড়াও যেসব বিষয়গুলি অর্থনৈতিক হিসাবকে প্রভাবিত করে তাহলো—

- কোন ধরণের জমিতে চাষ হয়েছে অর্থাৎ জমি উঁচু না নীচু প্রকৃতির, জমির উর্বরতার মান কেমন ইত্যাদি
- কিভাবে চাষ হয়েছে—বোনা না রোয়া করে
- ধানের জাত কি—দেশী অথবা অধিক ফলনশীল ধান
- সেচের সুবিধা রয়েছে না বৃষ্টি নির্ভর চাষ
- চাষের পদ্ধতি—প্রচলিত বা উন্নত প্রথায়
- উৎপাদক তার নিজের জমিতে চাষ করছে না বর্গা হিসাবে করছে
- এছাড়া ছোটখাটো কৃষি যন্ত্রপাতি, স্প্রেয়ার ইত্যাদি কৃষকের নিজের না ভাড়ায় আনছে তাও বিচার্য্য বিষয়। এর সংগে পরিবারের লোক কতটা চাষের কাজে সাহায্য করছে তাও ধরতে হবে।

মোটামুটিভাবে ধানের অর্থনৈতিক হিসাবের একটা নমুনা (সারণি ১৯) দেওয়া হল যা পশ্চিমবঙ্গের সার্মগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের হিসাবের অনুরূপ।

সারণি ১৯
এক হেক্টার ধান চাষে আয় ও ব্যয়ের হিসাব
(সেচ ও অসেচ উভয় অবস্থার জন্য)

খরচের বিবরণ	প্রাক খরিফ আউশ, রোয়া		প্রাক খরিফ আউশ, রোয়া		আমন, রোয়া		দেশী জাত	বোরো রোয়া
(১)	সেচ (২)	অসেচ (৩)	সেচ (৪)	অসেচ (৫)	সেচ (৬)	অসেচ (৭)	অসেচ (৮)	সেচ (৯)
বীজের পরিমাণ (কেজি)	৫০	৭৫	৪৭.৫	৬২.৫	৫০	৫০	৫০	৭৫
দাম (টাকা)	১২৫	১৮৭.৫০	২১৮.৭৫	১৫৫	১২৫	১২৫	১২৫	১৮৭.৫০
জৈবসার (গরুর গাড়ির সংখ্যা)	২৫	৩০	২৫	২৫	২৫	৩০	২৫	১৩৭.৫০
দাম (টাকা)	৩৭৫	৪৫০	৩৭৫	৩৭৫	৩৭৫	৪৫০	৩৭৫	৫৬২.৫০
অজৈবসার কেজি (নাঃ ফঃ পঃ)	৫০:২৫:২৫	৪০:২০:২০	২৫:২৫:২৫	১৫:১৫:১৫	৬০:৩০:৩০	৫০:২৫:২৫	৩০:১৫:১৫	৭৫:৩৭.৫:৩৭.৫
দাম (টাকা)	৪১৭.৯৩	৩৩১.৯৩	২৯৯.৮০	১৬৮.৮৮	৫০০	৪১৭.৯৩	২৪৯.৭৫	৬২৬.৬৮
কীটনাশক ঔষধ (দাম টাকা)	১৬৭.৫০	১৫০.০	১৬৭.৫০	১০০.০০	১৬৭.৫০	১৬৭.৫০	১২৫	৩৭৫
জমি তৈরীর খরচ (টাকা)	২০০.০০	২২৫.০০	২০০.০০	১০০.০০	২০০.০০	১৫০.০০	১২৫.০০	২০০.০০
জল (হেক্টার ইঞ্চি)	৪০.০০		২৫.০০		২০.০০			১২৫.০০
দাম (টাকা)	২০০.০০		১২৫.০০		১০০.০০			৬২৫.০
মজুর (সংখ্যা)	২৬৩.০০	২৫০.০০	২৮৮.০০	১৮৮.০০	২৬৩.০০	২৬৩.০০	২০০.০০	২৭৫.০০

খরচের বিবরণ	প্রাক খরিফ আউশ, রোয়া		প্রাক খরিফ আউশ, রোয়া		আমন, রোয়া		দেশী জাত	বোরো রোয়া
(১)	সেচ (২)	অসেচ (৩)	সেচ (৪)	অসেচ (৫)	সেচ (৬)	অসেচ (৭)	অসেচ (৮)	সেচ (৯)
দাম (টাকা)	২১২৬'২৫	২২১৫	২৩২৮'৭৫	২০২৫	২১২৫	২১২৫	১৬২০	২২২৭'৫০
খরচ (টাকা)	৩৬৩১'৬৮	৩৪৬০	৩৭৩৪'৮	২৯২৩'৭৫	৩৬১২'৫০	৩৪৫৬'৯২	২৭১৯'৭৫	৪৮০৪'৩৮
টাকার সুদ (টাকা)	২০০'০০	১৯০'০০	১৯৭'৫০	১৫৭'৫০	১৯৫'০০	১৯০'০০	১৫৮'২	২৫০'০০
ফলন (কুইন্টাল)	৪৭'৫	৪২'৫	৪২'৫	৩২'৫	৫০'০	৪৭'৫০	৩২'৫	৬২'৫
দাম (টাকা)	৪৯৮৭'৫	৪৪৬২'৫	৪৫৯০'০	৩৪১২'৫	৫৫০০'০	৪৯৮৭'৫০	৩৪১২'৫	৬৭৫০'১
উপজাত দ্রব্য (কুইন্টাল)	৯০'০	৬৫'০	৬৭'৫	৬৫'০	৭৭'৫	৭৫'০	৬৫'০	৮২'৫
দাম (টাকা)	৮০০'০	৯৭৫'০০	৬০০'০	৯৭৫'০	৬৭৫'০	১১২৫'০	৯৭৫০	৮২৫'০
মোট ফলন ও উপজাত দ্রব্যের দাম (টাকা)	৫৭৮৭'৫	৫৪৩৭'৫	৫১৯০'০	৪৩৮৭'৫	৬১৭৫'০	৬১১২'৫	৪৩৮৭'৫	৭৫৭৫'০
মোট খরচ (টাকা)	৬৮৩০'০	৩৬৫০	৩৯৩২'৩	৩০৮১'২৫	৩৮০৭'৫	৩৬৪৬'৯২	২৭৭'২	৫০৫০'০
মোট লাভ (টাকা)	১৯৫৬'৫৮	১৭৮৭'৫	১২৩২'৫	১৩০৭'৫	২৩৬৭'৫	২৪৬৫'০	১৭২০'০	২৫২০'৬৩

যেখানে কোন উল্লেখ নেই সেখানে অধিক ফলনশীল ধানের জাত ব্যবহার করা হয়েছে ধরে নিতে হবে।

অধ্যায় সতের

পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষের সমস্যা ও সমাধানের কিছু উপায়

(Problems of Rice Cultivation in West Bengal and tips for Solution)

অধ্যায় সতের

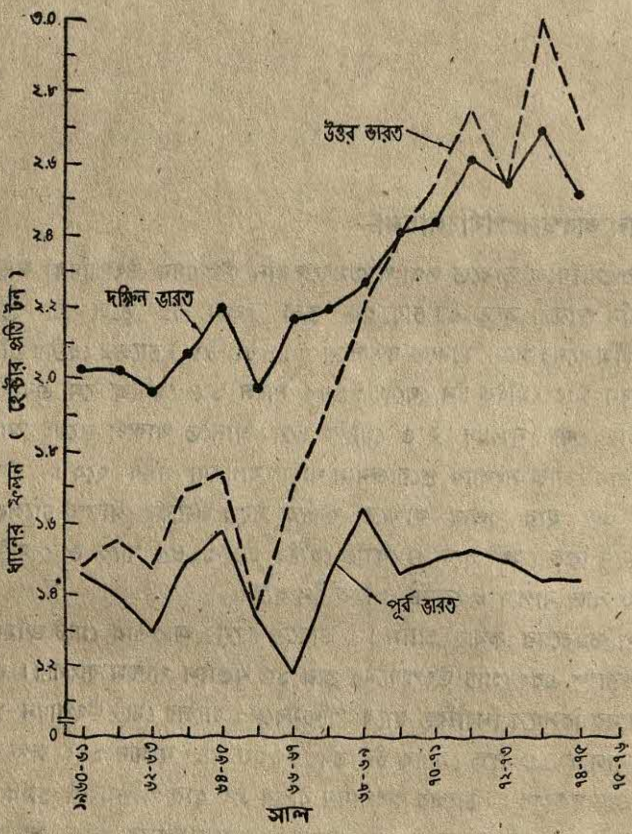
পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষের সমস্যা ও সমাধানের কিছু উপায়

বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা—

প্রথম দিকে ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে ধান উৎপাদন, উৎপাদিকা শক্তি এবং কতখানি জায়গা জুড়ে এর চাষ হয় তার একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কৃষি কমিশনের মতে ভারতে বর্তমানে (১৯৮০-৮১) চালের হেক্টার প্রতি গড় উৎপাদন ১·৩ মেট্রিক টন থেকে ১৯৮৫ সালে ১·৬ মেট্রিক টনে এবং চলতি শতাব্দীর শেষ নাগাদ ২·৫ মেট্রিক টনে আনতে পারলে তবেই আমাদের ক্রমবর্ধমান লোক সংখ্যার প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগানো সম্ভব হবে। উৎপাদন বৃদ্ধির এই হার বজায় রাখতে পারলে সত্তর দশকের গোড়ায় চালের মোট উৎপাদন কিছু বেশী হলে ৪ কোটি মেট্রিক টন, ১৯৮৫ সালে ৬ কোটি এবং ২০০০ সাল নাগাদ ৮ কোটি মেট্রিক টন হবে।

পশ্চিমবঙ্গের কথায় আসি। ভারতে ধানের আওতায় মোট জমির প্রায় ১৪ শতাংশ এবং মোট উৎপাদনের প্রায় ১৫ শতাংশ পশ্চিম বাংলার। জাতীয় কমিশনের হিসাবে নির্ধারিত হারে পশ্চিমবঙ্গের চালের মোট উৎপাদন ১৯৮৫ সাল নাগাদ ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ২০০০ সাল নাগাদ ১২০ লক্ষ মেট্রিক টন হওয়া দরকার। চালের উৎপাদন বৃদ্ধির এই হার পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৫ এবং ২০০০ সালে অনুমিত জনসংখ্যার খাদ্যশস্যের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির এই হারে এই সময়ের মধ্যে পৌঁছানো রীতিমত কষ্টসাধ্য। এ রাজ্যের আউশ, আমন ও বোরো—এই তিনটি ধানের ফলনের মধ্যে আমন ধানের আনুপাতিক অবদান প্রায় ৭৫-৮০ শতাংশ যার গড় ফলনের হার বর্তমানে হেক্টার প্রতি মাত্র ১·২৫ মেট্রিক টন। ১৯৮৫ সালে চালের গড়

ফলন নির্ধারিত হারে হেক্টার প্রতি ১·৬০ মেট্রিক টনে নিতে হলে ফলনের হার হেক্টারে গড়ে ৩·৫ থেকে ৫ কুইন্টালে বাড়াতে হবে। ফলন বৃদ্ধির এই হার বজায় রাখতে পারলে ষষ্ঠ যোজনার শেষে (১৯৮২-৮৩) আমন ধানের আওতায় মোট ৪২-৪৩ লক্ষ হেক্টার জমি থেকে অতিরিক্ত প্রায় ১৫ লক্ষ টন চাল পাওয়া যাবে এবং ১৯৮৫ সাল নাগাদ অতিরিক্ত প্রায় ১৮-২০ লক্ষ টন চালের উৎপাদন আশা করা অসঙ্গত হবে না।



চিত্র ৭৬—ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ধানের গড় ফলন

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী ধান উৎপাদন করে কিন্তু গড় ফলনের দিক থেকে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের (চিত্র ৭৬) রাজ্যগুলি অনেক উপরে।

স্বাধীনতার পর ধানের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এই বৃদ্ধির কিছুটা এসেছে চাষের মোট এলাকা বাড়ার জন্য, কিছুটা এসেছে ষাট শতকের আগে কৃষি বিভাগ কতকগুলি উন্নত জাতের ধান প্রচলনের জন্য এবং বেশির ভাগ এসেছে ষষ্ট শতকের মাঝামাঝি সময়ের পর অধিক ফলনশীল ধানের জাতগুলি চালু হওয়ার জন্য। গড় ফলন ও উৎপাদনের হার খতিয়ে দেখলে দেখা যায় যে অধিক ফলনশীল জাতগুলির গড় ফলন ক্রমশ বেড়েছে (বিশেষত বোরো মরশুমে)। কিন্তু দেশী ও স্থানীয় জাতগুলির গড় ফলন প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। অন্যান্য ফসলের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে আমন ধানের গড় ফলনের বিশেষ উন্নতি হয়নি। সেদিক দিয়ে আউস ও বোরোর বর্তমান গড় ফলন হেক্টার প্রতি ৮১৯ ও ৪১৯৫ কেজিতে দাঁড়িয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় বোরোতে পশ্চিমবঙ্গেও অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব। কিন্তু আবার খরিফে বা প্রাক খরিফে আশা অনুযায়ী হচ্ছে না। তাই এর কারণগুলি বিশ্লেষণ করার পর ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ঠিক করা সহজ হবে।

পরিবেশগত সমস্যা (চিত্র ৭৭)

শস্যের গড় ফলন বাড়ানোর জন্য যে পরিবেশগুলি বাধা দেয় সেগুলি মোটামুটিভাবে—

(ক) প্রকৃতি ও মাটির পরিবেশ
(খ) প্রযুক্তিগত পরিবেশ
(গ) সমাজ অর্থনৈতিক পরিবেশ

(ক) প্রকৃতি ও মাটির পরিবেশ :

এই পরিবেশের উপর মানুষের কোন হাত নেই বললেই চলে। বরং এটিকে মেনে নিয়ে অন্যভাবে উৎপাদন বাড়াবার কথা চিন্তা করাটা ঠিক হবে।

● ধান সাধারণতঃ তিনটি ঋতুতে হয়ে থাকে প্রাক খরিফ, খরিফ এবং বোরো। বোরো ঋতুতে গাছের জীবনকালে আকাশ পরিষ্কার থাকে। কোন রকম ঝড়ো আবহাওয়া ইত্যাদির জন্য আকাশ মেঘে ঢেকে থাকে না। গাছ দিনের আলো বেশী পেতে পারে। গাছের সালোক সংশ্লেষের ফলে শ্বেতসার খাদ্য বেশী জমতে পারে। তাই বোরো মরশুমে বেশী ফলন হওয়ার এটি একটি প্রধান কারন।

● বোরো মরশুমে মাঠে জল বেশী না থাকায় অধিক ফলনশীল ধান চাষ করা সম্ভব।

● অপর দিকে প্রাক খরিফে আউস ধানের চাষ প্রায় মোট জমির ১৫% ও খরিফে আমন ধান ৭৬ শতাংশে হয়।

● এই সময়ে আকাশ মেঘে ঢেকে থাকে বেশীর ভাগ সময়। সালোক সংশ্লেষের জন্য দিনের আলো কম পায় তাই খাদ্য তৈরী কম হয়।

● অধিক ফলনশীল ধান আউস হিসাবে মাত্র মোট ধানের জমির ⅓ অংশ এবং খরিফে ⅓ অংশের কিছু বেশী জমিতে সম্ভব হয়। বাকি জমিতে স্থানীয় দেশী ধানের চাষ করতে হয়। তাই আশানুরূপ ফলন হয় না।

● রাজ্যের প্রায় ১০ থেকে ১২ শতাংশ আমনের জমি বর্ষার প্রথমে বা পরের দিকে বন্যাকবলিত হবার সম্ভাবনা থাকে এবং তার ফলে ঐ এলাকার ফলন অনেক কমে যায়। যার প্রভাব গড় ফলন ও মোট উৎপাদনের উপর অবশ্যই পড়ে।

● বর্ষাকালে আর্দ্র আবহাওয়ার ফলে রোগ-পোকার আক্রমণের প্রবণতা বেশী হয়।

● যদিওবা ধান সব রকম মাটিতে হতে পারে তবে পশ্চিমবঙ্গের মোট ধানের জমির বেশ অনেকটা অংশ নোনা হওয়ায় ফলন আশানুরূপ হয় না।

● পুরুলিয়া, বাঁকুড়া প্রভৃতি জায়গায় ধানের বৃদ্ধির শেষের দিকে প্রায়ই খরায় পড়ে।

(খ) প্রযুক্তিগত পরিবেশ

● জলের সুষ্ঠু ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের সুযোগ কম। এমন কি সেচ সেবিত এলাকায়ও ছোট শাখা খাল ও মাঠ নালা ইত্যাদির অভাবে ঠিক ঠিক মত সেচ দেওয়া যায় না। এর ফলে অনেক এলাকায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় না।

● যথাযথ পরিমাণ সার ব্যবহার না করা

● বীজতলায় ও রোয়া জমিতে যথাযথ পরিচর্যা ও তদারকির অভাব

● ফসলের রোগ-পোকা দমন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব

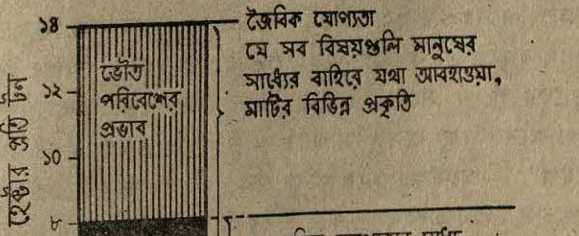
● সেচের সুযোগ কম। আশ্বিন—কার্তিকে কম বৃষ্টি বা খরার ভাব দেখা গেলে ফলন কমে যায়।

(গ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারন

● অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যারা চাষ করে তারা জমির মালিক নয়। হিসাবে দেখা গেছে মোট চাষযোগ্য জমির অর্ধেক মাত্র ১০ শতাংশ কৃষি-

পরিবারের হাতে রয়েছে। এরা ঠিক ঠিক মত চাষের কাজ দেখা শোনা করে না। বাকি অর্ধেক জমির চাষবাস নির্ভর করে ৪৫ শতাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের উপর।

- এই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদনের মূলধনের অভাব রয়েছে। কৃষি-ঋণ নেওয়ার ব্যাপারেও নানা সমস্যা রয়েছে।
- ভাগ-চাষের আনুপাতিক হার বেশী হবার ফলে উপযুক্ত বিনিয়োগ ও পরিচালন দক্ষতার অভাব দেখা যায়।
- গ্রামাঞ্চলে উপকরন সরবরাহ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামতির ভাল ব্যবস্থা নেই।
- এখন বিদ্যুৎ এবং ডিজেল সরবরাহের ব্যাপারেও সমস্যা দেখা দিয়েছে।
- উপযুক্ত বিপনণ ব্যবস্থার অভাব—লাভজনক সহায়ক মূল্য প্রকল্প এবং নিয়ন্ত্রিত বিপনণ ব্যবস্থার চালু করা আবশ্যক।



চিত্র ৭৭—বর্তমানে অধিক ফলনশীল জাতগুলির প্রকৃত ফলন ক্ষমতা ও জৈবিক যোগ্যতার মধ্যে কতখানি পার্থক্য রয়েছে এবং কি কারণে রয়েছে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সমস্যা সমাধানে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য

আগে যে সব সুবিধা বা অন্তরায়গুলির কথা বলা হল তা রাতারাতি সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু ঐগুলিকে মোটামুটি স্বল্পমেয়াদী, মধ্যম মেয়াদী ও

দীর্ঘমেয়াদী ভাবে ভাগ করে একটি সুসংহত পরিকল্পনা রূপায়নের কার্যক্রম নেওয়া সম্ভব।

বোরো মরশুমে চাষের উপযোগী বেশ কিছু অধিক ফলনশীল ধান আমাদের দেশে এখন পাওয়া যাচ্ছে এবং তা থেকে আমরা ভাল ফলও দেখতে পাচ্ছি।

প্রাক খরিফের জন্য কিছু অধিক ফলনশীল জাত থাকলেও তা সব ক্ষেত্রে উপযোগী হয়ে উঠে না। কারণ তাদের খরা সহ্য করার ক্ষমতা কম—অথচ আউসের অন্যতম প্রধান অঞ্চল নদীয়া, মুর্শিদাবাদ বা মালদহের উপযোগী ধানের এই গুণ থাকা দরকার। তেমনি তরাই অঞ্চলে যেখানে আউশের সময় বৃষ্টিপাত বেশী, সেখানেও অধিক ফলনশীল ধানের জাতেরও কিছুটা অভাব রয়েছে। সব মিলিয়ে এই সব জমির পরিমাণ কমও নয়।

খরিফ মরশুমে যেখানে জলের নিয়ন্ত্রণ থাকে সেখানে অধিক ফলনশীল ধান চাষের কথা সুপারিশ করা যায়। কিন্তু যেখানে নিয়ন্ত্রণ নেই সেখানে দেশী উন্নত ধানের চাষ করা ভাল। অঞ্চল ভিত্তিক সমস্যা অনুযায়ী দেশী ধান যেগুলি রয়েছে তাকে ধীরে ধীরে উন্নত করতে হবে। অর্থাৎ দেশী ও বেঁটে জাতের গুণের সমন্বয় ঘটিয়ে বিভিন্ন জাত তৈরী করতে হবে যাকে বিজ্ঞানীরা অনেক সময় বলেন "মাঝারি গুণযুক্ত প্রজাতি বা ইনটারমিডিয়েট প্ল্যাণ্ট টাইপ"। অনেকের কাছে খটকা ঠেকবে কিন্তু গভীর জলের ধানে এই ধরনের প্রচেষ্টা চলছে এবং বলা যেতে পারে ধীরে ধীরে সাফল্যের মুখ দেখছে। চুঁচুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্রে এই দিকে কাজ শুরু হয়েছে এবং ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতায় ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পর্ষদ পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় খরিফ মরশুমে ধানের ফলন বাড়াবার অন্তরায়গুলির সমীক্ষা ও তার সমাধানের কতকগুলি সূত্র দিয়েছেন। এ বিষয়ে গবেষণা ও সম্প্রসারণের কাজও শুরু করা হয়েছে। এ সম্পর্কে দুটি ক্রিয়াত্মক গবেষণার কাজ (অপারেশন রিসার্চ) পশ্চিম বাংলার বর্ধমান ও হুগলী জেলায় চলছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য কৃষকের স্তরে তাঁর উৎপাদনগত সমস্যার মোকাবিলা করে উৎপাদন বাড়াবার উপায় বের করা। কৃষির উপযোগী গবেষণা (এডাপটিভ রিসার্চ) এবং কৃষি সম্প্রসারণ পদ্ধতি আরো জোরদার করার অবকাশ রয়েছে।

প্রযুক্তিগত ও সামাজিক—অর্থনৈতিক বাধাগুলি সরকারী স্তরে সুপরিকল্পনার

মাধ্যমে অনেকটা দূর করা সম্ভব। কিন্তু পরিবেশগত অন্তরায়গুলির সমাধান সময় সাপেক্ষ। অধিকতর সেচ ও জলনিকাশী ব্যবস্থা চালু করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু সাংগঠনিক কিছু প্রচেষ্টার মাধ্যমে সরকারী উদ্যোগে সমবায়িক ভিত্তিতে কৃষি পরিচর্যার ফলে স্থানীয় জাতের ধান চাষে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসা সম্ভব। মোট কথা এর উন্নতি করতে গেলে অনেক কিছু ভাববার ও করবার আছে।

অধ্যায় আঠার

পশ্চিমবঙ্গে সেচসেবিত ও বৃষ্টিনির্ভর এলাকায় ধানের সংগে বহুফসলী চাষের শস্যপর্যায়

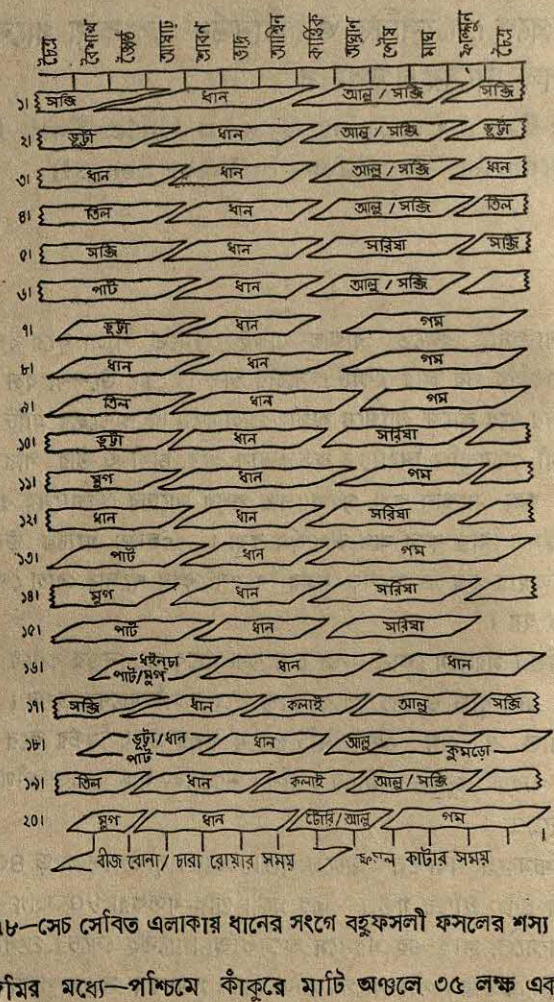
(Rice Based Cropping System Under Both Irrigated and Rainfed Conditions in West Bengal)

শস্য-পর্যায় বলতে বোঝায় একই জমিতে পালা করে বছরের বিভিন্ন সময়ে একটির পর আর একটি ফসলের চাষ। এর উদ্দেশ্য হল চাষের জমি সারা বছর ধরে কাজে লাগিয়ে অর্থাৎ পালাক্রমে ঐ অঞ্চলের মাটি ও জলবায়ুর উপযোগী কতকগুলি নির্বাচিত ফসল চাষ করে, চাষী ও তাঁর পরিবারের সারা বছরের অন্ন সংস্থান করা, গৃহপালিত পশুর খাদ্যের যোগানের ব্যবস্থা করা ও উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা। এছাড়া মাটির উদ্ভিদ খাদ্যের সুসম ব্যবহার হয় ও অনেক সময় বিশেষ কোন শস্যের রোগ পোকা আক্রমণ প্রতিহত হয়।

বিভিন্ন মরসুমে কোন্ ফসল চাষ করা যাবে তা নির্ভর করবে মাটি, জমির অবস্থান এবং বৃষ্টি ও সেচ থেকে প্রাপ্ত জলের পরিমাণের উপর। পশ্চিমবঙ্গে বর্ষা, শীত ও গ্রীষ্ম এই তিনটি প্রধান ঋতুর উপর নির্ভর করে তিনটি কৃষি মরসুম—খরিফ (জুন—অক্টোবর) রবি (নভেম্বর—মার্চ) এবং গ্রীষ্মকাল (মার্চ-জুন) হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে সারা বছরের বৃষ্টিপাত গড়ে ৪৫ ইঞ্চি থেকে শুরু করে ১৫০ ইঞ্চির মত। এর মধ্যে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ বৃষ্টি পাওয়া যায় বর্ষাকালে, তাই এই মরসুমে অনেক জায়গাতেই সেচের প্রয়োজন হয় না, তবে এই বৃষ্টি চার / পাঁচ মাসের প্রতি মাসে সমান বা সময়োপযোগী সাধারণতঃ হয় না। কখনও কখনও বর্ষাকালেও দীর্ঘ সময় ধরে খরা চলে—যার ফলে ফসলের ক্ষতি হয়। বৃষ্টি শুরু হওয়ার সময়ও সুনিশ্চিত নয়, বর্ষা দেরীতে এলে

বীজ বোনা বা চারা রোয়াতে বিলম্ব হয়। ধানে শীষ বেরোনর মুখে জলের খুব প্রয়োজন, এই সময় বৃষ্টি না হলে ফলন কমে যায়। আবার এক সংগে অধিক বৃষ্টির ফলেও বন্যার প্রকোপে ফসল নষ্ট হয়। অধিক উৎপাদন ও লাভজনক বহুফলসী চাষের জন্য রবি ও খরা মরশুমে অর্থাৎ নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত সেচের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই রাজ্যের ১৩৮ লক্ষ একর

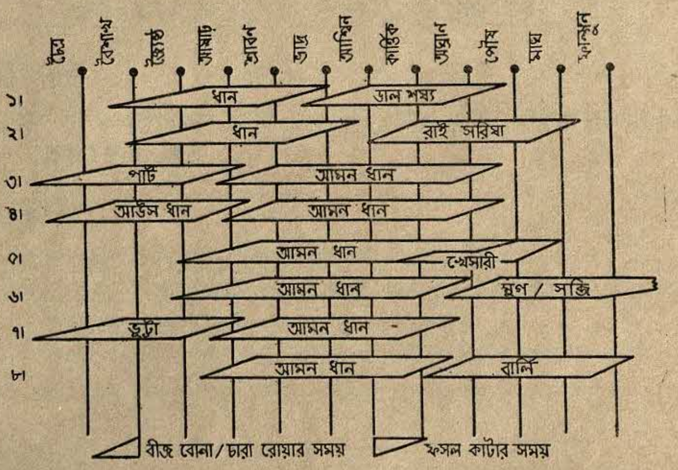


চিত্র ৭৮—সেচ সেবিত এলাকায় ধানের সংগে বহুফসলী ফসলের শস্য পর্যায়

চাষের জমির মধ্যে—পশ্চিমে কাঁকুরে মাটি অঞ্চলে ৩৫ লক্ষ একর, পার্বত্য অঞ্চলে ৩ লক্ষ একর এবং সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে ২৫ লক্ষ একরে গ্রীষ্মকালে কোন সেচের ব্যবস্থা নেই। পশ্চিমবঙ্গের মধ্য ভাগে পলিমাটি অঞ্চলে যেখানে

গাঙ্গেয় পলিমাটি অঞ্চল ৩২ লক্ষ একর, বিন্ধ্য পলিমাটি অঞ্চল ২৮ লক্ষ একর এবং তিস্তা, তোরষা ও মহানন্দা ইত্যাদি নদীর অববাহিকায় ১৫ লক্ষ একর—মাটির তলায় প্রচুর জলসম্পদ রয়েছে, যার সদ্ব্যবহার করে রবি ও গ্রীষ্ম বা খরা মরসুমে ভাল ফসল তোলা যায়। সারা বছর ধরে সেচের জলের বন্দোবস্ত রয়েছে এমন জমির পরিমাণ এ রাজ্যে ১০ লক্ষ একরের বেশী হবে না।

বিভিন্ন মরশুমে ধান চাষের আগে বা পরে কোন্ কোন্ ফসল চাষ করা যাবে তা জমির অবস্থান, মাটির প্রকার, সেচের জলের পরিমাণ ইত্যাদির নির্ভর করে। তবে ধানের সংগে শস্যপর্যায়ে বিভিন্ন শস্য নির্বাচনের সময় সর্বাধিক উৎপাদন বা লাভের কথা চিন্তা করলে চলবে না—এই সংগে দেখতে হবে মাটির উর্বরতা যেন বজায় থাকে, আগাছা ও রোগ পোকার আক্রমণ শস্য পর্যায়ের ত্রুটির জন্য যেন বেড়ে না যায়।



চিত্র ৭৯—বৃষ্টি নির্ভর এলাকায় ধানের সংগে বহুফসলী ফসলের শস্য পর্যায়

যেখানে সম্ভব অধিক ফলনশীল জাতের ফসল অন্তর্ভুক্ত করে সেচ সেবিত ও বৃষ্টি নির্ভর এলাকায় বিভিন্ন প্রকারের মাটি ও উঁচু, নীচু এবং মাঝারি অবস্থানের জমির জন্য কতকগুলি শস্যচক্রের সুপারিশ দেওয়া হল (চিত্র ৭৮, ৭৯)।

প্রশ্নাবলী

অধ্যায় এক

১। পৃথিবীর পাঁচটি ধানের সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী দেশের নাম কর। এসব দেশে অধিক ফলনের কারণ কি ?

২। ভারতবর্ষে কোন কোন রাজ্যে ধানের গড় উৎপাদন সব থেকে বেশী ? পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় এই বেশী হওয়ার কারণ কি ?

৩। ভারতবর্ষে ১৯৫১-৫২ সালের তুলনায় ১৯৮০-৮১ সালে উৎপাদন ও উৎপাদিকা শক্তি কতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ? এই বৃদ্ধির কারণ কি ?

৪। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ঋতুতে কত পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ হয়ে থাকে ? কোন জেলা থেকে সব থেকে বেশী ফলন পাওয়া যায় এবং কতখানি ?

৫। ভারতবর্ষে ধান উৎপাদনের বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা কর।

অধ্যায় দুই

৬। ধান গাছের / শীষের / ফুলের / দানার / চারার বিভিন্ন অংশের আকৃতি ছবির সাহায্যে বর্ণনা কর।

অধ্যায় তিন

৭। ধান গাছের পরাগসংযোগ বা নিষিক্তকরণ কিভাবে হয় ?

৮। ধান গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন শারীর বৃত্তীয় পর্যায়গুলি ছবির সাহায্যে বোঝাও।

৯। ধান গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ের স্থায়িত্বকাল বল।

১০। বিভিন্ন বৃদ্ধির পর্যায়ের সংগে ফলনের সম্পর্ক বিস্তারিত ভাবে বল।

১১। ধান গাছের বৃদ্ধির সময়ের উপর আলোক কালের প্রভাব বর্ণনা কর।

অধ্যায় চার

১২। দেশে ধানের বিভিন্ন জাত উদ্ভাবনের ইতিহাস বর্ণনা কর।

১৩। জাতির (যেকোন জাতের নাম করা যেতে পারে) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা কর।

১৪। দেশী ধানের থেকে বেঁটে জাতের অধিক ফলনশীল ধানের মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য দেখাও। (অথবা, বেঁটে জাতের ধানের উচ্চ ফলনের কারণ কি ?)

১৫। ভারতবর্ষে উন্নত জাতের ধান প্রজননের উদ্দেশ্যগুলি কি ?

১৬। পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী (উল্লেখ করতে হবে) বিভিন্ন এলাকা ও জমির অবস্থানের উপর (উল্লেখ করতে হবে) নির্ভর করে যে অধিক ফলনশীল ধানের জাতের সুপারিশ করা হয় তা বিস্তারিত ভাবে বল।

অধ্যায় পাঁচ

১৭। ভারতীয় বীজ আইন (Seed Act) অনুসারে বিভিন্ন ধান বীজের মান বর্ণনা কর।

১৮। সার্টিফায়েড বীজ বা উচ্চ চারিত্রিক গুণ সম্পন্ন বীজ কিভাবে উৎপাদন করা হয় আলোচনা কর।

১৯। ধান বীজের সুপ্তাবস্থা কাহাকে বলে? ধানের সুপ্তাবস্থা থেকে কিভাবে অঙ্কুরোদগমের উপযোগী করা যায় তা বল।

অধ্যায় ছয়

২০। ধান উৎপাদনে আবহাওয়ার প্রভাব বর্ণনা কর।

২১। জল দাঁড়ানো ধানের মাটিতে যে ধরনের জৈবিক, ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন হয়ে থাকে তা সংক্ষেপে বল। উঁচু জমির মাটির তুলনায় পার্থক্য কোথায়?

অধ্যায় সাত

২২। বিভিন্ন ধরনের চাষের পদ্ধতি কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল? শুকনো / আধাশুকনো / সিক্ত চাষের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২৩। শুকনো ও সিক্ত চাষের মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য কোথায় আলোচনা কর।

২৪। সরাসরি বীজ বোনা ও চারা রোপন পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? কোন অবস্থায় কোনটি বেশী সুবিধাজনক তা আলোচনা কর।

২৫। ধানের জাত, রোপনের সময় ও মাটির উর্বরতা শক্তির সংগে চারা রোপনের দূরত্বের সম্পর্ক আলোচনা কর।

অধ্যায় আট

২৬। শুকনো বীজতলায় / সিক্ত বীজতলায় চারা তৈরীর পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২৭। শুকনো ও সিক্ত বীজতলার তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

২৮। দাপক পদ্ধতিতে কিভাবে চারা তৈরী করা হয়? আমাদের দেশের অবস্থায় এই পদ্ধতি কতখানি কার্য্যকরী? এর সুবিধা ও অসুবিধা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা কর।

অধ্যায় নয়

২৯। ধানের মাঠে জলের সুষ্ঠু পরিচর্যা বলতে কি বোঝায়? জলের প্রয়োজনীয়তা কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

৩০। মোটামুটিভাবে ধানে কোন ধরনের জলসেচ পদ্ধতি অধিক প্রচলিত আছে? যদি জলের সরবরাহ কম থাকে / জলসরবরাহ পর্যাপ্ত থাকে তাহলে কোন পদ্ধতিতে সেচ দিলে সুবিধা হবে। ঐ পদ্ধতি গ্রহণের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।

৩১। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাতে বিভিন্ন ধরনের ধানের জন্য জলসেচের যে সুপারিশ করা হয় তা বর্ণনা কর।

অধ্যায় দশ

৩২। সার প্রয়োগের আগে কোন কোন বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা সংক্ষেপে বল।

৩৩। কোন প্রকার নাইট্রোজেন সার নীচু ধানের জমির পক্ষে ভাল এবং কেন? ঐ সার মাটিতে প্রয়োগের পর কিভাবে গাছের গ্রহণীয় অবস্থায় আসে?

৩৪। নাইট্রোজেন সারের ব্যবহারের উৎকর্ষতা (efficiency of utilization) বৃদ্ধির জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে?

৩৫। ধানের জমিতে কত রকম উপায়ে নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করা যায়? তাদের মধ্যে তুলনামূলক ভাবে বিচার কর।

৩৬। মাটিতে নাইট্রোজেনের অপচয় রোধের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তা বর্ণনা কর।

৩৭। কোন ধরনের ফসফরাস ঘটিত সার ধানের জমির (পি. এইচ. স্বাভাবিক হলে) পক্ষে ভাল? কিভাবে এবং কখন প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়?

৩৮। অম্লমাটির পক্ষে কোন ধরনের ফসফরাস ঘটিত সার ভাল এবং কেন? অনেক জলা জমিতে ধানের ফসফরাস প্রয়োগে ভাল ফল বুঝতে না পারার কারণ কি?

৩৯। পটাশ সার প্রয়োগের বিধি বর্ণনা কর।

৪০। সুষমহারে সার প্রয়োগের সুপারিশ কেন করা হয়?

৪১। বর্তমান অবস্থাতে ধানে কোন ধরনের জৈবসার কখন, কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে?

৪২। পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ায় নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে কত উদ্ভিদ খাদ্যের সুপারিশ করা যেতে পার? উদাহরণ স্বরূপ যেমন—

(ক) অধিক ফলনশীল বোনা আউসের জাত এবং মাটির উর্বরতার মান মধ্য নিম্ন হলে কত হবে?

অধ্যায় এগার

৪৩। আগাছা কাহাকে বলে? বোনা আউস / রোয়া আমন ইত্যাদিতে আগাছার দ্বারা ধানের কিভাবে ক্ষতি হয়?

৪৪। কোন কোন ধরনের আগাছা সাধারণতঃ ধানের জমিতে দেখা যায়? (প্রধান প্রধান আগাছার নাম বিভিন্ন জমির অবস্থানের জন্য জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে)।

৪৫। কিভাবে পরিচর্যা পদ্ধতির মাধ্যমে ধানের জমিতে আগাছা দমন করা যায় তা বর্ণনা কর।

৪৬। রাসায়নিক পদ্ধতি ও পরিচর্যা পদ্ধতিতে আগাছা দমনের মধ্যে সুবিধা ও অসুবিধাগুলি কি কি? সুসংহত প্রচেষ্টায় আগাছা দমন কাকে বলে এবং কিভাবে করা যায়?

৪৭। সিঞ্চন যন্ত্রের (Sprayer) নিয়ন্ত্রণসিদ্ধ (Calibration) করার পদ্ধতি কি বর্ণনা কর। (২/১টি অংকের সমাধান করতে বলতে পারা যায়)

৪৮। বিভিন্ন অবস্থার জন্য আউস / আমন, উঁচু / নিচু জমি—কোনটি বলে দিতে হবে) রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহারের সুপারিশ বর্ণনা কর এবং তার অর্থনৈতিক হিসাব বল।

অধ্যায় বার

৪৯। মাজরা পোকা আক্রমণের লক্ষণগুলি বর্ণনা কর। কোন কোন ধরনের পোকা বিশেষ করে ধানে আক্রমণ করে?

৫০। বিভিন্ন পোকার (বলে দিতে হবে কোনটি) আক্রমণের সময়, আক্রান্ত গাছের লক্ষণ বা চেনার উপায় জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

৫১। রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার না করে কিভাবে পোকা ও আক্রমণ প্রতিহত করা যায় বর্ণনা কর।

৫২। রাসায়নিক পদ্ধতিতে পোকামাকড় (কোন পোকা বলতে হবে) দমনের সুপারিশ পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ায় করা হয় তা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

৫৩। মাঠের ইঁদুর / গুদামের ইঁদুর দমন করার উপায় বর্ণনা কর।

অধ্যায় তের

৫৪। গাছের রোগ কাহাকে বলে? ইহার বিস্তার কিভাবে হয়?

৫৫। (রোগের নাম বলতে হবে) রোগ চেনার উপায় কি?

৫৬। পরিচর্যা পদ্ধতির মাধ্যমে কিভাবে রোগ প্রতিহত করা যায় বর্ণনা কর।

৫৭। (রোগের নাম বলতে হবে যেমন পোড়া দাগ রোগ ইত্যাদি) রোগ রাসায়নিক পদ্ধতিতে কিভাবে দমন করা যায়?

৫৮। বিভিন্ন খাদ্যোপাদান (কোন খাদ্য বলতে হবে) অভাব / আধিক্য জনিত লক্ষণাবলী / কোথায় লক্ষণাবলী দেখা যাবে বা তার প্রতিকারের ব্যবস্থা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

অধ্যায় চোদ্দ

৫৯। ধান কাটার সময় কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে? কৃষক কি কারণে ফসল কাটতে দেরী করে?

৬০। ধান শুকনো করার সংগে ধান ভাঙ্গানোর সম্পর্ক কিরূপ? গোটা চালের পরিমাণ কি কি পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়?

৬১। বীজ সংরক্ষণের জন্য দানার আর্দ্রতার পরিমাণ কত থাকা উচিত ? আমাদের দেশের অবস্থায় কিভাবে বীজধান রাখা হয়। বীজের উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পেলে কিভাবে পুনরায় বৃদ্ধি করা সম্ভব বর্ণনা কর।

৬২। ধান থেকে কি কি ধরনের উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায় এবং তার ব্যবহার কিভাবে করা হয় বর্ণনা কর।

অধ্যায় পনের

৬৩। চালের গুণাবলী বলতে কি বোঝায় ? কতকগুলি (বলে দিতে হবে কোন কোনটি) চালের গুণাবলী বর্ণনা কর।

৬৪। রান্নার গুণাগুণ কিভাবে বিচার করা হয় এবং তা কোন কোন জিনিষের উপর নির্ভর করে ?

৬৫। চালের পুষ্টিগত মান কি এবং কিভাবে তার বিচার করা হয় ও বাড়ানো যায় তা সংক্ষেপে বল।

অধ্যায় ষোল

৬৬। ধানের অর্থনৈতিক হিসাব কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ? কোন একটি (বলে দিতে হবে কোনটি) ধানের অর্থনৈতিক হিসাব করে দেখাও।

অধ্যায় সতের

৬৭। পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষের সমস্যা ও সমাধানের জন্য ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি নেওয়া যেতে পারে তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা কর। (**অথবা,** সমস্যা ও সমাধান আলাদা ভাবে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে)।

অধ্যায় আঠার

৬৮। শস্য পর্যায় বলতে কি বোঝায় ? শস্য পর্যায়ে চাষাবাদ করতে গেলে কি কি বিষয় বিবেচনা করতে হবে ?

৬৯। সেচসেবিত ও বৃষ্টিনির্ভর অঞ্চলে ধানের সংগে বহুফসলী শস্য পর্যায়ের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

যেসব পুস্তক ও পুস্তিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে তার তালিকা

Annual Report (1974-75) Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture and Irrigation, New Delhi.

Annual Report (1963-82) International Rice Research Institute, Philippines.

Annual Report (1980) All India Co-ordinated Rice Improvement Project, Rajendranagar.

Aspac Bull No. 52. on Minor Element for Rice, May 1975.

Dutta, S.K. and Banerjee, B. (1979) Recent developments in cultivation of deep water rice, *MACCO Agri, Digest*, 4(1) : 9-16.

Dutta, S.K., Banerjee, B and Som, J. (1978) Varietal behavior of rice under different types of low lying water logged situations in West Bengal, Proc. National Symp. on increasing rice yield in Kharif at C.R.R.I, Cuttack on 8th Feb, 1978 pp. 116-122.

De Dutta, S.K. (1982) Principles and Practices of Rice Production, Wiley Publication.

Fertilizer Statistics, (1979-80) F.A.I. Publication, pp. III-60.

Gobindaswami, S. and Ghosh, A.K. (1972) *Indian J. Agric. Sci.* 42(11) : 993-998.

Ishizuka, Y. (1971) Physiology of the Rice Plant. *Adv. Agron.* vol. 23. pp. 241-315.

Kanwar, J.S. (1970) *Indian Farming*, June, pp. 5-7.

Mukherjee, D.K. (1980) High yielding varieties and indigenous varieties of rice—their problems and prospects. Gramseva (Annual Souvenier, 1980) pp. 1-14.

Mukherjee, D.K. (1980) Quality seeds—role in increased rice production,

Mukhopadhayay, Sisir Kumar (1981) Weed problems and their control measures for important crops with particular reference to West Bengal. Research information Bulletin No. 1. from Palli Sikha Sadan, Viswa Bharati.

Mandal, B. (1978) Rice Production Strategy in West Bengal Rice in West Bengal vol. no. 1. pp. 1-6.

Noguchi, Y. (1954) The Results of Research on the effect of potash on paddy rice in Japan. Rep. for the 5th Meeting of the I.R.C. Working Party on Rice Breeding, Tokyo' Japan 4-9 : 319.

Patnaik, S., Rao, M.V. and Nanda, B.B. (1968) Some considerations of nitrogen uptake by high yielding rice varieties Int. Rice Comm. News letters vol. XVIII(2) : 26-37.

Patnaik, S. and Gaikawad (1969) Efficiency of phosphorous and potassium absorbed during various growth stages of IR-8 for grain production. *Indian J. agric Sci.* 39(1) : 117-121.

Ponnamporama, F.N. (1971) As refered by S.K. De Dutta in his book on Principles and Practices of Rice Production.

Rice (1976) Fertilizer Association of India Publication, New Delhi.

Rice in India (1960) Indian Council of Agricultural Research Monograph, New Delhi.

Rice (1974) Pans manual no. 3. Centre for overseas Pest Research London.

Rice Production Mauual (1970) International Rice Research Institute Publication. Philippines.

Rice Production Technology Manual (1979) Oxfor and IBH Publishing Co. Publication.

Report (1981) Agricultural Information and Statistics Department, Directorate of Agriculture, Govt. of West Bengal.

Rice in West Bengal (1978, 1980, 1982) vol. 1, *2*, 3 respectively Directorate of Agriculture, Govt. of West Bengal Publication.

Swaminathan, M.S., Siddiq, E.A. and Kaul, A.K. (1971) *Indian Farming* 21(7) : 13-17 October.

সুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮০) দেশী ধানের চাষ, **গ্রামসেবা** (বাৎসরিক সুভেনিয়র) পৃঃ ১-৮ ।

শিশির কুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৮৪) আমন ধানের জমিতে ঔষধ দিয়ে আগাছা দমন করুন, **সোনালী ফসল** ১(৫-৬) ঃ ২৫-২৮ আষাঢ়-শ্রাবণ।

শিশির কুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৮৫) রাসায়নিক ঔষধ দিয়ে ধানের ক্ষেতে আগাছা দমন, **সার সমাচার,** ১৬(১) ঃ ১৩-১৫, বৈশাখ সংখ্যা।

পুন্যব্রত চট্টোপাধ্যায় (১৩৮৬) ধানের কয়েকটি কীট ও সুসংহত প্রতিরোধ ব্যবস্থা, **সার সমাচার,** মাঘ ৭(৪) ঃ ৩৩-৩৪।

মনোজরঞ্জন ঘোষ ও এস. কে. ঘোষ (১৩৮৪) ধানের কীট শত্রু প্রসংগে, **সার সমাচার** ৫(৪) : ৯-১৬।

ননীগোপাল দত্ত (১৩৮৪) ধানের কীট শত্রু ও তার প্রতিকার, **সোনালী ফসল** আমনসংখ্যা ১(৫-৬) ঃ ৮৭-৯৩।

নিলাংশু মুখার্জী (১৩৮৪) **সোনালী ফসল,** আমনসংখ্যা

সুনীল সেনগুপ্ত (১৯৮০) দেশী ধানের ফলন বাড়ান, **গ্রামসেবা** (বাৎসরিক সুভেনিয়র) গ্রামসেবক ট্রেনিং সেণ্টার, নরেন্দ্রপুর।

সুনীল সেনগুপ্ত (১৯৭৬) অধিক উৎপাদনে সুষমসার ও সুষ্ঠু জল ব্যবহারের ভূমিকা, সুভেনিয়র, ভারত জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, পৃঃ ২৬-৩৬, ১১ই ফেব্রুয়ারী।

সুনীল সেনগুপ্ত (১৩৮৬) খরিফ মরশুমে অধিক ফলনশীল ধানের চাষ **সার সমাচার** ১৭(৪), মাঘ, পৃঃ ১৯-২১।

বিষ্ণুপদ মণ্ডল (১৯৮০) পশ্চিমবাংলার ধান উৎপাদনে দেশী ধানের ভূমিকা, **গ্রামসেবা** (বাৎসরিক সুভেনিয়র) গ্রামসেবক ট্রেনিং সেণ্টার, নরেন্দ্রপুর।

ধ্রুব কুমার মুখোপাধ্যায় (১০৮৪) আমন ধানে সবুজ বিপ্লবের সম্ভাবনা, **সোনালী ফসল** পৃঃ ১৭-২০।

প্রফুল্ল কুমার জানা (১৩৮৪) আমন ধান চাষে জলের সুষ্ঠু ব্যবহার **সোনালী ফসল** পৃঃ ২৯-৩০।

প্রফুল্ল কুমার জানা (১৯৭৬) উচ্চফলনশীল ধান চাষে সেচের জলের সুষ্ঠু ব্যবহার, সুভেনিয়র, ভারত জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প পৃঃ ১৯-২২, ১১ই ফেব্রুয়ারী।

কৃষি সহায়িকা (১৯৮০) ভারত জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, পশ্চিমবঙ্গ।

সার গ্রন্থ (১৯৮০) পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত

ধান চাষে রোগ, কীট ও আগাছা দমন (১৯৭৫) বুলেটিন নং-২, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

বসুন্ধরা, বিশেষ সংখ্যা-১ (১৩৮৯) শ্রাবণ, চতুর্বিংশ বর্ষ।

লেখক পরিচিতি

ডঃ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ইংলণ্ডে রেডিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ, ডি. দীর্ঘকাল গবেষণা ও অধ্যাপনার কাজে অতিবাহিত হয় বিহার কৃষি মহাবিদ্যালয়, ভাগলপুর, কেন্দ্রীয় ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র, পুনায় ও রাঁচী কৃষি মহাবিদ্যালয়ে। গত ১৯৬৬ সাল থেকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে, বর্তমানে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও অধ্যাপনায় রত। মাঝে কিছু সময় গবেষণা ও গবেষণার কাজে আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্র, ফিলিপাইন এবং সুইডেনে কাটে। নানা বিষয় নিয়ে দেড় শতকের উপর গবেষণালব্ধ পত্র দেশী ও বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বহুসংখ্যক এম.এস.সি. ও পি.এইচ.ডি. ছাত্রের গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক। বর্তমানে নানান সর্বভারতীয় কৃষিসংস্থার সংগে ও কলিকাতা, আসাম, রাঁচি, রাজেন্দ্র (বিহার) ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এ্যাকাডেমিক বোর্ডের' ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদের সংগে জড়িত। তিনি চারটি বইয়ের লেখক।

ডঃ সুনির্মল মাইতি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. দীর্ঘদিন ধরে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণায় রত। চল্লিশটির মত গবেষণা পত্র বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ধান চাষ বিষয়ে প্রবন্ধ ও হাতে নাতে মাঠে ফলন দেখিয়ে এক সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে 'এ্যাসপি পুরস্কার' পেয়েছেন। তিনিও একাধিক বইয়ের লেখক।

বাইশ টাকা